"ব্রহ্মচর্য্য"

কৈলাস চন্দ্র

১৩২৯ সাল।

ওঁ শ্রীশ্রীদুর্গা ।

ভক্তি-উপহার ।

পরমারাধ্যা ৺তারামণি দেবী মাতাঠাকুরাণী

মহাশয়ার শ্রীচরণকমলেষু ।

মা,

তুমি আমার জন্য বহু ক্লেশ সহ্য করিয়াছ। আমার দেড় বৎসর বয়সে তোমার বৈধব্য সংঘটিত হয়। সাংসারিক তীব্র দরিদ্রতার পীড়নে নানারূপ দুঃখ ভোগ করিয়াও আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও আমাকে কত স্নেহে লালন পালন করিয়াছ। তোমার দুঃখ ও তপঃক্লিষ্ট শুষ্ক রুক্ষ্ম মলিন মুখে আন্তরিক প্রসন্নতার স্বর্গীয় জ্যোতিঃ ফুটিয়া বাহির হইত। প্রসন্নময়ী মা, মলিন বস্ত্রাচ্ছাদিত তোমার ধীর গম্ভীর প্রশান্ত দেহকান্তি সতৃষ্ণ নয়নে যখনই দেখিতে পাইতাম তখনই আনন্দে মন ভরিয়া যাইত। তোমার হাতের দেওয়া স্নেহমাখা মধুময় শাকান্ন ভোজনে, অমৃত ভোজনের তৃপ্তি পাইয়াছি, তোমার হাতের রাঁধা সুস্বাদু ডাল ভাত আকণ্ঠ-পূর্ণ আহার করিয়া নিমন্ত্রণ পাইলাম, অনুভব করিয়াছি।

মা, তোমার নিস্বার্থ কর্ত্তব্য নিষ্ঠার, সেবাধর্ম্মের এবং স্বার্থত্যাগের মহিমা গ্রামবাসী সকলেই বুঝিয়া তোমাকে "দেবী" বলিয়া সম্মান করিত। আমি তোমার একমাত্র পুত্র সন্তান বলিয়া আমার দীর্ঘজীবন কামনায় কত যে ব্রত নিয়ম পালন করিয়াছ, শিশুকালে তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই, চাতুর্ম্মাস্যব্রত, একান্তরব্রত

উপবাস ও তপস্যাদি তোমার জীবনের অবলম্বন ছিল। সেইজন্যই আমি দীর্ঘজীবী হইয়াছি। আমার সমবয়সী ছোট বড় সকলেই চলিয়া গিয়াছেন। তোমার তপস্যাব ফলে আমি এখনও জীবিত আছি। তোমাব সদুপদেশ, আমার জীবন গঠন করিয়াছে।

মা, তোমার সেবা করার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবা মাত্রই, তুমি, তোমার নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছ। আমার স্বোপার্জ্জিত অতি অল্প ও অকিঞ্চিৎকর অর্থের এক কপর্দ্দকও তোমার সেবায় ব্যয় করিতে পারি নাই। আমার এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই ; এই দুঃখ আমাকে জীবনভরা মর্ম্মপীড়া দিতেছে।

মা, তুমি আদর্শ ব্রহ্মচাবিণী ছিলে, আমার শ্রমলব্ধ "ব্রহ্মচর্য্য" ও "হিন্দু বিধবাব কর্ত্তব্য" প্রবন্ধগুলি, তোমারই বিষ্ণু প্রীতি কামনা করিয়া, তোমার পবিত্র পূত চরণে আমি **ভক্তি-উপহার** দিলাম। তুমি এখন কোন লোকে আছ না জানিলেও স্বর্গলোকে আছ অনুমানে বলিতে পারি। অন্তর্য্যামী কর্ম্মফল দাতা শ্রীশ্রীভগবানের অনুগ্রহে ও ইচ্ছায় আমার এই সভক্তিক ক্ষুদ্র উপহার, আমার শিবোভূষণ তোমাব শ্রীচরণ স্পর্শ করুক। শ্রীশ্রীভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা।

সেবকাধম, শ্রীশ্রীচরণরেণু প্রার্থী,

শ্রীকৈলাস চন্দ্র শর্ম্মণঃ।

(ব্রহ্মচর্য্য)

ভূমিকা।

আমি লেখক নই, আমার পাণ্ডিত্য নাই। ভাষার চ্ছটায়—ভাষার ঝঙ্কারে পাঠকের মন আকৃষ্ট করিবার শব্দ-সম্পদ্ এবং লিপি-চাতুর্য্য আমার নাই। নিজের ক্ষুদ্রত্বের পরিচয় দিতে লজ্জা কি? আমি মূর্খ, হিন্দুশাস্ত্রে আমার অধিকার নাই; কারণ অমি যথাসময়ে যথাবিধি হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করি নাই। অথচ হিন্দুশাস্ত্রোক্ত "ব্রহ্মচর্য্য" সম্বন্ধে কিছু লিখিতে আমার প্রাণের ব্যাকুলতা ও দুরাকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। ইহা পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘনের এবং বামনের বিধুধারণের জন্য হস্ত প্রসারণের ন্যায় বিফল চেষ্টা। সাধারণের নিকট উপহাসাস্পদ হইব, সন্দেহ নাই।

বৃদ্ধ বয়সে আমার এইরূপ দুঃসাহস হইল কেন? শেষ বয়সে নিষ্ঠার সহিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিয়া এবং ঋষিকল্প পণ্ডিত মণ্ডলীর পদ-সেবা করিয়া আমার এই সাহস জন্মিয়াছে। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ অন্তর্য্যামীরূপে সকলের হৃদয়েই আছেন। তিনি একমাত্র কর্ত্তা এবং সকল কর্ম্মের প্রেরক। আমার "ব্রহ্মচর্য্য" সম্বন্ধে লিখিবার ব্যাকুলতা তিনিই দিয়াছেন। ক্ষুদ্র জীব আমি, অনন্ত-শক্তি ভগবানের যে পরিমাণ শক্তি আমি ধারণ করিতে সমর্থ, সেইটুকু শক্তিই তিনি দিবেন। জলার্থী মনুষ্য তাহার জল ধারণোপযোগী পাত্রের পরিমাণ অনুসারে জল আহরণ করিতে সমর্থ হন। অচল-প্রতিষ্ঠ সমুদ্রের জল যিনি যে পরিমাণ আহরণ করিতে সমর্থ হন, তিনি সেই পাত্রের পরিমাণ জলই পাইয়া থাকেন। মহান্ সমুদ্র তাঁহার অপরিমেয় জল দিতে কাহাকেও কৃপণতা করেন না। জলার্থী মনুষ্যের বহন শক্তিও তাহার জলাধার পাত্রের পরিমাণ অনুসারে জল অধিক বা অল্প পাইবার কারণ হয়।

প্রত্যেক মনুষ্যের স্ব স্ব প্রকৃতির গুণ ও কর্ম্মানুসারে কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ, কেহ সাধু, কেহ অসাধু, কেহ সুকবি, কেহ মন্দ কবি, কেহ সুলেখক, কেহ কুলেখক, কেহ শান্ত, কেহবা উদ্ধত হইয়া থাকে। আমি নিজ কর্ম্মানুসারে যে শক্তি ও বুদ্ধি লাভ করিয়াছি, আমার চেষ্টা ও কর্ম্ম তদনুরূপই হইবে।

ভগবৎ প্রদত্ত যে শক্তি ও বুদ্ধি লইয়া আমার নগণ্য ক্ষুদ্র জীবনের ৬৫ বৎসর মধ্যে সুদীর্ঘ ৫৫বৎসর কাল বিষয়খেলায় অতীত হইয়াছে, এখন সুদীর্ঘকালের বহির্ম্মুখ কর্ম্ম প্রবৃত্তির ইষ্টানিষ্ট ফল পর্য্যালোচনা করিয়া সন্তপ্ত হৃদয়ে অনুভব করিয়াছি, **ব্রহ্মচর্য্যহীন** মনুষ্যের জীবনই বৃথা ! সে আত্মঘাতী !!

কেবল আমিই যে ব্রহ্মচর্য্য-ভ্রষ্ট হইয়া সন্তপ্ত হইয়াছি, তাহা নহে ; কাল-প্রভাবে এখন অনেকেরই ব্রহ্মচর্য্য নাই, সংযম নাই—বিষয়-বৈরাগ্য নাই। কাল ও সংসর্গ প্রভাবে এখন অনেকেই হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন না। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও সদাচার যে হিন্দু জাতির মেরুদণ্ড ইহা এখনও আমাদের অনেকেরই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না কারণ এখন পূর্ব্বের মত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নাই, —ব্রহ্মচর্য্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা নাই। ব্রহ্মচর্য্যের স্বরূপ সাধারণের বোধগম্য হইয়া পুনঃ ব্রহ্মচর্য্যের অনুশীলনে লোকের প্রবৃত্তি জন্মে এই আশা মনে লইয়া ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে কিছু লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি।

আমি অন্তঃকরণে যাহা অনুভব করিয়াছি, ভাষায় প্রকাশ করিবার পূর্ণশক্তি না পাইলেও আমি যতটুকু পাইয়াছি, তদনুরূপই লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ব্রহ্মচর্য্যের শক্তি ও মহিমার শতাংশের একাংশও আমার ক্ষুদ্র লেখনীতে প্রকাশ পাইবেনা ইহা আমার ধারণা। মেয়েলী কথায় আছে ;—"অরাঁধুনীর হাতে প'ড়ে রুইমাছ কাঁদে, নাজানি বা সে আমারে কেমন করে রাঁধে ?" আমার হাতে পড়িয়া ব্রহ্মচর্য্যের কি দশা হয় সুধী পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন। সহৃদয় পাঠকগণের মনঃপূত না হওয়া পর্য্যন্ত আমার মনের ভয় দূর হইবে না।

ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ক আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী তিনভাগে বিভক্ত করা প্রয়োজন মনে করিয়াছি ;—

১। অবতরণিকা খণ্ড।

এই খণ্ডে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইলে তৎসাধনোপযোগী জ্ঞাতব্য বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সেই জ্ঞাতব্য বিষয়—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, দেহ, মন, সংসার, সুখ, দুঃখ, জ্ঞান ও অজ্ঞান প্রভৃতির সংক্ষেপ আলোচনা করা হইয়াছে।

২। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মচর্য্যের স্বরূপ কি ?

ইহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া, কি উপায়ে ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা হইতে পারে সেইজন্য ব্রহ্মচর্য্যের সাধনাগুলির সংক্ষেপ বর্ণনা করা হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলে ভগবদ্ভক্তি লাভ হয় এবং ভগবদ্ভক্তিই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ লাভের শ্রেষ্ঠ সাধন। সেইজন্য ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। হিন্দুর ব্রহ্মচর্য্য কেন নষ্ট হইতে চলিয়াছে ? এবং ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাব হীন হইয়াছে বলিয়া আমাদের জীবন দুর্ব্বহ হইতেছে তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে।

৩। বিধবার কর্ত্তব্য।

হিন্দু মালক্ষ্মীগণের এখনও হিন্দু শাস্ত্রোক্ত সদাচারে এবং ক্রিয়া কলাপে নিষ্ঠা আছে।

এখনও উচ্চবর্ণের হিন্দু বিধবাগণ যথাশাস্ত্র ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়া আসিতেছেন। হিন্দু গৃহস্থের প্রায় অনেক গৃহেই ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারিণী বাল-বিধবা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের শিক্ষার্থ **"বিধবার কর্ত্তব্য"** কর্ম্মের শাস্ত্রীয় উপদেশ যথাশক্তি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। অবস্থা-বিশেষে হিন্দু বিধবার পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্র সম্মত কিনা তৎসম্বন্ধেও আলোচনা করা হইয়াছে।

আমার এই চেষ্টায় যদি একটী পুরুষ অথবা একটী নারীরও মন হিন্দু শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মচর্য্যের দিকে আকৃষ্ট হয়, একটী বিধবাও যদি যথাশাস্ত্র ব্রহ্মচর্য্য সম্যকরূপে বুঝিতে পারেন এবং তাহাতে একনিষ্ঠা হইতে পারেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব।

সুধী পাঠকগণ যদি আমার এই লিখিত প্রবন্ধ একটুক্ শ্রমস্বীকার করিয়া পাঠ করেন ও প্রবন্ধের শাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের মাপকাঠি দ্বারা পরীক্ষা করতঃ তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করেন, তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

আমার পরম সুহৃদ্ মিত্রপ্রবর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র রায় চৌধুরী, বিদ্যাবিনোদ মহাশয়, কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করিয়া, "ব্রহ্মচর্য্যের" কাটা ছিড়া, জড়া-লেখা পাণ্ডুলিপি পরিষ্কার করিয়া লিখিয়াছেন। তাঁহারই উৎসাহে, আমি "ভক্তি" বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে সাহসী হইয়াছি।

আমার সোদর প্রতিম ভ্রাতা ভগবৎ ভক্ত শ্রীমান্ কাশীনাথ নিয়োগী ও শ্রীমান্ উমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য "ব্রহ্মচর্য্য" প্রবন্ধ প্রথমাবস্থায় বিশেষ শ্রম স্বীকার করিয়া দেখিয়া ইহা সাধারণের বিশেষতঃ নিষ্ঠাবান্ হিন্দু সমাজের বিশেষ উপকারে আসিবে জানাইয়া আমাকে ইহা ছাপাইতে উৎসাহ দেন।

ভাটপাড়ার পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ভট্টাচার্য্য, কাব্য-ব্যাকরণ ন্যায়তীর্থ, শিরোমণি M. A. মহোদয়, বিশেষ শ্রম স্বীকার করিয়া "ব্রহ্মচর্য্য" প্রবন্ধ আদ্যো-পান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

আমি অর্ব্বাচীন-আমার পরমাত্মীয় শ্রদ্ধাস্পদ, কলিকাতা বিদ্যা-সাগর কলেজের সিনিয়র প্রফেসার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র কিশোর চৌধুরী, M. A., মহোদয় মুদ্রাঙ্কনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এবং পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, M. A., মহোদয় প্রুফ্ দেখার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। পরম শ্রদ্ধাস্পদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ, M. A., মহাশয়ও এই গ্রন্থের প্রুফ দেখিয়াছেন।

দেশ-পূজ্য প্রথিতযশা পণ্ডিতগণ যাঁহারা আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তক বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া কেহ নিজে পাঠ করিয়া, কেহ কেহবা আমার নিকট শুনিয়া গ্রন্থের প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, সেই প্রশংসা পত্র গ্রন্থের শেষ ভাগে সংযুক্ত করিয়াছি।

আমার আত্মীয় বন্ধু ও অনুগ্রাহকগণ, আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া মুদ্রাঙ্কনের জন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, ও এই পুস্তক সাধারণের নিকট প্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন।

আমি, উপরি উক্ত সাধু ও সদাশয় ব্যক্তিগণের প্রতি আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমি তাঁহাদের এই সাধু চেষ্টার জন্য চিরকৃতজ্ঞ। ইতি

চিরকৃতজ্ঞ অনুগত

শ্রীকৈলাস চন্দ্র শর্ম্মণঃ।

সূচী।

অবতরণিকা খণ্ড।

ব্রহ্মচর্য্য ও তাহার সাধন।

হিন্দুবিধবার কর্ত্তব্য।

মঙ্গলাচরণ ।

---*---

ওঁশ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ। ওঁশ্রীশ্রীগুরেব নমঃ।

ওঁব্রহ্মণে নমঃ। ওঁব্রাহ্মণায় নমঃ ॥

ওঁনারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।

দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

ওঁনারায়ণায় নমঃ। ওঁনরায় নমঃ। ওঁনরোত্তমায় নমঃ।

ওঁদেব্যৈ নমঃ। ওঁসরস্বত্যৈ নমঃ। ওঁবেদব্যাসায় নমঃ ॥

ওঁনমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায়চ।

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

ওঁসর্ব্বমঙ্গল মাঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ-সাধিকে।

শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।

যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবং ॥

সর্ব্বজ্ঞং সকলং শান্তং শঙ্খ-চক্র-ধরং প্রভুং।

নবীন নীরদ শ্যামং নমামি গোকুলেশ্বরং ॥

প্রশংসা পত্র।

ভাটপাড়ার পরম পূজনীয় স্বনামধন্য প্রথিতযশা পণ্ডিত-প্রবর বর্ত্তমান যুগের ঋষি ত্যাগী মহাপুরুষ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় "ব্রহ্মচর্য্য" সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন ;—

"ময়মনসিংহ নিবাসী অধুনা শ্রীশ্রী৺কাশীধাম শরণাগত শ্রীমান্ কৈলাসচন্দ্র নিয়োগী বিরচিত "ব্রহ্মচর্য্য" প্রবন্ধ মনোযোগ সহ শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। এইরূপ প্রবন্ধপুস্তক এ সময়ে বিশেষ প্রয়োজনীয়। লোকের রুচি বিকৃত, আদিরসপূর্ণ উপন্যাস পাঠে উৎসুক, এ সময়ে "ব্রহ্মচর্য্য" প্রবন্ধ সাধারণতঃ লোকের মনোরম না হইলেও ২।৪ জন ভাগ্যবানের মন সুপথে আনিতে সমর্থ হইবে এরূপ আশা আমি করি বলিয়াই এ সময়ে "বিশেষ প্রয়োজনীয়" বলিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, ধার্ম্মিক গ্রন্থকার তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যানন্দে তিনি নিমগ্ন থাকুন এবং নিজ সংসর্গীদিগকে, সেই আমোদের অংশ বিতরণ করুন। ইতি ১লা মাঘ ১৩২৯।

ভট্টপল্লীয়—

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

৺কাশীধামের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত অদ্বিতীয় পুরাণপাঠক পূজ্য-পাদ শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন।

ধার্ম্মিকপ্রবর শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শর্ম্মা নিয়োগী মহাশয় "ব্রহ্মচর্য্য" নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। আমি তাহার প্রায় সমস্তই দেখিয়াছি, নাটক

নভেলের যুগে নিয়োগী মহাশয় যে ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক লিখিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি প্রশংসার যোগ্য। যাহা লিখিয়াছেন, উত্তম গবেষণাপূর্ব্বক প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিয়াছেন। ইহা ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী পাঠ করিয়া আনন্দ অনুভব করিবেন। আমি ইহা পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। ইতি ১৩২৯।৬ই মাঘ।

শ্রীহরিনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

সোনারপুর, বেনারস।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত নীলকমল ভট্টাচার্য্য, এম্, এ, মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

ব্রহ্মচর্য্য—শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র নিয়োগী প্রণীত।

গ্রন্থকার পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমাকে শুনাইয়াছেন। পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় নামেই কতকটা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাতে প্রসঙ্গতঃ হিন্দুধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকে বিধবার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটী স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। হিন্দু সমাজ ইহা দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবে। ইতি—৯ই মাঘ ১৩২৯।

শ্রীনীলকমল ভাচট্টার্য্য।

অধ্যাপক, সেণ্ট্রেল হিন্দু কলেজ,

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, কাশী।

পরম পূজনীয় ঋষিকল্প, "জীবন শিক্ষা" প্রভৃতি গ্রন্থকর্ত্তা স্বনামধন্য, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্ত ভূষণ মহাশয় এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন—

"পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র নিয়োগী মহাশয়ের কৃত "ব্রহ্মচর্য্য" গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সন্তোষের সহিত আদ্যোপান্ত প্রায়ই পাঠ করিলাম। তন্মধ্যে "ব্রহ্মচর্য্য" প্রভৃতি আর্য্যজনের অবশ্য শিক্ষনীয় সৎবৃত্তির বিষয়ই বিশদভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। সমস্ত বিষয়ই বেদ বেদান্ত এবং গীতা ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে বর্ণিত। ইহাতে গ্রন্থকারের বহুদর্শিতা, সৎশাস্ত্রালোচনা এবং সদনুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে বঙ্গভাষার চৈতন্যচরিতাদি প্রামাণ্য গ্রন্থগুলি ও তর্কাদিও উপেক্ষিত হয় নাই। কিন্তু গ্রন্থের ভাষা মনোহর হইলেও অধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা থাকায় সর্ব্বসাধারণের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। তথাপি আশা করা যায়, আধ্যাত্মিক জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তির বিশেষ উপকার হইবে। ইতি ১৩২৯ সাল, ১৪ই মাঘ।

শ্রীজয়চন্দ্র শর্ম্মা।

পূজ্যপাদ কবিসম্রাট্ পণ্ডিতরাজ স্বনামধন্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় এইরূপ বলিয়াছেন;—

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র শর্ম্মা নিয়োগী প্রণীত "ব্রহ্মচর্য্য" পুস্তকখানি আগাগোড়া সমস্তই শুনিয়াছি, নামেই পুস্তকের প্রতিপাদ্য কি বুঝা যাইতেছে। নিয়োগী মহাশয় সরল ভাষায় শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়টি সুন্দর করিয়া

বুঝাইয়া দিয়াছেন। পাঠক পাঠিকাকে বুঝাইবার জন্য তিনি অনেক স্থলে লৌকিক যুক্তিরও অবতারণা করিয়াছেন। এই দুঃসময়ে এরূপ পুস্তকের একান্ত প্রচার আবশ্যক মনে করি। এই পুস্তক পড়িয়া যদি কেহ ঋষিদিগের সম্মত পথ বুঝিতে পারেন, এবং সেই যেন সাধু বলিয়া সেই পথে অগ্রসর হন, তবে গ্রন্থকর্ত্তার সহিত আমরাও আনন্দিত হইব। দৃষ্টির অগোচরে থাকিয়া ঋষিরাও তাঁহার মস্তকে আশীর্ব্বাদরূপ পুষ্পবৃষ্টি করিবেন। ১৩২৯ সাল ৩০শে মাঘ।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

দ্বারভাঙ্গা মহারাজের ভূতপূর্ব্ব প্রাইভেট্ সেক্রেটারী ৺কাশীধামের সুপ্রসিদ্ধ পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সোমনাথ ভাদুড়ী মহাশয় এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

গ্রন্থকর্ত্তা ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত সম্ভ্রান্ত বৈষয়িক সম্প্রদায়ভুক্ত বটেন। তিনি সৌভাগ্যক্রমে কয়েক বৎসর হইল ৺কাশীধামে আগমনপূর্ব্বক সদাচার ও সাত্ত্বিক বৃত্তি সহকারে বাস কালে নিয়মিতরূপে পুরাণাদি শ্রবণ করিতে করিতে লোকের উপকার বুদ্ধিতে প্রণোদিত হইয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি গীতা আদি শাস্ত্র আলোচনা করিয়া এবং বিশিষ্ট পণ্ডিত মহোদয়গণের নিকট শ্রুতি সম্মত অর্থাদি আলোচনা করিয়া হার্দ্দিক প্রযত্ন সহকারে যে সমস্ত সারগর্ভ উপদেশ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা অতিশয় উচ্চ অথচ সাধারণের গ্রহণোপযোগী ভাষায় প্রকাশ করিছেন ইহাই প্রশংসার বিষয়।

যে ব্রহ্মচর্য্য এইকালে হিন্দুসম্প্রদায়ের বিধবাগণের একমাত্র আশ্রয় তৎবিষয়ক সম্যক আলোচনা কল্পে এই গ্রন্থ মধ্যে বহুল প্রযত্ন করিয়াছেন। এই

সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্যই যে এই বিষম কালে সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে অবলম্বনীয় তাহার যুক্তি প্রদর্শন করিতেও শ্রম লাঘব করেন নাই। এইরূপ প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় অত্যুচ্চ আচার শিক্ষার সদগ্রন্থ সকল সম্প্রদায়ের নরনারীদের গৃহে ধর্ম্মপুস্তক গণনায় থাকা বাঞ্ছনীয়।

এই গ্রন্থ অনুসারে যদি প্রত্যেকেই চলিতে দৃঢ় সংকল্প করেন তাহা হইলে এই দুঃখময় সংসার স্বর্গতুল্য অনুভব হইবে ইহাতে আর সন্দেহ কি? আমাদিগের এই অধোগতির সময় ঐ গতির অবরোধক যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই একান্ত প্রযত্নের সহিত জ্ঞাত হইয়া আচবণে প্রবৃত্ত হওয়া কায়মনোবাক্যে কর্ত্তব্য। কিমধিকমিতি নিবেদনম্। কাশীধাম, ৫ই ফাল্গুন, ১৩২৯ সাল।

শ্রীসোমনাথ শর্ম্মণঃ ভাদুড়ী।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্‌সিপাল শ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ তর্কভূষণ মহাশয় এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেনঃ—

"শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র নিয়োগী মহাশয়ের বিরচিত "ব্রহ্মচর্য্য" নামক পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমি সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ব্রহ্মচর্য্য কাহাকে বলে, তাহার অধিকারী কে এবং তাহার ফল কি এই কয়েকটী বিষয়ের শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রচুর ভাবে উদ্ধৃত করিয়া ঐ সকল প্রমাণ বচনের তাৎপর্য্য অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত করিয়া তৎপ্রসঙ্গে হিন্দুবিধবার আদর্শজীবন ও আচারের আলোচনা দ্বারা নিয়োগী মহাশয় এই ধর্ম্ম বিপ্লবের দিনে, আস্তিক হিন্দু সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। শাস্ত্রতাৎপর্য্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রেরই এই গ্রন্থ যে বড়ই

আদরের হইবে, তাহা আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। ইতি ১২ই ফাল্গুন, ১৩২৯ সাল।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

বৈষয়িক জীবনে, যিনি গভর্ণমেণ্টের পুলিশ বিভাগে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন, এইক্ষণে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম গ্রহণ করিয়া জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী নামে পরিচিত, তিনি "বিধবার কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে তৃতীয় খণ্ড পাঠ করিয়া এইরূপ পত্র দিয়াছেন।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র নিয়োগী
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

আপনার কৃত হিন্দুবিধবার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে গ্রন্থখানি নিজে দৃষ্টিশক্তির ন্যূনতাপ্রযুক্ত পাঠ করিতে ততদূর সক্ষম না হইলেও অপরের দ্বারা পাঠ করাইয়া প্রায় আদ্যন্ত শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। আপনি যে শ্রীমৎভগবৎ গীতা শাস্ত্রখানি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহার পরিচয় অনেকাংশে এই গ্রন্থে দিয়াছেন। বিশ্বাস করি যে এ বিষয়ে আপনার চেষ্টা সফল হইয়াছে। আপনি আপনার বাল বিধবা পুত্রবধূকে উপদেশ ছলে, যে সমস্ত অমূল্য উপদেশাবলী এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহাতে গ্রন্থখানি বাস্তবিকই উচ্চশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। তবে দুঃখের কথা এই যে, এই শ্রেণীর গ্রন্থ পাঠের অধিকারী ও ইচ্ছুকের সংখ্যা আজ কাল বঙ্গদেশে তত অধিক নাই।

অবশ্য স্বীকার করি যে আজ কাল বঙ্গদেশে হিন্দু বিদুষীর সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে, তাঁহাদের অধিকাংশই ইংরাজিশিক্ষিত হিন্দু বলিয়া ভয় হয়। যাহা হউক এই গ্রন্থ দ্বারা দেশের ধর্ম্মপ্রাণা বিধবাগণের বিশেষ সাহায্য হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। নিবেদন ইতি ১৩ই ফাল্গুন, ১৩২৯।

৺কাশীধাম। নং ৬।৩১এ, পীতাম্বরপুরা	নিবেদক শ্রীজ্ঞানানন্দ স্বামী।

৺কাশীধামস্থ বঙ্গীয় সাহিত্য শাখা পরিষদের সেক্রেটারী এবং হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী মহাশয় এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র নিয়োগী মহাশয়ের লিখিত "ব্রহ্মচর্য্য" পুস্তকের অধিকাংশ আমি দেখিয়াছি। ইহার "ত্যাগ" ও "ভক্তি" প্রবন্ধ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বারাণসি শাখায় পঠিত হইয়াছিল। উপন্যাস প্লাবিত বর্ত্তমান সাহিত্য জগতে এইরূপ সৎগ্রন্থ প্রচারের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। লেখক মৌখিক যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণের সহায়তায় হিন্দুর আচার ব্যবহারের সমর্থন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের অন্তর্গত "হিন্দু বিধবার কর্ত্তব্য" অংশ প্রত্যেক হিন্দু বিধবার পাঠ করা কর্ত্তব্য। এই গ্রন্থের উপদেশ অনুসারে তাঁহারা যদি জীবন যাপন করিতে পারেন, তবে চিত্তে পরম শান্তি লাভ করিবেন। গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ। এই পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। ইতি ১৫ই ফাল্গুন, ১৩২৯ সাল।

শ্রীহরিহর শাস্ত্রী।

ভট্টপল্লীর পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ শিরোমণি এম, এ, এবং স্বর্ণ পদকপ্রাপ্ত ও বিখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সুযোগ্যপুত্র মহাশয় ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ময়মনসিংহ নিবাসী বর্ত্তমান ৺কাশীধাম সমাগত নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শর্ম্মা নিয়োগী মহাশয় "ব্রহ্মচর্য্য" নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন, এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত বিভিন্ন শীর্ষক খণ্ডগুলির সহিত সমগ্রই পাঠ করিয়াছি। লেখকের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও বহুদর্শিতার ফলে এই গ্রন্থ রচনা। এই জন্য এই গ্রন্থের মূল্য অত্যধিক। সংসার পথে চলিতে চলিতে যিনি একটুকু শোকদুঃখের আভাস পাইয়াছেন, সমগ্র জীবনের যে কোনও অংশে যিনি ক্ষণকালের জন্যও ভগবানের কথা চিন্তা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এই পুস্তক তাঁহাদের পরম সহায় হইবে সন্দেহ নাই। এই পুস্তকের প্রধান ভিত্তি শ্রীমৎ-ভগবৎগীতা; অন্যান্য পুরাণ, দর্শন এবং মৌলিক যুক্তি ও এই পুস্তক নির্ম্মাণে সহায়তা করিয়াছে। মোহগ্রস্থ নবীন শিক্ষিতমণ্ডলি এই পুস্তক পাঠ করিবেন কি? অনিচ্ছা ক্রমেও যদি পাঠ করেন তাহা হইলেও গ্রন্থকারের শ্রম সফল হইবে। ইহা আমার বিশ্বাস। ইতি ২৫শে ফাল্গুন, ১৩২৯ সাল।

ভট্টপল্লী—

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ দেবশর্ম্মা।

ময়মনসিংহ মুক্তাগাছার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ভক্তপ্রবর পূজ্যপাদ রাজর্ষি শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় "ব্রহ্মচর্য্য" সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন ;—

ময়মনসিংহ নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র নিয়োগী মহাশয়কে আমি বাল্যাবধি বিশেষরূপে জানি। তিনি বর্ত্তমানে ৺কাশীধামে বাস করিতেছেন। একসময়ে তিনি আমাদের মুক্তাগাছার ৺শ্রীশ্রীহরিভক্তি প্রদায়িনী সভার সভ্য ছিলেন। তাঁহার অনেক হরিনাম গানও আছে। সেইগুলি আমাদের পুষ্পাঞ্জলি নামক পুস্তিকাতে লিপিবদ্ধ করা হইরাছে। কৈলাস বাবু সম্প্রতি "ব্রহ্মচর্য্য" নামে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রায় সমস্ত অংশই পঠিত হইতে আমি শুনিয়াছি। এই গ্রন্থে তিনি কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। তাহা শুনিয়া আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। গ্রন্থখানি হিন্দু সমাজের অতি উপাদেয় এবং শাস্ত্র সম্মত জিনিষ হইয়াছে। বালক, যুবক, বৃদ্ধ, সধবা বিধবা সকলেই এই গ্রন্থপাঠে বিশেষরূপে উপকৃত হইবেন, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বিধবাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি যে সকল উপদেশ দিয়াছেন তাহা প্রত্যেক বিধবারই পালনীয়। যাহারা সন্তুষ্ট চিত্তে জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থটী পাঠ করা অতীব প্রয়োজনীয়।

নব্যশিক্ষিত যুবকগণ যদি একবার মাত্র এই গ্রন্থখানি পাঠ করেন তবে তাহারা কর্ম্মজীবনে উন্নতি লাভ করিয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতে পারিবেন। গ্রন্থখানি মোক্ষলাভের পথপ্রদর্শক, বাস্তবিক ইহকালের এবং পরকালের বন্ধু বলিয়া আমি মনে করি। হিন্দু সমাজে ইহা সমাদৃত হইলে আমাদের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে, প্রত্যেক হিন্দু ইহা পাঠ করেন ইহাই আমার আন্তরিক কামনা ইতি—কলিকাতা ৮ই চৈত্র ১৩২৯ সাল।

শ্রীগোপালচন্দ্র শর্ম্মা চৌধুরী।

কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ (Principal) সংস্কৃতে বিশেষজ্ঞ প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন রায় (M.A.) মহাশয় এই মত প্রকাশ করিয়াছেন ;—

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র নিয়োগী মহাশয় তাঁহার কৃত "ব্রহ্মচর্য্য" নামক গ্রন্থের কয়েকটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমাকে শুনাইলেন। প্রবন্ধগুলি বিলক্ষণ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

পণ্ডিত মহাশয়ের উদ্দেশ্য মহৎ। শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মচর্য্যে অনাদরই আমাদের বর্ত্তমান দুর্গতির মূল। এই বোধে ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে কতকগুলি স্থূল কথা সাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়ার অভিপ্রায়ে, ও যদি কদাচিৎ দুই একটী লোকও তাঁহার কথায় ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এই আশায় তিনি পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। সর্ব্বত্র শাস্ত্রের যুক্তি সংগ্রহ করা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে গ্রন্থকার নিজ প্রতিভার বলে যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন। আশা করি গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। ইতি ১৫ই চৈত্র, ১৩২৯।

শ্রীসারদারঞ্জন রায়।

ময়মনসিংহ সুসঙ্গাধিপতি মহামহিম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজা শিবকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর ও তদীয় সুযোগ্য পুত্র পরমাশীর্ভাজন শ্রীমান্ কুমার নরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, বি, এ, মহোদয় "ব্রহ্মচর্য্য" সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন ,—

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র নিয়োগী মহাশয়ের লিখিত "ব্রহ্মচর্য্য" নামক পুস্তকখানা আগাগোড়া মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি। উপন্যাস প্লাবিত সমাজে এই শ্রেণীর পুস্তকের তেমন সমাদর হইবে কি না জানি না ; কিন্তু এই ভাবের পুস্তকের

বহুল প্রচার দ্বারাই যে সমাজের প্রকৃত মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার, সাধুভাবে কর্ম্মজীবন যাপন করিয়া শেষ বয়সে পুণ্যতোয়া গঙ্গাতীরে দেহরক্ষা করিবার আশায় ৺বিশ্বনাথের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তপস্যায় কালাতিপাত করিতেছেন। এই বয়সেই উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি লিখিবার উপযুক্ত সময়।

গ্রন্থকার ব্রহ্মচর্য্য শব্দটী ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। যেরূপ আচরণের দ্বারা মনুষ্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে তাহাই ব্রহ্মচর্য্য। পুস্তকখানি কয়েকটী অংশে বিভক্ত; অবতরণিকা খণ্ডে লেখক ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, দেহ, মন, সুখ, দুঃখ, জ্ঞান অজ্ঞান ইত্যাদি অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে ব্রহ্মচর্য্যের সাধন এবং তাহার ফলস্বরূপ ভক্তির কথা আলোচনা করিয়াছেন। তৃতীয় খণ্ডে হিন্দুবিধবার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যের সহজ পন্থা নামক অধ্যায়ে, লেখক অনেক জ্ঞানগর্ভ অথচ কার্য্যোপযোগী (practical) কথা লিপিবদ্ধ করিয়া পুস্তকখানাকে অতি উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা খানাকে মনন, ধ্যান ও পূজা করিয়া, গ্রন্থকার যে মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাও এই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এই গ্রন্থখানা মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিলে পাঠক বিশেষ উপকৃত হইবেন ইহা আমার স্থির বিশ্বাস।

গ্রন্থকার কেবল বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির চেষ্টা করেন নাই। মোট কথা এরূপ উপাদেয় গ্রন্থ আমি জীবনে অধিক অধ্যয়ন করি নাই। আমরা গ্রন্থখানার বহুল প্রচার কামনা করি এবং ৺বিশ্বনাথের চরণে প্রার্থনা করি যে, গ্রন্থকার সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিয়া এইরূপ বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করুন।

২৬শে বৈশাখ
১৩৩০ সাল
৺কাশীধাম।

শ্রীশিবকৃষ্ণ সিংহ শর্ম্মা
শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা

কলিকাতা হেয়ার স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড্ মাষ্টার বিদ্যাসাগর কলেজের ও চট্টগ্রাম কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পরম-শ্রদ্ধাস্পদ ত্যাগী মহাপুরুষ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভারতী এম, এ, যিনি এখন কাশীধামস্থ ভারত-ধর্ম্ম-মহা-মণ্ডলের কাজে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন তিনি এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন ;—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র প্রণীত “ব্রহ্মচর্য্য” পুস্তকখানি গ্রন্থকার স্বয়ং আমাকে পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন, আমি উহার রচনা প্রণালী ও বিভাগ কৌশল দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ইহাতে ব্রহ্মচর্য্যের স্বরূপ ও সাধনা এরূপ সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে স্বতঃই বোধ হইবে, গ্রন্থকার নিজে একজন ব্রহ্মচর্য্যের সাধক, ও পরিণত বয়সে প্রাণে দারুণ ব্যথা অনুভব করিয়া তিনি লেখনী চালনায় বাধ্য হইয়াছেন।

সুখের বিষয় গ্রন্থকার লিপিচাতুর্য্য পরিহার করিয়াছেন। কেন না অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন পুরুষদিগের বহির্দৃষ্টি স্বভাবতঃ লোপ পাইয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে অনেক গূঢ় ও প্রয়োজনীয় কথা গ্রন্থকার নিজে অনুভব করিতে সমর্থ বলিয়া পরিস্ফুট করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

যাঁহারা সুধী ও ধার্ম্মিক তাঁহারা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সুখী ও পরিতৃপ্ত হইবেন। আরও একটি কথা, ব্রহ্মচর্য্যের সূক্ষ্মতত্ত্ব এবং অঙ্গসমূহ গ্রন্থকার এরূপ বিচারপূর্ব্বক বিশ্লেষণ করিয়াছেন, যে তাঁহার মনীষা দর্শন করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেই পুলকিত হইবেন। প্রত্যুত ইহা পলান্ন নহে, পরমান্ন ; সংসারী প্রেয়কামী ব্যক্তিগণের ইহা অভোজ্য না হইলেও ইহা শ্রেয়কামী যতি সাধুগণের উপাদেয় ভোজ্য।

এরূপ গ্রন্থকারের দীর্ঘজীবন কামনা শিষ্টাচার সম্মত। নিষ্ঠাযুক্ত সময়ে তিনি

এরূপ দুই একখানি পুস্তক লিখিয়া সাধকদিগের সাধু সমিতিতে সহায়তা করুন, ইহাই বিশ্বনাথ সমীপে প্রার্থনা। অলমিতি।
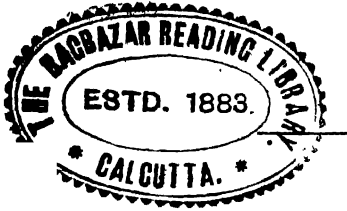
দীনাতিদীন ভারতী।
৺কাশীধাম।

কলিকাতা ব্রাহ্মণ সভার অধ্যাপক পরম শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশিকমল ভট্টাচার্য্য কাব্য-ব্যাকরণ-ন্যায়-স্মৃতিতীর্থ মহাশয় এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ময়মনসিংহ জেলা নিবাসী বর্ত্তমানে ৺কাশীধামনিবাসী শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র নিয়োগী মহাশয় "ব্রহ্মচর্য্য" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। আমি এই গ্রন্থখানি তাঁহার নিকটে সমস্তই মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিয়াছি। উক্ত গ্রন্থে তিনি ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, ব্রহ্মভক্তি ব্রহ্মচর্য্য, এবং তাহার সাধন, বিধবার কর্ত্তব্য ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় বহু বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই সব আলোচনার মূল উপজীব্য ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রসমূহ, বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বহু আলোচনা ইহাতে দৃষ্ট হয়। ঐ সব শাস্ত্রকে উপজীব্য করিয়া অন্যান্য লৌকিক যুক্তির অবতারণাপূর্ব্বক গ্রন্থকার তাঁহার বক্তব্য অতি বিশদভাবে বলিয়াছেন।

এইসব সাধুবিষয়ের অধিক আলোচনা সমাজের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর। সমাজের প্রকৃত কল্যাণ এইসব আলোচনা দ্বারাই হইয়া থাকে, সুতরাং বর্ত্তমান গ্রন্থকারকে "কল্যাণকৃৎ" নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। আমি ৺কাশীধামে তাঁহার দৈনন্দিন জীবন যাপনও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ব্রাহ্মণের যাহা কর্ত্তব্য, বাবা বিশ্বনাথের শ্রীচরণতলে বাস করিয়া ইনি যথাযথভাবে তাহা পালন

করিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যক্তির ধর্ম্মালোচনা যেরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় গ্রন্থখানি তদনুরূপই হইয়াছে।

এই গ্রন্থের "ভক্তি" সন্দর্ভে আমি গ্রন্থকার মহাশয়ের সঙ্গে একমত নহি। এই সন্দর্ভে তিনি "ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে ভক্তির আলোচনা নাই, দর্শনশাস্ত্র, বিশেষতঃ ন্যায়বৈশেষিক, সাংখ্য, মীমাংসা দর্শন ঈশ্বর নিরপেক্ষ" ইহা বলিয়াছেন। দর্শনশাস্ত্রসমূহের পরস্পর বিবিধ বিষয়ে মতানৈক্য থাকিলেও "তত্ত্বজ্ঞানই যে মুক্তির কারণ" এ অংশে সকলেই একমত। ঐ তত্ত্বজ্ঞান কিন্তু সাধনাসাপেক্ষ; সাধনা ভক্তি বর্জ্জিত হইতে পারে না, এই ভাবে দর্শনশাস্ত্রে ভক্তিবাদ আসিবেই। যোগ এবং বেদান্তদর্শনে ঈশ্বরের বহুবিধ আলোচনা রহিয়াছে। প্রাচীনতম বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদের পদার্থধর্ম্মসংগ্রহ ঈশ্বরের আলোচনা বর্জ্জিত নহে। যোগাচারবিভূতি দ্বারা ভগবান্ শঙ্করকে সন্তুষ্ট করিয়া কণাদ ঋষি বৈশেষিক শাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ইহা তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। যাঁহার প্রসাদস্বরূপ বৈশেষিক শাস্ত্র সেই শাস্ত্রে তিনি উপেক্ষ কি না ইহা কি ভাবিবার বিষয় নহে? সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়াচার্য্য উদয়ন স্বপ্রণীত "আত্মতত্ত্ববিবেক" এবং "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা সম্বন্ধে অতি উপাদেয় আলোচনা করিয়াছেন। ন্যায়ের প্রাচীনতম ভাষ্যকার ঋষিকল্প বাৎস্যায়ন ন্যায়শাস্ত্রকে "মোক্ষশাস্ত্র" ও বলিয়াছেন। মীমাংসা শাস্ত্রও আত্মবাদ এবং মুক্তিবাদ পরিবর্জ্জিত নহে। কর্ম্মের কথা, মুক্তির কথা আসিলেই উপাসনার কথা আসিল, উপাসনা উপাস্য ভিন্ন হয় না, সেই উপাস্য কে? নব্য নৈয়ায়িক উপাধ্যায় গঙ্গেশও মুক্তি এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব নহেন। বিশেষতঃ দ্বৈতবাদি দার্শনিকগণের মতে পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান জীবাত্মতত্ত্বজ্ঞানের সহায়ক। এই পরমাত্মাই ঈশ্বর। ঈশ্বর আসিলেই ভক্তি আসিল। দ্বৈতবাদি দার্শনিকদিগের মতে "ব্রহ্মাদ্বৈতপ্রতিপাদক" শ্রুতিগুলি ঈশ্বরাভেদ ভাবনারূপ উপাসনাপর, তাহাদের কৃত দর্শনে যদি ঈশ্বর উপেক্ষ হন তবে কাহার অভেদ উপাসনা হইবে? এইভাবে দর্শনশাস্ত্রসমূহের উদ্দেশ্য এবং সম্প্রদায় পরিশুদ্ধি অতি ধীরভাবে আলোচনা করিলে দর্শনশাস্ত্র ভক্তি বর্জ্জিত এবং ঈশ্বরনিরপেক্ষ"

ইহা বলা অতি সাহসের কার্য্য সন্দেহ নাই। ইহার সমধিক আলোচনা এই ক্ষুদ্র মন্তব্যে অসম্ভব। সার কথা দর্শনশাস্ত্রসমূহের ইঙ্গিত এবং অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করা বহু সময় এবং সাধনা সাপেক্ষ, আশা করি গ্রন্থকার এই কথাটী মনে রাখিবেন।

এই বিষয়টি ভিন্ন গ্রন্থের অন্যান্য সমস্তই শাস্ত্রীয়সিদ্ধান্ত, সুতরাং সেগুলি সকলেরই বিশেষ আদরের বস্তু। ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করি তরলভাবার্দ্র সমাজ গ্রন্থকারবর্ণিত গুরুগম্ভীরভাবে আর্দ্র হউক। পরিশেষে বক্তব্য এই যে গ্রন্থকার তাঁহার আস্তিকতাপূর্ণ সাধুশক্তি এইরূপ শাস্ত্রসেবায় নিযুক্ত করিয়া দেশের যথার্থ "কল্যাণকৃৎ" হউন। ইতি—

নিবেদক—

শ্রীশরৎকমল ভট্টাচার্য্য, মথুরা (পাবনা)

৮৭ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা, কলিকাতা।

ময়মনসিংহ জিলান্তর্গত আশুজিয়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্, এ, মহাশয় এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন ঃ—

ময়মনসিংহের মহারাজা ৺সূর্য্যকান্তের সুযোগ্য কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র নিয়োগী মহাশয় বর্ণাশ্রম বর্ণিত গার্হস্থ জীবনের শেষে ৺কাশীধামস্থ বিশ্বনাথের শরণাপন্ন হইয়াছেন। বিশ্বনাথের ইচ্ছায় তিনি হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থ বেদান্তশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাখানি ধ্যান, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আয়ত্ত করিয়া ও সাধনাবলে প্রত্যেকটী শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ উপলব্ধি করিয়া এই "ব্রহ্মচর্য্য" নামক গ্রন্থখানায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। "ব্রহ্মচর্য্য" অল্পকথায় বলিতে হইলে নিয়োগী মহাশয়ের গীতাধ্যানের একটী স্বর্গীয় "অমৃতফল"। যিনি মনোযোগের সহিত আস্তিক্যভাবে উক্ত গ্রন্থখানি পাঠ করিবেন তিনিই অমৃতের আস্বাদ পাইবেন নিশ্চিত বলিতে পারি।

হিন্দুর "বিধবা বিবাহ" আজকাল একটা বিশেষ আলোচনার বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে। নিয়োগী মহাশয় বিধবা বিবাহে শাস্ত্রের উপদেশ স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং স্বপক্ষে কি বিপক্ষে যে সব তর্ক উপস্থিত হইতে পারে তাহার বিশেষ আলোচনা করিয়া স্বীয় প্রতিভার বলে নানা প্রকার যুক্তির অবতারণা করিয়া স্বীয় মত সমর্থন করিয়াছেন। নিয়োগী মহাশয় ব্রহ্মচর্যে দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে হিন্দুব বৈশিষ্ট স্ত্রীলোকের সতীত্বে (Chestity) এবং পুরুষের ব্রহ্মচর্য্যে (Reasonable control of the senses) সব চেয়ে বড় আদর্শ যাহা আজও হিন্দু পৃথিবীর সকল জাতির সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছে তাহা এই বালবিধবাদের যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য, যাবতীয় ভোগ বিলাস বর্জ্জন, সর্ব্বাঙ্গিন ত্যাগ (Universal sacrifice). নিয়োগী মহাশয় প্রাঞ্জল ভাষায় পৃথিবীর সমস্ত ভোগৈশ্বর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন বালবিধবাদের যে আদর্শজীবন অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা অতি যত্নের সহিত প্রত্যেক বিধবার পালন করা কর্ত্তব্য। যে জীবন দুর্ব্বহ বলিয়া স্ত্রীলোকসাধারণ মনে করে এবং অত্যন্ত দুঃখকাতব, দয়াপরবশ পুরুষগণও মনে করিয়া থাকেন এবং যাহাতে হিন্দু বিধবার পুনর্ব্বিবাহ প্রচলন হইতে পারে তাহার প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহা দুঃখের না হইয়া বরং পরম শান্তিপ্রদ, মোক্ষগামী হইয়া থাকে।

পুরুষ বিবাহিত জীবনে, সংসারের সমস্ত কর্ম্ম করিয়া কি ভাবে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে পারে তাহা নিয়োগী মহাশয় বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন। কোনও ধর্ম্মের প্রতি কটাক্ষ না করিয়া হিন্দুব আচার, নিয়ম, ও দৈনন্দিন কর্ত্তব্যগুলি যাহাতে সকলের উপলব্ধি হয় তাহা লিপিবদ্ধ করিরাছেন। প্রত্যেক হিন্দুর, কি বৃদ্ধ, কি যুবা, কি স্ত্রীলোক সকলেরই—এই "ব্রহ্মচর্য্য" নামক গ্রন্থখানা সাদরে অধ্যয়ন বা অসমর্থ পক্ষে শ্রবণ করা উচিত। ইতি—

বিনীত—

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

"ব্রহ্মচর্য্য"

অবতরণিকা খণ্ড।

ধর্ম্ম।

"নমো ধর্ম্মায় মহতে ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ"

মহাভারত।

ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, মোটামুটি ভাবে মনুষ্য মাত্রেই বুঝে। সুখ ধর্ম্ম-জন্য, দুঃখ অধর্ম্মজন্য। ধর্ম্ম্য কর্ম্ম করিলে, পুণ্য যশঃ এবং সুখ হয়। ইহা মনুষ্য মাত্রেই বুঝে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সম্বন্ধে মনুষ্য মাত্রেরই সাধারণ জ্ঞান আছে। ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে মনুষ্যের সাধারণ জ্ঞান থাকিলেও ধর্ম্মের তত্ত্ব জানা বড়ই কঠিন। কারণ, ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম এবং ধর্ম্মের তত্ত্ব নিভৃত গুহায় নিহিত—দুর্জ্ঞেয়। এমত অবস্থায় ধর্ম্মের তত্ত্ব জানিবার উপায় কি? ভগবান মনু বলিয়াছেন, ঋষিগণ ধর্ম্মবিষয়ে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন সেই সকল, বেদ শাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক দ্বারা যাঁহারা অনুসন্ধান করেন, তাঁহারাই ধর্ম্মকে জানেন। *

নানা অর্থে ধর্ম্ম শব্দের ব্যবহার থাকা দৃষ্ট হয়।

মানবধর্ম্ম—মনুষ্যের ধর্ম্মের ব্যাখ্যা শাস্ত্রে কিরূপ আছে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি।

---

* শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বেদান্তভাষ্যে মনুর বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেনানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ।

মনুসংহিতা ১২। ১০৬।

মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন—যাহা হইতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের সিদ্ধি হয় তাহাই ধর্ম্ম। যাহা হইতে জগন্মঙ্গল ও পারত্রিক মঙ্গল সাধিত হয় তাহাই ধর্ম্ম। ১

মানবধর্ম্মের লক্ষণ কি? অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ; সংক্ষেপতঃ এইগুলি চারি বর্ণের মনুষ্যের ধর্ম্ম। ২

ধৃতি, ক্ষমা, দম (বাহ্য বিষয় হইতে মনের দমন) অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ এই দশটী দ্বিজাতির সাধারণ ধর্ম্মের লক্ষণ। ৩ যে বিপ্রগণ এই দশ লক্ষণ যুক্ত ধর্ম্মের যথাযথরূপ আচরণ করেন, তাঁহারা সেই ধর্ম্মের বা গুণের অতীত হইয়া পরেও জীবিত থাকেন, তৎপর পরকালে পরম গতি লাভ করেন। ৪ অদ্রোহ, অলোভ, দম, জীবগণের প্রতি দয়া, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, অনুক্রোশ, ক্ষমা এবং ধৃতি এই সকল সনাতন ধর্ম্মের লক্ষণ।৫ ধর্ম্মই এক মাত্র সুহৃদ, অন্য যাহা কিছু তৎসমস্তই স্থূল দেহের নাশের সহিতই নষ্ট হয়। কিন্তু ধর্ম্ম মৃত্যুর পরেও সূক্ষ্ম শরীরের সঙ্গে যায়। ৬

১। "যতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ"
বৈশেষিক দর্শন। ২।

২। "অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ"
এতৎ সমাসিকং ধর্ম্মং চাতুর্ব্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ॥

৩। "ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥"

৪। "দশ লক্ষণানি ধর্ম্মস্য যে বিপ্রাঃ সমধীয়তে।
অতীত্য চানুবর্ত্তন্তে তে যান্তি পরমাং গতিম্॥"

৫। "অদ্রোহশ্চাপ্যলোভশ্চ দমো ভূতদয়া তপঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং ততঃ সত্যমনুক্রোশঃ ক্ষমা ধৃতিঃ
সনাতনস্য ধর্ম্মস্য মূলমেতদ্ দুরাসদম্॥" মনু।

৬। "এক এব সুহৃদ্ ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥" মহাভারত।

"বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতৎ চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥" মনু

বেদ স্মৃতি সদাচার এবং নিজের আত্মার অনুকূল বা প্রিয় এই চতুর্ব্বিধই সাক্ষাৎ ধর্ম্মের লক্ষণ। যে স্থলে কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রকারভেদ শাস্ত্রে আছে, সেই স্থলে নিজের প্রিয় বা মনঃপূত যাহা হইবে, তদনুরূপ কার্য্য করিবে। ইহাই ধর্ম্ম।

এখন ধর্ম্ম শব্দের মৌলিক অর্থ কি? ধর্ম্মের আভিধানিক অর্থ এই :—

ধর্ম্ম = ধরতি লোকান্, শুভাদৃষ্ট, পুণ্য, শ্রেয়ঃ এবং সুকৃত।

যে বস্তুকে ধরিয়া রাখে সেই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম নষ্ট হইলে, সেই বস্তুও নষ্ট হয়। দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি :—

আমি মানুষ, মনুষ্যত্ব আমার ধর্ম্ম। যে বিশেষ গুণ দ্বারা মনুষ্য অপর প্রাণী হইতে পৃথক বলিয়া পরিচিত হয়, সেই বিশেষ গুণই মনুষ্যের ধর্ম্ম। প্রাণী মাত্রের বিশেষ গুণ, যাহা প্রাণী মাত্রেরই সাধারণ ভাবে আছে, অপর বস্তুতে নাই; উহাই প্রাণীর ধর্ম্ম। পুনঃ যে বিশেষ গুণ এক প্রাণী হইতে অপর প্রাণীকে পৃথক্ করিয়া পরিচিত করায় সেই বিশেষ গুণ, সেই প্রাণী বিশেষের ধর্ম্ম। মানুষ বানর নহে, বানর মানুষ নহে। কেননা বানরে মনুষ্যের ধর্ম্ম নাই এবং মানুষে বানরের ধর্ম্ম নাই। মনুষ্যের ধর্ম্ম মনুষ্যকে পৃথক করিয়া ধরিয়া রাখে। আমি মানুষ, আমার যদি মনুষ্যত্ব বা মনুষ্যের ধর্ম্ম নষ্ট হয়, তবে আর আমি মানুষ ভাবে থাকিব না। ধর্ম্ম নষ্ট হইলে, কে আমাকে স্বরূপে ধরিয়া রাখিবে? আমি তখন পশুত্বে বা অপর সাধারণ প্রাণিত্বে পরিণত হইব। মনুষ্যের স্বধর্ম্ম স্থির থাকিলে মনুষ্যত্ব স্থির থাকে।

বেদে স্মৃতিতে এবং মানবধর্ম্মশাস্ত্রে মানবধর্ম্মের যে সকল লক্ষণ উপদিষ্ট হইয়াছে, ঐ সমস্তই মনুষ্যের বিশেষত্ব; মনুষ্যেতর প্রাণীতে উহার অস্তিত্ব নাই।

বস্তুর গুণ বা শক্তিকে সেই বস্তুর ধর্ম্ম বলে। অগ্নির দাহিকা শক্তি—অগ্নির

ধর্ম্ম। মরিচের ঝাল শক্তি মরিচের ধর্ম্ম। স্থিতিবিরোধিতা অবয়বী বস্তুসাধারণের ধর্ম্ম। স্থিতিস্থাপকতা বস্তুবিশেষের ধর্ম্ম।

গুণের ক্রিয়াকেও ধর্ম্ম বলে। শীতের ধর্ম্ম সঙ্কোচন। তাপের ধর্ম্ম সম্প্রসারণ।

অন্তঃকরণ বা মনের বৃত্তিকে ধর্ম্ম বলে। দয়া—ধর্ম্ম। সত্য—ধর্ম্ম। অহিংসা—ধর্ম্ম। হিংসা সর্পপ্রভৃতি ক্রূর ও খল জাতির ধর্ম্ম।

জীবের স্বাভাবিক শক্তিকেও ধর্ম্ম বলে। জলে চরা,—মৎস্যের ধর্ম্ম। স্থলে চরা—মনুষ্যাদির ধর্ম্ম। ঘাস খাওয়া গোমহিষাদির ধর্ম্ম।

আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন জীবের সাধারণ ধর্ম্ম।

ইন্দ্রিয়ের কার্য্যগুলিকেও ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম বলে। দর্শন করা চক্ষুর ধর্ম্ম। ঘ্রাণ নেওয়া নাসিকার ধর্ম্ম। আস্বাদ গ্রহণ করা জিহ্বার ধর্ম্ম। শ্রবণ করা কর্ণের ধর্ম্ম। স্পর্শানুভব করা ত্বকের ধর্ম্ম।

দেশধর্ম্ম—যে দেশের যে নিয়ম, সেই দেশের সেই নিয়মকে সেই দেশের ধর্ম্ম বলে।

কালধর্ম্ম—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত।

যুগধর্ম্ম—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, এবং কলি এই চারি যুগের আচার নিয়ম গুলি সেই সেই যুগের ধর্ম্ম।

রাজ ধর্ম্ম—সুনিয়মে প্রজাপালন ও প্রজারঞ্জন করা রাজার ধর্ম্ম। রাজা প্রজা হইতে যথাশাস্ত্র কর গ্রহণ করিবেন। তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিবেন। নরহত্যাকারী এবং প্রাণীর হিংসা ও ক্ষতিকারীদিগের অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে, প্রাণদণ্ড, কায়িকদণ্ড, কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রভৃতি দণ্ড বিধান করিয়া শান্তি স্থাপন করা রাজার ধর্ম্ম। যে রাজার রাজ্যে প্রজাদিগের বিদ্যার উন্নতি, শিল্পকলার উন্নতি, নৈতিক উন্নতি, আধ্যাত্মিক উন্নতি, স্বাস্থ্যোন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় তিনিই আদর্শ রাজা।

জাতি ধর্ম্ম—মনুষ্যজাতি, পশুজাতি, উদ্ভিদ্‌জাতি প্রভৃতির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধর্ম্ম আছে।

কুলধর্ম্ম—যে বংশে বা কুলে, যে আচার এবং যে বিধি-নিষেধ নিয়ত আছে, ঐ আচার এবং বিধি-নিষেধ সেই কুলের বা বংশের ধর্ম্ম। কোন কোন কুলে বাৎসরিক দুর্গোৎসবপূজায় বোধনবমী কল্প, কোন কুলে প্রতিপদাদি কল্প, কোন কুলে ষষ্ঠ্যাদি এবং সপ্তম্যাদি কল্প প্রচলন আছে। কোন কুলে, সন্ধি পূজা হয় না, কুলগত নিষেধ আছে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কুলে, ভিন্ন ভিন্ন আচার এবং বিধি-নিষেধ প্রচলন আছে। সেই প্রচলিত আচার এবং বিধি-নিষেধ সেই সেই কুলের ধর্ম্ম। বেদিয়া জাতির কুলস্ত্রীগণ হাট বাজার করিয়া থাকে, তাহারা পল্লী গ্রামের ঘরে ঘরে যাইয়া নানা প্রকার দ্রব্য বিক্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের প্রতি এমন কঠোর শাসন আছে যে, যে স্ত্রী যে স্থানে যতদূর যাইয়া ব্যবসা করুক ন কেন, তাহাকে সন্ধ্যার সময় নিজ নিজ ঘরে পৌঁছিতেই হইবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে পৌঁছিতে না পারিলে, সে স্ত্রী অপরাধিনী এবং দণ্ডনীয়া হয়। এতৎ সম্বন্ধে একটী গাথা প্রচলিত আছে ঃ—

"বেদিয়া কুলের ধর্ম্ম বলি তোমারে,
শিয়াল ডাকিলে ভাতার নেয়না ঘরে।"

মনুষ্যের ধর্ম্ম সম্বন্ধে আরও কিছু লেখা প্রয়োজন। যে গুণ বা শক্তি মনুষ্যেই আছে, মনুষ্য ভিন্ন অপর জীবে নাই, তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম। মনুষ্য বুদ্ধিজীবী মনুষ্যের বিবেকবুদ্ধি আছে। হিতাহিত, সদসৎ, ধর্ম্মাধর্ম্ম ইত্যাদির জ্ঞান মনুষ্যের আছে বলিয়া মনুষ্য ইতর প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ।

মনুষ্যের কর্ত্তব্য এবং আচরণীয় বলিয়া মনুষ্যের নীতিশাস্ত্রে, ব্যবহারশাস্ত্রে এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা বিহিত আছে, তাহাও মনুষ্যের ধর্ম্ম।

জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, বর্ণধর্ম্ম, এবং আশ্রমধর্ম্ম নিষ্ঠার সহিত যথাযথ পালন করা হিন্দু শাস্ত্রের উপদেশ।

আমরা হিন্দু, হিন্দুর নীতিশাস্ত্রে, ব্যবহারশাস্ত্রে এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে সাংসারিক কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য শ্রুতি ও স্মৃত্যুক্ত যে সমস্ত বিধি-নিষেধ আছে, উহাই

হিন্দু ধর্ম্ম। হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে বর্ণধর্ম্ম এবং আশ্রমধর্ম্ম বিশেষ ভাবে বেদবিহিত। অপর ধর্ম্মীর মধ্যে এই বিশেষত্ব নাই। অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নাই।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি প্রকার বর্ণ বিভাগ বেদে আছে। ইহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মকে বর্ণ ধর্ম্ম বলে।

হিন্দু ধর্ম্ম—ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, এবং সন্ন্যাস এই চারিটী বেদোক্ত আশ্রম বিভাগ আছে। এই আশ্রমোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্মকে আশ্রমধর্ম্ম বলে। হিন্দুর হিন্দুত্ব এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে ধরিয়া রাখে।

হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে সম্প্রদায়ভেদে ধর্ম্মের ভেদ আছে, শাক্ত ধর্ম্ম, বৈষ্ণব ধর্ম্ম, শৈব ধর্ম্ম প্রভৃতি।

ঈশ্বরোপাসক মনুষ্যদের মধ্যে উপাসনা ভেদে ধর্ম্মের ভেদ আছে,—হিন্দু ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, খৃষ্ট ধর্ম্ম, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রভৃতি।

সকল ধর্ম্মেই কাম্য, নিত্য এবং নৈমিত্তিক কর্ম্মের উপদেশ আছে। ধর্ম্মভেদে এই সমস্তের প্রকার ভেদ আছে।

যে সমাজে যে সদাচার অবশ্য পালনীয় বলিয়া বিধিবদ্ধ আছে, উহা সেই সমাজভুক্ত মনুষ্যের ধর্ম্ম এবং উহা অবশ্য কর্ত্তব্য।

মনুষ্য একে অন্যের, পুরুষ স্ত্রীর সহিত, স্ত্রী পুরুষের সহিত, দেশ কাল পাত্রানুসারে, শিষ্টাচারানুমোদিত যেরূপ ব্যবহার করা সঙ্গত, উহাকে লৌকিক ধর্ম্ম বলে।

স্ত্রী-পুরুষ-জাতিভেদে সর্ব্বজীবে, এবং মনুষ্যের ধর্ম্মের ভেদ আছে। যাহা পুরুষের ধর্ম্ম, তাহা নারীর ধর্ম্ম নহে। নারীজাতির মধ্যে যে বিশেষ ধর্ম্ম আছে, তাহা পুরুষের নাই। নারীজাতির মধ্যেও কুমারী ও সধবার একরূপ ধর্ম্ম, বিধবার ধর্ম্ম অন্যরূপ।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্মের মেরুদণ্ড, বর্ণাশ্রম নষ্ট হইলে হিন্দুধর্ম্মের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়। হিন্দুর হিন্দুত্ব বিনষ্ট হয়।

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সকামকর্ম্মফলে জীবের দেহ সৃষ্ট হয়। সৃষ্ট বস্তু মাত্রই

ত্রিগুণাত্মক। সেই গুণ-কর্ম্ম-সংস্কারানুসারে, বিভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন প্রাণীর জন্ম হয়। পশুর গুণ-কর্ম্ম-সংস্কারানুসারে, পশুযোনিতে জন্ম, পক্ষীর গুণ-কর্ম্ম-সংস্কারানুসারে, পক্ষিযোনিতে জন্ম এবং মনুষ্যের গুণ-কর্ম্ম-সংস্কারানুসারে মনুষ্যযোনিতে জন্ম হইয়া থাকে। নাম, রূপ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জাতি, কুল, জন্ম, মৃত্যু সমস্তই দেহগত।

নির্ব্বিশেষ আত্মার নাম-রূপ নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, জাতি-কুল নাই, এবং জন্ম, মৃত্যু নাই। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে মনুষ্যজাতিমধ্যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি জাতি দেহগত। ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারবশতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারবশতঃ ক্ষত্রিয়কুলে, বৈশ্য এবং শূদ্রোচিত সংস্কার বশতঃ এবং শূদ্রকুলে জন্ম লাভ হয়। ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার আমাতে প্রারব্ধ হইয়াছিল বলিয়াই আমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছি। অন্য বর্ণের সংস্কার আমাতে প্রারব্ধ ছিল না বলিয়া অন্যকুলে আমার জন্ম হয় নাই। সেইরূপ মনুষ্যের সংস্কার আমাতে প্রারব্ধ ছিল বলিয়া আমি মনুষ্য হইয়া জন্মিয়াছি। পশু বা কীট হইয়া জন্মি নাই। ইহাই হিন্দুশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

এই জাতিগত পার্থক্যানুসারে, উক্ত চারি জাতির প্রত্যেকের কর্ত্তব্য কর্ম্মের বা ধর্ম্মের পার্থক্য আছে।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতায়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের স্বাভাবিক গুণগত কর্ম্মের বিভাগ বর্ণিত আছে।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রানাঞ্চ পরন্তপ।।
কর্ম্মানি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈগুর্ণৈঃ ॥

গীতা ১৮।৪১

হে পরন্তপ, ব্রাহ্মণগণের, ক্ষত্রিয়গণের, বৈশ্যগণের এবং শূদ্রগণের কর্ম্মসকল স্বভাবজাত গুণের দ্বারা বিশেষভাবে বিভক্ত হইয়াছে।

বর্ণভেদে স্বভাবজাত যাহার যে কর্ম্ম সেই সেই কর্ম্মকে সেই সেই

মনুষ্যের ধর্ম্ম বলা যায়। যেহেতু কর্ত্তব্য কর্ম্মই ধর্ম্ম। স্বভাবজাত কর্ম্ম কর্ত্তব্য-বোধে করিলেই ধর্ম্ম রক্ষা হয়—আত্মোন্নতি লাভ হয়। ইহার অন্যথাচরণ করিলেই অধর্ম্ম এবং পাপ হয়। তাহার ফলে অযশঃ এবং অধোগতি হয়।

ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব অর্জ্জুনের প্রতি, গীতায় শ্রীভগবানের উপদেশ এইরূপ—

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥

গীতা ২।৩১

স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিলেও তোমার কম্পিত হওয়া উচিত হইবে না। যেহেতু ধর্ম্মযুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের আর কিছুই শ্রেয়ঃ বা ধর্ম্ম নহে।

"অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥"

গীতা ২।৩৩

আর যদি তুমি ধর্ম্মযুদ্ধ না কর, তবে তুমি স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি ত্যাগ করিয়া পাপ প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীভগবান আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন--যাহার যে স্বধর্ম্ম উহা বিগুণ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন হইলেও উহারই অনুষ্ঠান করা শ্রেয়ঃ। পরধর্ম্ম উত্তমরূপ অনুষ্ঠিত হইতে পারিলেও উহার অনুষ্ঠান করা শ্রেয়ঃ কল্প নহে। স্বধর্ম্মে থাকিয়া মরণও ভাল, পরধর্ম্ম ভয়াবহ। পাপ ও অধোগতি সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ।

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

গীতা ৩।৩৫

শ্রীভগবান উপদেশ করিয়াছেন—উত্তমরূপ অনুষ্ঠিত পরধর্ম্মাপেক্ষা, অঙ্গহীন স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বোক্ত স্বভাবনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি পাপ প্রাপ্ত হন না।

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥"

গীতা ১৮।৪৭

শ্রীভগবান আরও বলিয়াছেন ঃ—

"সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয়! সদোষমপি ন ত্যজেৎ।"

গীতা ১৮।৪৮

হে কৌন্তেয়, সহজ অর্থাৎ স্বভাবজাত কর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও উহা ত্যাগ করিবে না।

মহাকবি কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলে মৎস্যজীবী ধীবরের মুখে বলাইয়াছিলেন—স্বভাবজাত কর্ম্ম যদি বিশেষরূপ নিন্দনীয়ও হয়, তবু তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ স্বভাবতঃ মৃদু ও দয়ালু হইলেও যজ্ঞার্থে পশু বধ তাহার স্বধর্ম্ম বলিয়া সেই কার্য্যে তিনি দারুণ হইয়া পড়েন। * বর্ণ এবং আশ্রম ধর্ম্মোচিত যাহার যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম উহা নিন্দিত হইলেও সেই সেই বর্ণাশ্রমীর পক্ষে সেই কর্ম্ম করাই ধর্ম্ম। এবং সেই কর্ম্মই সিদ্ধিলাভের উপযোগী।

"স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।"

গীতা ১৮।৪৫

স্বকর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি সংসিদ্ধি (তত্ত্ব-জ্ঞান) লাভ করেন।

মহাভারতের ধর্ম্মব্যাধের উপাখ্যান সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মব্যাধ তত্ত্বজ্ঞানী হইয়াও তাঁহার সহজাতব্যাধবৃত্তি নিষ্ঠার সহিত অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন। নিন্দনীয় বলিয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই।

---

* সহজং কিল যদ্ বিনিন্দিতং নহি তৎ কর্ম্ম বিবর্জ্জনীয়কম্।
পশুমারণকর্ম্মদারুণোঽনুকম্পামৃদুকোঽপি শ্রোত্রিয়ঃ।

অভিজ্ঞান শকুন্তল

সত্ত্বগুণপ্রধান ব্যক্তিরাই স্বভাবতঃ ধার্ম্মিক হন। তাঁহারা দেব, দ্বিজ, গুরু এবং প্রাজ্ঞ লোকের পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহারা দয়া, ক্ষমা, বিনয় এবং ধৃতিগুণ সম্পন্ন হন্। সংক্ষেপতঃ যত কিছু সদ্‌গুণ সেই ধার্ম্মিক লোকের আশ্রয় গ্রহণ করে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বহু তপস্যার ফলে ধার্ম্মিক হইয়া জন্ম লাভ হয়। এবং গীতোক্ত দৈবী সম্পৎ সম্পন্ন হয়। যিনি যে পরিমাণে ধার্ম্মিক তাঁহার হৃদয়ে সেই পরিমাণে নিম্নলিখিত সদ্‌গুণগুলি পরিস্ফুট হয়। যথা— অভয়, চিত্তের সুপ্রসন্নতা, জ্ঞান, যোগস্থিতি, দান, দম, যজ্ঞ, তপ, স্বাধ্যায়, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, সাক্ষাতে কি অসাক্ষাতে পরনিন্দা না করা, সর্ব্বভূতে দয়া, নির্লোভতা, মৃদুতা, লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, অপকারপ্রবৃত্তিশূন্যতা, অনভিমানিতা, এই সকল গুণ দৈবী সম্পদ্ লক্ষ্য করিয়া উৎপন্ন অর্থাৎ পরিণামী পুরুষেরই হইয়া থাকে। *

"দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায়" গীতা ১৬।৫
দৈবী সম্পদ্ মুক্তিলাভের হেতু।

"অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ"—অহিংসা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। অহিংসাবৃত্তি মনে প্রতিষ্ঠিত হইলে, কোন প্রাণীর অনিষ্ট চিন্তা মনে প্রবেশ করিবে না। ভেদ-জ্ঞান দূর হইয়া সর্ব্বত্র সমদর্শন সিদ্ধি হইবে। এই অবস্থায় জীব বিগতভয়, বিগতজ্বর হইয়া নির্ব্বাণ পরমা শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। ইহাই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ। বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হিন্দু মাত্রেরই যত্ন করা কর্ত্তব্য।

---

* অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্।
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥ গীতা ১৬।১-৩

তাহা হইলে, গীতোক্ত দৈবী সম্পদ্ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে এবং তৎপর ইহলোকে যশঃ প্রতিপত্তি এবং পরকালে অনুত্তম গতি লাভ করিতে অধিকার লাভ করা সহজ হয়।

মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনাঃ, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, গৌতম, দক্ষ, শাতাতপ এবং বশিষ্ঠ—এই ঋষিগণ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা। ইঁহারা সকলেই আপ্তকাম, ধর্ম্মতত্ত্বার্থ-বিৎ, এবং ত্রিকালদর্শী; ইঁহারা জগতের হিতের জন্য মানব ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধাসহ আনুগত্য স্বীকার করিয়া ধর্ম্মের তত্ত্ব বুঝিতে যত্নবান্ হইবে। ধর্ম্মের জ্ঞান ভালরূপে না হইলে, ধর্ম্মাচরণেও ভ্রান্তি আসিয়া পড়ে। অধর্ম্মকেও ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। ধর্ম্মকেও অধর্ম্ম বলিয়া সংশয় উপস্থিত হয়। অন্ধ বিশ্বাসে চালিত হওয়াও শাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে। যুক্তিমূলক বিচার করিয়া, শাস্ত্রার্থ বুঝিতে পারিলে প্রকৃত ধর্ম্মের জ্ঞান লাভ হয়। কেবল শাস্ত্রবচন অবলম্বন করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করা শাস্ত্রকারগণ বলেন না। যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্ম হানি হয়।

যুক্তিহীন বিচার কি? বেদশাস্ত্র বিরোধী বিচারই যুক্তিহীন বিচার বলা শাস্ত্রের অভিপ্রায়। শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া খামখেয়ালী মতে চলিলে, ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝা যাইবে না। এতৎ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধের প্রথমেই যে বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে, উহার পুনরাবৃত্তি করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।—

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ, বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেনানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ।”

ঋষিপ্রণীত ধর্ম্মের উপদেশ যিনি বেদ শাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক (যুক্তি) দ্বারা অনুসন্ধান করেন, তিনিই ধর্ম্ম জানিতে পারিবেন। অপরে উহা জানিতে সমর্থ হইবে না।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে আরও দুইটী উপদেশ এই :—

"ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মঃ
ন স ধর্ম্মঃ কুধর্ম্ম তৎ।

যে ধর্ম্ম অপর ধর্ম্মকে বাধা দেয় সে ধর্ম্ম প্রকৃত ধর্ম্ম নহে। উহা কুধর্ম্ম।

মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মদেবের উপদেশ, ধর্ম্মের সর্ব্বস্ব কি শ্রবণ কর, শুনিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিবে। যাহা নিজের আত্মার প্রতিকূল, উহা অন্যের প্রতি আচরণ করিবে না। *

আত্মজ্ঞান লাভ করিলেই সর্ব্বত্র সমদর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়।

আত্মজ্ঞান লাভ করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

* "শ্রূয়তাং ধর্ম্মসর্ব্বস্বং শ্রুত্বা চ হৃদি ধার্য্যতাম্।
আত্মনঃ প্রতিকূলানি ন পরেষাং সমাচরেৎ॥" মহাভারত।

অধর্ম্ম।

যস্মিন কর্ম্মণ্যন্তরাত্মা ক্রিয়মানে প্রসীদতি।
স এব ধর্ম্মো বিজ্ঞেয়ো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।

দেবী ভাগবত

যাহা ধর্ম্ম নয়—ধর্ম্মের বিপরীত তাহাই অধর্ম্ম, যাহা দ্বারা দেহের, দশেন্দ্রিয়ের, মনের এবং আত্মার অনিষ্ট এবং অধঃপতন সংঘটিত হয় ও যাহা আচরণ করিলে মনুষ্য অল্পায়ু হয় এবং যাহা জগতের অনিষ্টজনক তাহাই অধর্ম্ম বা পাপ।

যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী অর্থাৎ যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা স্থিত-প্রজ্ঞ হইতে পারিয়াছেন তাঁহারা গুণাতীত। তাঁহারা ধর্ম্মাধর্ম্মের, পাপপুণ্যের অতীত।

পুণ্য—ধর্ম্মমূলক। পাপ—অধর্ম্মমূলক।

ধর্ম্ম লোককে স্বভাবে ধরিয়া রাখে এবং ক্রমে উন্নতির পথে চালিত করে। অধর্ম্ম লোককে অধঃপাতিত করে। ধর্ম্ম লোকের সুহৃদ্; অধর্ম্ম লোকের শত্রু। ধর্ম্মকে সযত্নে রক্ষা না করিলে, অধর্ম্ম তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়া লোকের অনর্থ ঘটায়। বাহিরের শত্রু লোকের যত ক্ষতি করিতে না পারে, ভিতরের বা অন্তঃকরণের শত্রু অধর্ম্ম তাহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতি করিয়া থাকে।

সৃষ্ট জগৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির কার্য্য। রজঃ ও তমোগুণপ্রধান ব্যক্তিই অধর্ম্মের সেবা করে। রজঃ ও তমোগুণপ্রধান ব্যক্তি অনিচ্ছা সত্বেও অধর্ম্মা-চরণ বা পাপাচরণ করিয়া থাকে।

রজঃ ও তমোগুণজাত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য্য এই ষড়রিপু, অধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক, পাপের সহায়।

শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন—কাম ক্রোধ প্রভৃতি রজোগুণজাত, ইহারা দুষ্পূরণীয় এবং অতিশয় উগ্র। ইহারা মোক্ষ পথের বৈরী। *

অধর্ম্ম হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে, এই জ্ঞান-বিজ্ঞাননাশক বলবান্ পরম শত্রু কাম ক্রোধ প্রভৃতিকে সমূলে নষ্ট করা একান্ত কর্ত্তব্য।

অধর্ম্ম নরকের মূল। নরকভোগ এবং দুঃখভোগ একই কথা। যাহার অধর্ম্মের মাত্রা অধিক সেই নরাধম অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করে। অধার্ম্মিকের প্রতিপদে ভয় এবং ভয়জনিত দুঃখ হইয়া থাকে।

শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—কাম ক্রোধ এবং লোভ, এই তিনটী নরকের দ্বার, এই তিন রিপু আত্মনাশের অর্থাৎ অধঃপতনের কারণ হয়। অতএব এই তিনটীকে ত্যাগ করিবে। †

মূঢ় জীব এই কাম ক্রোধ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া যতকিছু পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়। তাহার ফলে অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছন—দৈবী সম্পদ্ ধার্ম্মিকদিগের প্রাপ্য। আসুরী-সম্পদ্ মূঢ় ও অধার্ম্মিকদিগের আশ্রয় গ্রহণ করে। আসুরী সম্পদ্ বন্ধনের হেতু।

যাহারা অধার্ম্মিক, রজস্তমোগুণপ্রধান হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য (নিষ্ঠুরতা), অজ্ঞান প্রভৃতি অসদ্বৃত্তিগুলি জন্মের সঙ্গেই প্রকাশ পায়। অধার্ম্মিকদিগের মনেই আসুরভাবগুলি প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে নরকে পাতিত করে। ‡

* "কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ গীতা ৩।৩৭

† "ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥ গীতা ১৬।২১

‡ দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানঞ্চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ গীতা ১৬।৪

আদি পুরাণে অধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে—লোক অন্নকামনায় পরস্পরকে ভক্ষণ করে। তাহা হইতে সর্ব্বভূতের বিনাশক অধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। নির্ঋতি অধর্ম্মের ভার্য্যা; রাক্ষসজাতি নির্ঋতির সন্তান, এজন্য রাক্ষসদিগকে নৈর্ঋত বলে। অধর্ম্মের তিন পুত্র,—ভয়, মহাভয় ও মৃত্যু। মৃত্যু অন্তক বলিয়া তাহার ভার্য্যা পুত্র কেহ নাই। তাৎপর্য্য এই:—অধর্ম্মাচরণ করিলে নাশ প্রাপ্ত হয়। অধর্ম্মাচরণের মাত্রানুসারে উৎকট পাপের উৎপত্তি হয়। অতিপাতক, মহাপাতক প্রভৃতি উৎকট পাপ-গুলি পাপী জীবদিগকে অত্যন্ত দুঃখ প্রদান করে। অতিপাতকীদিগের জীবিতকালে কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই। তুষানলে দেহ পাত করাই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। এইরূপ অধর্ম্মাচরণের ফল যে অত্যন্ত দুঃখ ইহা বুঝাইতে হয় না। জীব যে অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু হইয়া এবং কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্ত হইয়া জীবন ধারণ করে, এবং জীবদ্দশায় বহু দুঃখ পায়, ইহজন্মের বা পূর্ব্বজন্মের অধর্ম্মাচরণই তাহার মূল কারণ। *

চৌরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমণের বিষয় হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণনা আছে। জীবের সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্ম্মের ফলেই উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট যোনি ভ্রমণ হইয়া থাকে। অধর্ম্মাচরণে নীচ বা পাপ যোনি প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্মাচরণের ফলে, দুর্লভ মনুষ্য যোনিতে জন্ম হয়। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ, অশেষকল্যাণকর ধর্ম্মাচরণ ও তপস্যার ফল। রজঃ ও তমোগুণাশ্রিত ব্যক্তির স্বাভাবিক মনের ঝোক অধর্ম্মাচরণের দিকে থাকিলে ও তাহার স্বাভাবিক সত্ত্বগুণের ফলে, কোন কোন সময়, ক্ষীণালোকের ন্যায় বিবেক বৈরাগ্যও মনে প্রকাশ পায়।

* "প্রজানামন্নকামানাম্ অন্যোন্যপরিভক্ষণাৎ।
অধর্ম্মস্তত্র সংজাতঃ সর্ব্বভূতবিনাশকঃ॥
তস্যাপি নির্ঋতির্ভার্য্যা নৈর্ঋতা যেন রাক্ষসাঃ।
ঘোরাস্তস্যাস্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ পাপকর্ম্মরতাঃ সদা।
ভয়ো মহাভয়শ্চৈব মৃত্যুর্ভূতান্তকস্তথা।
ন চাস্য ভার্য্যা পুত্রো বা কশ্চিদস্ত্যন্তকোহি সঃ॥

ভগবৎকৃপা ও পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে, নারকী ব্যক্তিকেও, অধর্ম্মের পথ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপথ ধরিতে দেখা যায়। সংযম ও, সদ্‌বৃত্তির অনুশীলনের দ্বারা অধার্ম্মিককেও ধার্ম্মিক হইতে দেখা যায়। অধার্ম্মিক নারকী-দিগের হতাশ্বাস হইবার কারণ নাই। পাপী জীবের উদ্ধারের জন্য সাধু লোকের এবং ভগবানের দয়াদৃষ্টি সর্ব্বদাই আছে।

শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন—ভগবানে ভক্তি লাভ করা বহু সুকৃতির ফল। যদি কোন ব্যক্তি অতিশয় দুরাচারী হইয়াও একমনে ভগবানের ভজনা করিতে পারে, তাহাকেও সাধু বলা যায়। কারণ—ভগবানে তাহার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি আছে। সেই ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইয়া শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়া থাকে। হে কৌন্তেয়, তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার, আমার ভক্ত কখনই নাশ প্রাপ্ত হয় না। *

কিন্তু যাহারা আসুরভাবাপন্ন হইয়া ভগবানকে দ্বেষ করে, ভগবান্ সেই ক্রূর নরাধমকে পুনঃ পুনঃ আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করেন। সেই মূঢ় জন্ম, জন্ম আসুরযোনি পাইয়া অধোগতি লাভ করে। তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সদসৎ কর্ম্মফল নষ্ট হয় না। পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত সৎকর্ম্মের মাহাত্ম্যে নারকীরও মন ধর্ম্মপথে চালিত হয়। রত্নাকর অতিশয় পাপাচারী ছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে, ভগবৎকৃপায়, সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া, পাপমুক্ত হইয়া, কঠোর তপস্যা ও সংযম দ্বারা পরে আদি মহাকবি বাল্মীকি হইয়াছিলেন। †

* অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতোহি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ গীতা ৯।৩০।৩১

† "আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥" গীতা ১৬।২০

অধর্ম্ম সর্ব্বদাই ছিদ্রান্বেষণ করিয়া থাকে। অধর্ম্মের প্রতাপে ধার্ম্মিক সাধু ব্যক্তিরও স্খলন ও পতন হইয়া থাকে। ক্ষাত্রধর্ম্মস্থিত মহাবীর ধার্ম্মিকপ্রবর নলরাজার শরীরে অলক্ষ্যভাবে অধর্ম্ম বা পাপ প্রবেশ করিয়া, তাঁহাকে অশেষ প্রকার দুঃখ দিয়াছিল। নলরাজার সহধর্ম্মিনী দময়ন্তীও পতির অধর্ম্মের সহভাগিনী হইয়া পতিবিরহে কতই না দুঃখ পাইয়াছিলেন।

সর্ব্বদা সদাচাররত থাকিয়া শাস্ত্রবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য করিয়া সৎসঙ্গের সেবা করতঃ অধর্ম্মের হাত এড়াইতে চেষ্টা করিবে। সদ্‌গুরু লাভ হইলেই, সর্ব্বপ্রকাব তাপ হইতে মুক্ত হয়। তাঁহার অভয়পদে বন্ধুত্ব ও আনুগত্য করিলেই সর্ব্বপ্রকাব বন্ধন মুক্ত হইয়া পরম শান্তি লাভ হয়। "ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা" অভয়পদে প্রীতি, আনুগতা থাকিলেই ধর্ম্মজীবন গঠিত হয়। প্রীতিবলে আপনা হইতেই প্রাণে পবিত্রতা সঞ্চারিত হয়। জীবনের কর্ত্তব্যপথ দৃষ্টিগোচর হয়।

নরঋষি অর্জ্জুন অনঘ বা নিষ্পাপ হইয়াও অধর্ম্মের ভয়বর্জ্জিত ছিলেন না। অধর্ম্ম বা পাপকে বড়ই ভয় করিতেন। অধার্ম্মিক আততায়ীগণ মহাপাপী, আততায়ী বধে পাপ হয় না শাস্ত্রে উপদেশ আছে। আততায়ী কে ? যাহারা গৃহে অগ্নি দেয়, বিষ খাওয়ায়, যাহারা শস্ত্র হাতে লইয়া বধ করিতে উদ্যত হয়, যাহারা ধনাপহারী, যাহাবা ভূমি ও স্ত্রী হরণ করে,—এই ছয় প্রকার মহাপাপী আততায়ী। আততায়ীকে আসিতে দেখিলেই কোন বিচার না করিয়া বধ করিবে। আততায়ী-বধে কোন দোব বা অধর্ম্ম হয় না। * কিন্তু অনঘ অর্জ্জুন পাপের ভয় করিয়া

---

* "অগ্নিদোগরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহাঃ
ক্ষেত্রদারহরশ্চৈব ষড়েতে হ্যাততায়িনঃ
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন

শ্রীভগবানকে বলিয়াছিলেন :—

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্॥
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব। গীতা ১।৩৬

দুর্য্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ এবং তাঁহাদের পরামর্শদাতা কর্ণ ও শকুনি-প্রভৃতি, ইহারা যুধিষ্ঠিরাদির বিরুদ্ধে উক্ত ছয় প্রকার আততায়ীর কার্য্য করিয়াছিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, এবং দুর্য্যোধনের সাহায্যকারী অন্যান্য নরপতিগণও আততায়ী মধ্যে গণ্য ছিলেন। ইহাদিগকে বধকরায় পাপ নাই। শাস্ত্রের এই ব্যবস্থা কি অর্জ্জুন জানিতেন না? তবে তিনি ইহাদের বধের জন্য পাপাশঙ্কা করিতেছিলেন কেন? গীতার্থতত্ত্ববিৎ ভাষ্যকার বলেন—আততায়িবধে পাপ হয় না। এ ব্যবস্থা ধর্ম্মশাস্ত্রের নহে। এই বচনটী অর্থশাস্ত্রের ও নীতিশাস্ত্রের নিজের শরীররক্ষার জন্য, ধনসম্পত্তি ও স্ত্রী রক্ষার জন্য আততায়ীকে বধ করিবে, অর্থ ও নীতিশাস্ত্রের অনুশাসনে ইহাতে পাপ নাই এবং রাজদণ্ডও হয় না ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধানে পাপ হইবে।

শ্রুতিতে আছে কোন ভূতকে হিংসা বা বধ করিবে না।* কিন্তু অগ্নি সোমীয় পশু হিংসা বা বধ করিবে।† ইহাও শ্রুতিরই বচন। পরস্পর বিরুদ্ধ উপদেশ শ্রুতিতে থাকিতে পারে না। "মাহিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি"—ইহা সাধারণবিধি।

"যজ্ঞার্থে পশুমালভেত"—ইহা বিশেষবিধি।

যিনি যজ্ঞার্থ পশুবধ করিবেন, তাঁহাকে অল্পবিস্তর পাপগ্রহণ করিতেই হইবে। যজ্ঞের ফল অক্ষয় স্বর্গভোগ। তন্নিমিত্ত অল্পবিস্তর পাপ স্বীকার করিতে সকামকর্ম্মীদিগের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

নিস্পাপ অর্জ্জুনের মনে ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়ায় শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়া বলিয়াছিলেন—"আমি তোমার শিষ্য—তোমার শাসনের অধীন

* "মাহিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি।" † "অগ্নিসোমীয়ং পশুমালভেত"

তোমারই শরণাপন্ন হইলাম। ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাকে শিক্ষা দান কর।”*

শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ করিয়াছেন :—যথাযথভাবে বর্ণধর্ম্মরক্ষায় কোন পাপ হয় না। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়, ন্যায় ও ধর্ম্ম যুদ্ধই তাহার স্বধর্ম্ম, ইহাতে গুরুজন ও জ্ঞাতিবধের পাপ হইবে না।

কর্ত্তব্যকর্ম্মই ধর্ম্ম। কর্ম্মের গতি অতি গহন। কি কাজ করিলে ধর্ম্ম হয়, কি কাজ করিলে অধর্ম্ম হয়, নিজের বুদ্ধিদ্বারা বাছিয়া লওয়া বড়ই কঠিন; সেইজন্য শ্রীভগবান বলিয়াছেন—কার্য্যাকার্য্যের ব্যবস্থাসম্বন্ধে শাস্ত্রই তাহার প্রমাণ। সুতরাং শাস্ত্রবিধান জ্ঞাত হইয়া, সেই শাস্ত্রবিধান অনুসারে কার্য্য করিবে। † যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধান অবহেলা করিয়া, নিজের ইচ্ছামত (খাম খেয়ালিতে) কার্য্য করে সে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। সুতরাং সুখ বা পরাগতি ও লাভ করিতে পারে না। ‡

ধর্ম্মেরদ্বারাই অভ্যুদয় বা উন্নতি লাভ হয়, অধর্ম্মেরদ্বারা অধোগতি লাভ হয়, বলা হইয়াছে।

সংসারস্থিতিকারিনী আদ্যাশক্তি মহামায়া ধার্ম্মিকদিগের গৃহে, অভ্যুদয়কালে স্বয়ং বুদ্ধিপ্রদায়িনী লক্ষ্মীরূপা আবির্ভূতা হন। পুনঃ সেই মহামায়াই অধার্ম্মিক-দিগের গৃহে অলক্ষ্মীস্বরূপা প্রবেশ করতঃ তাহাদিগের বিনাশের হেতু হইয়া দাঁড়ান। ১

তুমি যে বর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং যে আশ্রমে আছ, সেই বর্ণাশ্রমোচিত কর্ত্তব্যকর্ম্ম নিষ্ঠার সহিত করিবে। বিষধরসর্প দংশন করিতে উদ্যত হইলে, যেরূপ ভীতচিত্তে উহা হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার চেষ্টা স্বতঃই হয়, তুমি

* “শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্” গীতা ২।৭

† “তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্মকর্ত্তুমিহার্হসি।” গীতা ১৬।২৪

‡ “যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥” গীতা ১৬।২৩

১ ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীর্বৃদ্ধি প্রদাগৃহে।
সৈবাভাবে তদালক্ষ্মী বিনাশায়োপজায়তে। চণ্ডী-শুম্ভ-নিশুম্ভ বধাধ্যায়। ৪১।

অধর্ম্মকে সেইরূপ ভয় করিবে এবং তাহা হইতে দূরে থাকিবে। অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিবে। যথোপযুক্ত ভক্তিসহকারে সাধুসঙ্গের সেবা করিবে। তাহা হইলে অধর্ম্ম কোন ছিদ্র পাইবে না।

"বৈধহিংসায় পাপ জন্মে।"

শ্রুতির নিষেধবিধিগুলি আপাততঃ পরস্পরবিরুদ্ধ অনুমিত হইলেও বাস্তবিক-পক্ষে কোন বিরুদ্ধ উপদেশ নাই। "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি" অর্থাৎ কোন প্রাণীর হিংসা করিবে না,—এই নিষেধবিধির তাৎপর্য্য এই যে, হিংসা করিলেই পুরুষের প্রত্যবায় বা পাপ জন্মে। "অগ্নি সোমীয়ং পশুমালভেত।" অগ্নি-সোমীয় পশুর হিংসা করিবে ইত্যাদি বিধিদ্বারা যজ্ঞসম্পাদনের নিমিত্ত পশু-হিংসা বিহিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—পশুপ্রভৃতির হিংসাভিন্ন যজ্ঞ সম্পন্ন হয় না। ঐ হিংসাদ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করিবে। * * * প্রকৃত স্থলে কিছুমাত্র বিরোধ নাই। কেননা "কোন প্রাণীকে হিংসা করিবে না" এই নিষেধ বুঝাইয়া দিতেছে, প্রাণিহিংসা করিলে পুরুষকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। "অগ্নিসোমীয় পশুব হিংসা করিবে,"—এই বিধি বুঝাইয়া দিতেছে যে পশুর হিংসা অগ্নীসোমীয় যজ্ঞের উপকারক কিম্বা সম্পাদক। এই দুই বিধির কিছুমাত্র বিরোধ হইতে পারে না। কেননা যজ্ঞীয়-পশু-হিংসা যজ্ঞের সম্পাদন এবং পুরুষের প্রত্যবায় এই উভয়েরই নির্ব্বাহ করিতেছে। সুতরাং এস্থলে বিধিদ্বয়ের বিরোধ বা বাধ্যবাধকভাব হইতে পারে না। শাস্ত্রের যদি এরূপ উপদেশ থাকিত যে অগ্নিসোমীয়-পশু-হিংসা পাপ উৎপাদন করে না, তাহা হইলে বিরোধ বা বাধ্যবাধকতা ভাব হইতে পারিত। যেহেতু পাপের উৎপাদন করা এবং না করা পরস্পর বিরুদ্ধ। ঐ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় এক পদার্থে থাকিতে পারেনা। শাস্ত্রের কিন্তু তেমন উপদেশ নাই।" *

---

* মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রণীত হিন্দুদর্শন।
সপ্তম লেকচার—সাংখ্যদর্শন।

দেহ।

অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ গীতা—২—১৮

"দেহের গৌরব ক'রোনারে যমদরজা খোলা"

"আমি কে?—আমার এই দেহই কি আমি?" নরনারী সকলেরই এইরূপ চিন্তা করা কর্ত্তব্য। আমি বলিতে দেহস্থিত আত্মাকেই বুঝায়। জীবাত্মা দেহ অধিকার করিয়া আছেন, সাধারণ ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। জীবাত্মা এবং দেহ এক পদার্থ নহে। "দেহ এবং আত্মা পরস্পর পৃথক পদার্থ"। প্রথমে মনে এরূপ ধারণা রাখা উচিত। কিন্তু আমরা এতই মোহান্ধ যে, দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে ধারণা করি। দেহ স্থূল বা মোটা হইলে আমি মোটা হইয়াছি এরূপ বলিয়া থাকি। দেহ শুকাইয়া গেলে, বলিয়া থাকি, "আমি শুকাইয়া গিয়াছি।" দেহ মৃত হইলে "আমি মরিয়া যাইব" এইরূপ মনে করি।

নিজের আত্মাকে সকলেই সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসে। এইরূপ আত্ম-জ্ঞানে আমরা দেহকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসিয়া থাকি। দেহের মমতায় আমরা দেহে আসক্ত হইয়া পড়ি। দেহের প্রতিকূল কোন বিষয় উপস্থিত হইয়া, দেহের অল্প বা অধিক পীড়াদায়ক হইলে, আমরা অত্যন্ত চিন্তিত ও ক্লিষ্ট হই। দেহের ক্লেশ দূর করিবার ইচ্ছায় আমরা কর্ত্তব্যকর্ম্মচ্যুত হইয়া পড়ি। দেহের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আরাধ্যদেবতাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাই। যে দেহকে আমরা অত্যন্ত ভালবাসি ও যত্ন করি, সেই দেহের স্বরূপ কি?—সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি।

দেহ অনিত্য, বর্ত্তমান স্থূলদেহ জন্মিবার পূর্ব্বে ছিল না। মরণের পরেও থাকিবে না। ক্ষণকালও বর্ত্তমানদেহের অবস্থা একরূপ থাকে না। ক্ষণে ক্ষণেই দেহের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ক্ষণে ক্ষণে উহার যে পরিবর্ত্তন হয়,

কাল পরে প্রত্যক্ষ হয়।

শিশুকালের দেহের যে অবস্থা, কৈশোরে সে অবস্থা থাকে না; যৌবনের অবস্থা একরূপ, বৃদ্ধাবস্থা অন্যরূপ। মৃত্যু হইলে দেহ চেতনাশূন্য হইয়া পড়ে এবং অল্পক্ষণেই বিকৃত হয়—পরে পঁচিয়া দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া পড়ে।

যে দেহ ক্ষণকালও এক অবস্থায় থাকে না, ক্রমে কৌমার, যৌবন ও জরা প্রাপ্ত হইয়া শেষে নষ্ট হইয়া যায়, সেই দেহের গৌরব করা বা তৎপ্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নহে। *

দেহের প্রতি আমাদের এত মমতা ও আশক্তি কেন?—আত্মার সহিত দেহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; দেহ আত্মার ভোগায়তন। আত্মা দেহে অবস্থিত থাকিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। আত্মার সহিত দেহের খুব মেশামেশি সম্বন্ধ আছে বলিয়া মোহবশতঃ দেহই আত্মা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দেহের সুখে আত্মার সুখ, দেহের দুঃখে আত্মার দুঃখ বলিয়া বোধ হয়। আত্মা কিন্তু দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। দেহের অবস্থার পরিবর্ত্তনে আত্মার কোনই পরিবর্ত্তন হয় না। দেহ ক্ষণভঙ্গুর, আত্মা অবিনাশী। দেহের পরিণাম আছে, আত্মা অপরিণামী! দেহের নাশে আত্মার নাশ হয় না। "দেহ—আমি" এ কথা লোকে বলে না। "আমার দেহ" একথাই লোকে বলিয়া থাকে। কালক্রমে দেহের কোন অংশ ক্ষয় কি নষ্ট হইয়া গেলে, আত্মার কোন ক্ষতি কি কোন অংশ নষ্ট হয় না। কালক্রমে দাঁত পড়িয়া যায়, চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হয়, কর্ণের শ্রবণশক্তি কমিয়া যায়, মাথার চুল উঠিয়া ও পাকিয়া যায়। মৃতদেহে চৈতন্যশক্তি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়। নিত্যচৈতন্যস্বরূপ আত্মা সর্ব্বদাই একরূপ থাকে।

অবিদ্যাবশতঃ জীব নিজের দেহের কর্ত্তা বলিয়া স্পর্দ্ধা করে। কিন্তু সামান্য বস্তুতে জীবের যেটুকু কর্ত্তৃত্ব আছে, নিজের দেহে তাহার সেটুকু কর্ত্তৃত্ব নাই। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যাইতে পারে, একখানা পুস্তক কি অলঙ্কার আমি ইচ্ছা করিলে

---

* দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীর স্তত্র ন মুহ্যতি॥ গীতা ২। ১৩॥

বহুদিন এক ভাবেই রাখিতে পারি [illegible] স্থানীন একরূপ অবস্থায় রাখা যায় ? যৌবনকাল লোকের বড়ই প্রিয়; [illegible] রিয়াও কি যৌবন এক ভাবে রাখা যায় ? চুল পাকিয়া সাদা রং [illegible], শত শত চেষ্টায়ও চুলের কাল রং স্থির রাখা যায় না। যথাসময় দাঁত [illegible] যায়, শত চেষ্টায়ও দাঁত পূর্ব্ববৎ রাখা যায় না। জীবমাত্রেই নিজের দেহটিকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া দীর্ঘজীবী হইতে ইচ্ছা করে, কেহই মরিতে চাহে না - [illegible] ত্যাগ করিতে চাহে না। কিন্তু ইচ্ছা করিয়া মৃত্যুর মুখ হইতে কি দেহ [illegible] করিতে পারে ? তবে দেহের উপর তোমার কর্ত্তৃত্বাভিমান কেন ? যাহার [illegible] তোমার কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব নাই, তবে তাহার প্রতি তোমার এত মমতা বা আসক্তি কেন ?

অপর প্রাণীর এবং নিম্নস্তরের দীনদুঃখী মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, সার্ব্বভৌম-সম্রাট তাহার সসাগরা পৃথিবীর সাম্রাজ্য বিনিময়ে, ধনকুবের লক্ষ্মীবান ব্যক্তি তাহার অতুল ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে, এবং [illegible]পূজ্য প্রথিতযশাঃ মহামহোপাধ্যায় প্রধান পণ্ডিত তাহার শুভ্রযশঃ ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের বিনিময়ে নিজের দেহকে কালের করাল কবল হইতে রক্ষা করিতে পারেন না। নিজের জীবন দিয়াও পিতা এবং মাতা সন্তানের, পত্নী পতির, পতি পত্নীর জীবন রক্ষা করিতে পারেন না। অতএব "দেহের গৌরব ক'রোনারে যম দরজা খোলা"—এই বৈরাগ্যোদ্দীপক মহাজন বাক্যটী সর্ব্বদাই মনে রাখা কর্ত্তব্য।

লোমশ মুনি কল্প-কাল-জীবী। তিনি এত দীর্ঘকাল দেহ ধারণ করিয়াও দেহকে এতই ক্ষণভঙ্গুর মনে করিতেন যে, কখন দেহ নষ্ট হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় তিনি তাহার বাসোপযোগী ঘর প্রস্তুত করাও প্রয়োজন মনে করেন নাই।

দেহ অপবিত্র। জন্মমৃত্যু উপলক্ষে হিন্দুর ঘরে ঘরে যে আচার নিয়ম প্রচলিত আছে, তদ্বারা দেহের অপবিত্রতা স্পষ্ট বুঝা যায়। সূতিকাগৃহ অপবিত্র। মৃত-দেহ বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া প্রদেশবিশেষে গোবর ছড়া দিয়া বাটী পবিত্র করা হয়। মৃতদেহ স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়। জন্ম ও মৃত্যুতে জ্ঞাতি ও নিকট বন্ধুগণ অশৌচগ্রহণ করিয়া থাকেন।

দেহ বস্তুতঃও অপবিত্র ও দুর্গন্ধযুক্ত। রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, প্রভৃতি সমস্তই অপবিত্র। স্নান করিয়া দেহ পবিত্র না করিলে দেবকার্য্যে অধিকার হয় না। একদিন স্নান না করিলে শরীরের দুর্গন্ধ স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। শরীরস্থ বিষ্ঠা, মূত্র, ক্লেদ, সমস্তই অপবিত্র। দেহের অপবিত্র ও কদর্য্য বস্তুগুলি চর্ম্মে আবৃত থাকে বলিয়া আমরা দেহকে সুন্দর মনে করি। দেহের মরণ হইলে অল্পকাল পরেই উহা বিরূপ ও কুশ্রী দেখা যায়।

জীবকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে শরীর বা দেহ মৃত হয়—জীব মৃত হয় না।* তৎপর মৃতদেহ ফুলিয়া, পঁচিয়া বীভৎস আকার ধারণ করে। সুতরাং দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বা পবিত্রতা নাই। রোগ, শোক, জরা, মরণ, দেহের নিত্য-সহচর। মোহবশতঃই দেহে কল্পিত সৌন্দর্য্যের ও স্থায়ীত্বের অভিমান করি। ইহার ফলে আমরা পদে পদে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি।

দাতাকর্ণ সত্যের অনুরোধে ভগবান সূর্য্যদেবের উপদেশ সত্ত্বেও তাহার সহজাত-কবচ-কুণ্ডল পাণ্ডবের হিতাকাঙ্খী দেবরাজ ইন্দ্রের প্রার্থনানুসারে তাহাকে নিজ অঙ্গ হইতে ছিন্নকরিয়া দিয়াছিলেন। ভগবান শ্রীসূর্য্যদেব নিজপুত্র ও ভক্ত মহাবীর কর্ণের মঙ্গলের জন্য তাহার সহজাত-কবচ-কুণ্ডল ইন্দ্রকে না দেওয়ার উপদেশ রক্ষিত হয় নাই। সত্যব্রত কর্ণ অকিঞ্চিৎকর দেহ রক্ষাপেক্ষা সত্যপালনরূপ ধর্ম্মরক্ষা করাই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়াছিলেন। নিজ প্রতিজ্ঞা-রক্ষারূপ ধর্ম্মপালনজন্য, নিজ দেহ ও জীবন অতি তুচ্ছ মনে করিয়াছিলেন। ধর্ম্মরক্ষার্থ দেহপাত করা শাস্ত্রের বিধান আছে।

দধিচিমুনি দেবহিত সাধনের জন্য নিজের দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। শিবি-রাজা শরণাগত রক্ষার জন্য নিজ দেহ কর্ত্তিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

রঘুবংশীয় রাজা দিলিপ তাহার প্রতিপাল্য নন্দিনী গাভীর প্রান-রক্ষার্থ মায়া-সিংহের প্রীত্যর্থে নিজের দেহ পাত করিতে প্রস্তুত হইয়া বলিয়াছিলেন।

---

* "জীবা পেতং বাব কীলেদং ম্রিয়তে ন জীবোম্রিয়তে।" উপনিষদ।

ভূতের অর্থাৎ প্রাণীর প্রতি যদি আপনার দয়া থাকে, তবে এ স্থূল শরীরের প্রতি আপনি দয়া না করিয়া ধর্ম্ম রক্ষিত হইলে যে যশোলাভ হইবে সেই যশোরূপ শরীরে দয়ালু হউন্। *

কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, জ্ঞানী, স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি মাত্রেই দেহের মমতায় স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেন না। বরং দেহপাত হইলেও ধর্ম্ম রক্ষাই করেন। ধর্ম্মের তুলনায় দেহকে অতি অকিঞ্চিৎকর মনে করেন। অতএব দেহের মমতায় ধর্ম্মপথচ্যুত হওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে।

আমাদের বাসোপযোগী সাধারণ গৃহ বা অট্টালিকার সহিত দেহের তুলনা হইতে পারে। অর্থব্যয় ও পরিশ্রমের ন্যূনাধিক্য, উপাদান-দ্রব্য-সম্ভারের উৎকর্ষ এবং অপকর্ষানুসারে নির্ম্মিত গৃহ বা অট্টালিকা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট হইয়া থাকে। গৃহ বা অট্টালিকা কর্ম্মসাধ্য। দেহও আমাদের সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্ম্মের ফল। তপস্যায় এবং সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্ম্মের তারতম্যানুসারে আমরা উচ্চ বা নীচ কুলে, ধনী বা দরিদ্র গৃহে, সুন্দর বা অসুন্দর দেহ প্রাপ্ত হই।

কালপ্রভাবে গৃহ বা অট্টালিকা দিন দিন জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া জরাগ্রস্ত হয়। সেইরূপ দেহও কালপ্রভাবে দিন দিন জীর্ণ শীর্ণ ও জরাগ্রস্ত হয়।

গৃহ ও অট্টালিকা যেমন ঝঞ্ঝাবাত, ভূমিকম্প, ও জল প্লাবন ইত্যাদি দৈব-দুর্ঘটনায় অকালে বিধ্বস্ত ও ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়, দেহও সেই প্রকার মহামারী, প্লেগ, ওলাউঠা ও বসন্ত প্রভৃতি পীড়ায় অকালে নষ্ট হইয়া যায়।

মোহবশতঃ আমাদের বাসোপযোগী বস্তুর প্রতি যতটুকু আসক্তি ও মমতা হওয়া স্বাভাবিক, ভোগ্যবস্তু-সমধর্ম্মি-দেহের প্রতিও ততটুকু আশক্তি ও মমতার অতিরিক্ত হওয়ার কোন বিশিষ্ট কারণ নাই। আমরা ভ্রান্ত-দেহাত্ম বুদ্ধিতেই দেহের প্রতি অত্যধিক আসক্ত হইয়া পড়ি। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ভোগ্যবস্তুতে এবং দেহে সমভাবে আসক্ত থাকেন।

---

* "ভূতানুকম্পা যদি চেত পিস্তাৎ।
যশঃ শরীরে ভবমে দয়ালুঃ॥" রঘুবংশ।

ঈশ্বরোপাসনা ও পূজার জন্য মঠ মন্দির ইত্যাদি দেবগৃহের প্রতি যে পরিমাণ যত্ন ও প্রীতি প্রয়োজন হয়, ঈশ্বর প্রবর্ত্তিত সংসার চক্রের যাবতীয় কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-গুলি অনাসক্ত ভাবে করিয়া যাওয়ার জন্যই দেহের প্রতি সেই পরিমাণ যত্ন ও প্রীতি থাকা প্রয়োজন। দেহের সম্বন্ধে এই ভাবটুকু সর্ব্বদা মনে রাখিয়া চলা সকলেরই কর্ত্তব্য।

দেহ ক্ষণভঙ্গুর হইলেও মানুষের দেহধারণের বিশেষ সার্থকতা আছে। মনুষ্য মাত্রেরই দেহধারণ দুষ্কৃত ও সুকৃত কর্ম্মের ফল ভোগের জন্য। মনুষ্য-দেহ প্রারব্ধ কর্ম্মফল ভোগের জন্য হইলেও মনুষ্য সেই দেহ আশ্রয় করিয়া সাধনা-বলে পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারেন। যথাশাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিয়া যাওয়াই মনুষ্যের দেহ ধারণের প্রয়োজন। দেহরক্ষা ও দেহপাত উভয়ই ধর্ম্মার্থ কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রের উপদেশ আছে।—যে স্থলে দেহ রক্ষা করিলে ধর্ম্মার্জ্জনের বাধা হয় সে স্থলে দেহ পাত করা কর্ত্তব্য;

"শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্"

ধর্ম্মার্জ্জন করাই দেহ ধারণের প্রধান প্রয়োজন। ধর্ম্মার্জ্জনের জন্যই দেহ সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে। যে কাজ করিলে দেহের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া দেহ রুগ্ন হয়, সে কাজ কখনই করিবে না। সদাচারপরায়ণ হইলেই শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষিত হইবে। দেহ সবল ও সুস্থ থাকিয়া ধর্ম্মার্জ্জনের উপযোগী হইবে।

যে পর্য্যন্ত শুদ্ধচিত্ত না হইয়া ভগবৎ প্রাপ্তির অধিকারী না হওয়া যায় সে পর্য্যন্ত শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করার জন্য দেহ সযত্নে রক্ষা করিয়া শত বর্ষ বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিবে।* যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করিয়া যাওয়াই দেহ ধারণের প্রধান প্রয়োজন। যজ্ঞার্থ কর্ম্ম কি, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তাহার বিশেষ উপদেশ আছে।

* "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমা

ঈশোপনিষদ্।

আমরা দেহ ধারণ করিয়া সৎ বা অসৎ কর্ম্ম করিয়া ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম অর্জ্জন করিয়া থাকি। সৎকর্ম্মের সাহায্যে স্বর্গভোগ বা পরম শ্রেয়ঃলাভ করিতে পারি। যাহারা মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া অসৎকর্ম্ম করতঃ অধর্ম্ম বা পাপ অর্জ্জন করে, তাহাদের অধোগতি বা নরক প্রাপ্তি অনিবার্য্য। এইরূপ পাপাচারী মনুষ্যই আত্মঘাতী॥

ব্রহ্মচর্য্য পালন করা এবং তাহার ফলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করাই দেহ ধারণের প্রধান সার্থকতা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখভোগার্থে দেহ ধারণের তাৎপর্য্য নহে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভই দেহের সাধ্য। ধর্ম্মোপার্জ্জন করিলেই—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ থাকিলেই সেই অর্জ্জিত ধর্ম্মই অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ করাইয়া দেয়।

দেহ অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর। কলির মনুষ্যের পরমায়ু (১২০) একশত বিশ বৎসর। এই সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও কখন কাহার মরণ হইবে, নিশ্চয়তা নাই। প্রতিক্ষণেই দেহপাত হইতে পারে। এমতাবস্থায় যতদিন বাঁচিয়া থাকা যায় ততদিন সৎকর্ম্মের সাহায্যে আত্মোন্নতির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যাহাতে আত্মার অধোগতি না হয়, সংসারবন্ধন মুক্ত হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জীবন ধারণ করাই ভগবানের উদ্দেশ্য।

বিবেকযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা আত্মাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবে। আত্মার অবনতি করিবে না। *

আমাদের গ্রামে প্রচলিত হরিসঙ্কীর্ত্তনের এই পদটী;—"দেহের গৌরব ক'রোনারে যম দরজা খোলা" পরমারাধ্যা ৺মাতৃদেবী মৃত্যুজ্বরে পীড়িতা হইয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন,—তাঁহার জীবনের আর আশা নাই, তন্দ্রাবস্থায় সময় সময় তিনি প্রলাপ করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে বলিতেন;—"দেহের গৌরব ক'রোনারে যম দরজা খোলা"। গুরূপদিষ্ট ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় মাতৃমুখনিঃসৃত বৈরাগ্যো-

---

* "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।" গীতা ৬।৫

দীপক মহাজন বর্ণিত এই পদটী আমার হৃদয়ে মুদ্রিত অক্ষরের ন্যায় অঙ্কিত হইয়াছিল। বিপদে, উৎসবে, প্রায় সকল অবস্থাতেই ;—"দেহের, গৌরব ক'রোনারে যম দরজা খোলা" এর ভাবে আমার মন আলোড়িত করিয়া আসিতেছিল। ইহার প্রভাব আমি পূর্ব্বে এত বুঝিতে পারি নাই। বোধ হয় এইভাবের উত্তেজনাতেই আমি ৺কাশীধামে তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিয়াছি। এই ভাবের প্রেরণাতেই আমি মোক্ষশাস্ত্র শ্রীমদ্ভগবদগীতা পাঠে মনো দিয়াছিলাম।

গীতাধ্যয়নের পূর্ব্বে এই মহদ্ভাবটী আমার হৃদয়ে অঙ্কুরিত অবস্থায় ছিল। গীতাপাঠের পরে উহা ক্রমে ক্রমে বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে। এই ভাবের শক্তিপ্রভাবে আমি স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা এবং ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতির অকাল-মৃত্যুতে মোহপ্রাপ্ত হই নাই বলিয়া ঐ মহাজন পদের প্রভাবের উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। এই মহামন্ত্র আমি এতকাল গুপ্তভাবেই রাখিয়াছি; কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। ইহা সাধারণের উপকারে আসিতে পারে মনে করিয়াই এই গুপ্তমন্ত্র এখন প্রকাশ করিলাম।

দেহ ও আত্মা পরস্পর পৃথক বস্তু, ইহা মনে করিয়া প্রত্যেকেরই স্মরণরাখা উচিত। আমরা দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছি, মনুষ্যের উপযোগী, নারীজাতির উপযোগী এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উপযোগী সমস্ত সৎ ও ধর্ম্মকর্ম্মই এই দেহের সাধ্য। এই সমস্ত সৎ ও ধর্ম্মকর্ম্ম করাই দেহধারণের সার্থকতা। ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখিবে।

সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে আমাদের দেহ ভোগসুখের জন্য নহে। আমরা যতদিন জীবিত থাকিব ধর্ম্মলাভের জন্য শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া যাইব। দেহের মমতায় ধর্ম্মপথ বা কর্ত্তব্যপথ ত্যাগ করিব না।

মন।

"মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধ-মুক্তয়োঃ।"

মহাভারত।

মনুষ্যের বন্ধন ও মুক্তির কারণই মন। মনই মনুষ্যকে বন্ধনদশায় রাখে এবং মনই মনুষ্যকে মুক্ত করিয়া দেয়। মনুষ্যজীবনের উপর মনের প্রভাব বা আধিপত্য অত্যন্ত অধিক। বিদ্যালাভ বল, সংযমশিক্ষা বল, ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ বল এমন কি, শ্রেয়ঃলাভের জন্য যে কিছু সাধনা বল, সকলের সহিতই মনের যোগথাকা অপেক্ষা করে। মনোযোগ না হইলে উপরিউক্ত সাধনার কোনটীই সিদ্ধি হয় না। মনকে বশীভূত করিয়া উহাকে ইচ্ছামত চালাইতে না পারিলে মনুষ্য স্বাধীনভাবে কিছুই করিতে পারে না।

"যার সাধনা কর ভাই, মনসাধনা আগে চাই,
শত্রু মিত্র একই মন, বলিয়াছেন ঋষিগণ॥
শত্রু বটে শোধন ছাড়া, মিত্র হয় শুদ্ধি করা।
মনটী যার না বশে রয়, তপ জপ তার কিছু নয়॥
মনের শুদ্ধি কর যদি, পার হবেরে ভব নদী।
যম নিয়মের অনুষ্ঠানে জপ মন্ত্র তাঁরি ধ্যানে॥
ধর্ম্মগ্রন্থ তার সহ, পড়বে ভাই প্রত্যহ।
বিষয়েতে বুদ্ধি ছাড়, মনঃ শুদ্ধি যদি কর॥
এতে হলে মনঃ শুদ্ধি, ইচ্ছামত পাবে সিদ্ধি॥"

মনঃ শুদ্ধি=৯১ পৃষ্ঠা

মনুষ্যের উপরে যে মনের এত বড় প্রভাব, সেই মন জিনিসটা কি? তাহার

স্বরূপ বা স্বভাব কিরূপ? সংক্ষেপতঃ তাহা জানিতে চেষ্টা করিতেছি। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে প্রধান ইন্দ্রিয় মনই আমি।* ইন্দ্রিয় কি? চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়। যতকিছু জ্ঞান বা উপলব্ধি, এই পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা লাভ করিয়া থাকি।

বাক্, পানি, পদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। যতকিছু কাজ এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা করিয়া থাকি।

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় যোগে মোট দশটী ইন্দ্রিয়। মন একাদশ ইন্দ্রিয় —ইন্দ্রিয়ের রাজা বা প্রধান।

রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ এবং গন্ধ এই পাঁচটী হইল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। এই পাঁচটী বিষয়েব অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অপর কোন বিষয় জগতে বা পৃথিবীতে নাই। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি কারণশ্রেণীয়—বহিঃকরণ। জীবমাত্রই এই জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ করে এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা যত কিছু কাজ করে। ইহার প্রত্যেকের সহিত মনের যোগ না হইলে কিছুবই জ্ঞান হয় না এবং কোন কাজও হয় না।

ইন্দ্রিয়গুলি বিষয় আহরণ করিয়া মনের নিকট দেয়। মন উহা গ্রহণ করিয়া জীবকে ভোগ করায়। মন ইন্দ্রিয়গুলির বিষয় গ্রহণ না করিলে জীবের বিষয়ভোগ হয় না। বাহ্য বা বাহিরের বিষয় সম্বন্ধে একথা বলা হইল।

বাহ্যবিষয় অপেক্ষাকৃত স্থূল। যাহা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্ ইহারা কেহই আহরণ করিতে সমর্থ হয় না, এমন সূক্ষ্ম বিষয়ও আছে। সুখ দুঃখ অন্তঃকরণের গ্রাহ্য। সুখদুঃখের ভোগ অন্তঃকরণ দ্বারা হয়। মনই জীবকে সুখ দুঃখ প্রত্যক্ষ করায়।

বাহ্যবিষয় ভোগজন্য যেমন মনের প্রয়োজন, অন্তর্বিষয়—সুখদুঃখ ভোগের জন্য তেমনই মনের প্রয়োজন। মনের এতই শক্তি যে মন জীবকে যেদিকে

---

* "ইন্দ্রিয়ানাং মনশ্চাস্মি" গীতা—১০—২২।

চালায় জীব সেই দিকে চলে। মন জীবকে বহির্ম্মুখী করিয়া রাখিতে পারে, অন্তর্ম্মুখীও করিতে পারে।

মনের শক্তিবশে জীব যখন বহির্ম্মুখী হইয়া পড়ে, তখনি জীব বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়। মনের শক্তিবশে যখন অন্তর্ম্মুখী হইয়া পড়ে, জীব তখন মুক্তিলাভের অধিকারী হয়।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ইহারা বহিঃকরণ; চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইহারা অন্তঃকরণ; মন উভয়াত্মক। জীবদেহ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ভেদে তিন প্রকার। এই তিন প্রকার দেহের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ আছে।

দেহ হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে আত্মা শ্রেষ্ঠ। *

ইন্দ্রিয় মাত্রই চঞ্চল। সর্ব্বদাই বিষয় আহরণে ব্যস্ত। জীবকে চক্ষু রূপ দেখায়, কর্ণ শব্দ শুনায়, নাসিকা ঘ্রাণ অনুভব করায়, জিহ্বা রসাস্বাদন করায়, ত্বক স্পর্শানুভব করায়, সকলের সহিতই মনের যোগ থাকা চাই। মনের সংযোগ না হইলে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ইহার কোনটারই জ্ঞান বা অনুভব হয় না।

ইন্দ্রিয়গণকে চঞ্চল বলা হইয়াছে, মন আরও চঞ্চল। বায়ু অপেক্ষা মনের গতি অধিক। তুমি ৺কাশীধামে আছ, এই তুমি মনে মনে বাড়ী চলিয়া গেলে, বাড়ীর সমস্ত প্রত্যক্ষ করিতেছ। ঐ আবার একলাফে কলিকাতা চলিয়া গেলে; এই আবার মনে মনে নূতনরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার রাজা হইয়া বসিয়াছ।

আমাদের অঞ্চলে সাধারণলোকের মধ্যে মন সম্বন্ধে এই উক্তি আছে:—

"মন-পাগ্‌লা ঘোড়ারে কৈ থেকে কৈ লয়ে যায়?"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ইন্দ্রিয় ও মন সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে—বিক্ষোভকারী

* ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥ গীতা ৩—৪২।

অতি শক্তিশালী ইন্দ্রিয়গণ যত্নশীল মুমুক্ষু জ্ঞানীগণেরও মন বলপূর্ব্বক বিষয়ের দিকে অর্থাৎ বহির্ম্মুখে হরণ করিয়া নেয়। *

মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণের বড় মিশামিশি স্বাভাবিক প্রীতি। যত্নশীল বিবেকী-পুরুষ বিবেক-বৈরাগ্য দ্বারা মনকে অন্তর্ম্মুখী করিতে পারিলেও প্রবল ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্ব্বক মনকে অন্তর্ম্মুখী হইতে না দিয়া বহির্ম্মুখী করিয়া দেয়। অতএব কঠিন সংযম দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত না করিলে মন বশীভূত হয় না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—মন অত্যন্ত চঞ্চল, দেহ ও ইন্দ্রিয় বিক্ষোভকর, বলবান, বিচার দ্বারা অজেয়, দৃঢ় অর্থাৎ বিষয়বাসনা বলিয়া দুর্ভেদ্য। বায়ুকে আট্‌কাইয়া রাখা যেমন অসাধ্য, মনকে নিগ্রহকরা বা বশে আনা সেইরূপ কঠিন। †

তবে মনকে কিরূপে বশে রাখা যায়?—তদুত্তরে ভগবান বলিতেছেন ;—

মন যে চঞ্চল এবং উহাকে নিগ্রহ করা যে কঠিন তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা ক্রমে বশ করা যাইতে পারে। ‡

ইন্দ্রিয় ও মন সম্বন্ধে সংক্ষেপ আলোচনা করিয়া দেখা গেল। ইন্দ্রিয় ও মনকে নিজের বশে আনিতে না পারিলে কল্যাণ লাভের আশা নাই।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ইহারা অন্তঃকরণের বৃত্তি। ইহারা রজঃ ও তমোগুণ হইতে জন্মে ইহারা বহির্ম্মুখী ইন্দ্রিয়ের পরিচর্য্যায় রত।

* "যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥" গীতা—২ ৬০॥

† "চঞ্চলংহি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥"
গীতা—৬—৩৪

‡ অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ গীতা—৬ -৩৫॥

বিবেক, ক্ষমা, আর্জ্জব, দয়া, সত্য, এবং ন্যায় ইহারাও অন্তঃকরণের বৃত্তি। ইহারা সত্ত্বগুণ হইতে জন্মে। ইহারা অন্তর্ম্মুখী। ইহারা ভগবৎ প্রাপ্তির সহায়তা করে।

তমোগুণমিশ্রিত রজোগুণ বাহুল্যেই মনুষ্য জন্মে। সাত্ত্বিক গুণেরও মিশ্রণ আছে। যখন তমঃ ও রজোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখনি কাম, ক্রোধ প্রভৃতির আধিপত্য বৃদ্ধি হয়। সাত্ত্বিক বৃত্তিগুলিকে অভিভূত করিয়া রাখে।

কৃষিক্ষেত্রে যেমন আগাছা ও জঙ্গল স্বতঃই জন্মিয়া ও বৃদ্ধি পাইয়া মূল্যবান শস্য নষ্ট করিয়া ফেলে, মনুষ্যদেহের স্বাভাবিক বৃত্তি, কাম ক্রোধ প্রভৃতিও স্বভাবতঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, সাত্ত্বিক বৃত্তিগুলিকে অভিভূত ও নিষ্প্রভ করে এবং দাবাইয়া রাখে।

মনুষ্যদেহে ইহারা স্বভাবতঃই প্রবল বলিয়া ইহাদের পুষ্টিলাভের জন্য অনুশীলন বা চেষ্টার প্রয়োজন হয় না।

মনুষ্য দৈবসম্পদ্‌সম্পন্ন হইলেও বিবেক, ক্ষমা, আর্জ্জব, দয়া, সত্য প্রভৃতি সাত্ত্বিকবৃত্তিগুলি মনুষ্যান্তঃকরণে স্বভাবতঃ প্রবল নহে, রীতিমত অভ্যাস ও অনুশীলন দ্বারা পুষ্ট করিতে হয়। সাত্ত্বিক গুণাধিক্যে দেবদেহ লাভ হয়, রজো-গুণাধিক্যে মনুষ্যদেহ লাভ হয়। এবং তমোগুণাধিক্যে অসুর, রাক্ষস বা পশুদেহ লাভ হয়। দেবতায় সাত্ত্বিকগুণগুলি প্রবল, অন্য নিকৃষ্টবৃত্তিগুলি দুর্ব্বল, মনুষ্যজন্ম মধ্যবর্ত্তী হইলেও রজোগুণ প্রধান, সুতরাং রজোগুণ হইতে উৎপন্ন, কাম ক্রোধ প্রভৃতি স্বভাবতঃই প্রবল হইয়া পড়ে। অনুশীলনের অপেক্ষা করে না।

সংযম নিয়মাদি দ্বারা সাত্ত্বিকবৃত্তিগুলি পুষ্ট ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে স্বাভাবিক আসুরবৃত্তি কাম ক্রোধাদি অভিভূত বা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয় বশীভূত করিতে পারিলে কাম ক্রোধাদির প্রভাব দূর হয়। মনুষ্যের প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। যাহার ইন্দ্রিয় বশীভূত তাহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। *

* "বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।" গীতা—২—৬১।

অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে ইন্দ্রিয় বশীভূত করা প্রধান কর্ত্তব্য। মনকে বশে আনিতে না পারিলে, ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত ক'রবার চেষ্টা বৃথা। কারণ মনই ইন্দ্রিয়ের রাজা। যাহার মন ও ইন্দ্রিয় বশীভূত হইয়াছে, তাহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনিই ব্রহ্মপদ লাভের অধিকারী।

সংসার।

"অনিত্য মসুখং লোকম্।" গীতা ৯।৩৩।

ভক্তি ও জ্ঞান ভিন্ন ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা হয় না—ব্রাহ্মীস্থিতিলাভ হয় না বৈরাগ্য ভিন্ন ভক্তি ও জ্ঞান লাভ হয় না। আবার ইন্দ্রিয়সংযম ভিন্ন বৈরাগ্য বা বিষয়-বিরাগ জন্মে না। কোন্ জিনিস্‌টা নিত্য এবং কোন্ জিনিস্‌টা অনিত্য ইহার জ্ঞান না হইলে অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্য জিনিষ জানিতে না পারিলে, নিত্য বস্তুর প্রতি মনের অনুরাগ বা ভালবাসা এবং অনিত্য বস্তুর প্রতি মনের বিরাগ বা দ্বেষ জন্মে না। অনিত্য বিষয়ে মনের বিরাগই বৈরাগ্য।

অনিত্য বিষয় কি? গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—মাটী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ এই পাঁচটী স্থূলভূত। ইহাদের সূক্ষ্মাবস্থাই পঞ্চ তন্মাত্র। এই পঞ্চ মাত্রার সহিত ইন্দ্রিয় ও মনের স্পর্শ হইলে শীতোষ্ণ, সুখ, দুঃখ এবং জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। সুখ দুঃখ প্রভৃতির জ্ঞান চিরস্থায়ী থাকে না। ইহারা আগমাপায়ী অর্থাৎ এই আসে এই যায়; সুতরাং অনিত্য।

"মাত্রা স্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখ দুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাং স্তিতিক্ষস্ব ভারত॥
গীতা—২—১৪।

সংসারের বা জগতের যতকিছু জ্ঞান, তৎসমস্তই ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সহিত মনের স্পর্শজাত। যাহা কিছুর রূপ চক্ষুদ্বারা আমরা দেখি, যাহা কিছুর শব্দ আমরা কর্ণদ্বারা শুনি, যাহা কিছুর গন্ধ আমরা নাসিকাদ্বারা অনুভব করি, যাহা কিছুর রস আমরা জিহ্বাদ্বারা আস্বাদন করি, আমাদের শরীরের চর্ম্মে যাহা কিছু স্পর্শানুভব করি, তৎসমস্তকে বিষয় বলে। এই সমস্ত বিষয়গুলিই অনিত্য।

বিষয় লইয়াই সংসার। সুতরাং সংসার অনিত্য। এই সমস্ত অনিত্য বিষয়ের প্রতি বা সংসারের প্রতি মনের আসক্তি, অনুরাগ বা ভালবাসা না থাকার নামই বৈরাগ্য।

মনে এইরূপ বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে ভক্তি ও জ্ঞানলাভের পথ সুগম হয়।

সংসারের সহিতই আমাদের মাখামাখি অত্যন্ত অধিক। সুতরাং সংসারটা কি? ভাল করিয়া বুঝা উচিত।

আমরা সংসারী জীব। সংসারেই আমাদের জন্ম, কর্ম্ম এবং মৃত্যু। মহামায়ার প্রভাবেই এই সংসারস্থিতি। সেই মহাদেবী সংসার-রূপ-সমুদ্রে মায়াজাল ছড়াইয়া ছোট বড় সকল জীবকেই তাঁহার বেড়ের ভিতর পুরিয়া রাখিয়াছেন। জেলে যেমন বড় নদীতে জগৎবেড় জাল ছড়াইয়া রুই, কাত্‌লা, বোয়াল হইতে পুঁটি মাছ পর্য্যন্ত ছোট বড় সকল মৎস্যকেই জালের ঘেরের ভিতর আট্‌কাইয়া রাখে, মহামায়া জগন্ময়ী তেম্‌নি ছোট বড় সংসারী জীবকে আট্‌কাইয়া রাখিয়াছেন।

মৎস্যদিগের মধ্যে যাহারা চালাক তাহারা চালাকী করিয়া জালের বেড় হইতে পাশ কাটিয়া মুক্ত হইয়া থাকে। সংসারীজীব মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহারা দৈবসম্পদ্‌-সম্পন্ন, ধার্ম্মিক, মুমুক্ষু তাহারা সাধনার বলে মহামায়ার পাশ কাটাইয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। সংসারই আমাদের বন্ধন। এই

সংসারে থাকিয়াই আমরা জন্মিয়া মরিতেছি ও মরিয়া জন্মিতেছি। জন্ম-মর প্রবাহের বিরাম নাই। এই সংসারে থাকিয়াই আমরা সুখে নৃত্য করিতেছি দুঃখে ক্লিষ্ট ও দগ্ধ হইতেছি।

সাংসারিক সুখ-দুঃখের পরিমাণ করিলে দেখা যায়, কি ছোট, কি বড় সকলেরই দুঃখের মাত্রাই অধিক, সুখের মাত্রা খুব কম। আমরা যে সুখ পাই, তাহাও দুঃখের সহিত জড়িত—খাঁটি সুখ নহে। সুতরাং উহাও দুঃখ মধ্যে গণ্য।

এই সংসারের স্বরূপ কি?—অতি সংক্ষেপেই তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব অনাদিকাল হইতে জীবের কর্ম্মলব্ধ প্রাচ বাসনামূলে শরীরপরিগ্রহই সংসার ইহাই দার্শনিকদিগের মত।

আমরা মৃত্যুসময়ে যেরূপ বাসনা মনে পোষণ করিয়া মরি, সেই বাসনামূলেই আমাদের জন্ম হয়, আমরা সংসার প্রাপ্ত হই। নির্ব্বাসন হইলেই সংসার নষ্ট হয়। কোনরূপ বাসনা না থাকিলেই জন্ম হয় না, পুনঃ সংসারে আসিতে হয় না।

কেহ কেহ বলেন সংসারে দুঃখের ভাগ অল্প, সুখের ভাগই অধিক। আমরা সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা, রত্নগর্ভা বসুন্ধরায় বাস করি। উহার ফলে, জলে, স্থলে, গিরিকাননে, সুখের উপকরণ অনন্ত ধন রত্ন আছে, এব যত্ন করিলেই সুখের সমস্ত সামগ্রী আমাদের করায়ত্ত হয়। ঐসমস্ত ঐশ্বর্য দ্বারা খাও, দাও, বেড়াও, সুখে থাক। "যাবজ্জীবেৎ" সুখং জীবেৎ," দুঃখ কোথায়?

অপর কেহ বলেন, সংসারে সুখ ও দুঃখের মাত্রা সমানভাগ আছে দিবারাত্রি, শুক্লপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ, এবং আলো ও অন্ধকারের যেরূপ তুল্যভাগ ব্যবস্থা আছে, সংসারের সুখদুঃখও সেইরূপ সমভাবে ব্যবস্থিত।

এইরূপ নানা জনের নানা মত থাকিলেও যাহারা অজ্ঞানী ও মায়ানু তাহারাই সংসারকে সুখের মন্দির মনে করে। প্রকৃত তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ

সংসারকে দুঃখবহুল মনে করিয়া উহাকে দুঃখের আলয় বলিয়াই মনে করিয়াছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় সংসারকে দুঃখালয়, অশাশ্বত এবং মৃত্যুগ্রস্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যথা সংসার ;—

"দুঃখালয়ং অশাশ্বতং"

দুঃখের আলয় এবং অশাশ্বত, অস্থায়ী।

"মৃত্যু সংসার বর্ত্মনি"—মৃত্যুগ্রস্ত সংসার পথে।

"অনিত্যমসুখং লোকং"—এই লোক অনিত্য এবং অসুখের কারণ। ষড়্‌দর্শনপ্রণেতা ঋষিগণও সংসারকে দুঃখময় বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সংসার বা দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই মানুষের পরম পুরুষার্থ।

সংসার দুঃখময় ও অনিত্য কেন?

সংসার অনিত্য—সংসারে কিছুরই স্থিরতা নাই। সংসারের সমস্তই আজ আছে, কাল নাই। এই জন্ম, এই মরণ! উৎপত্তির বিনাশই সংসারের ধর্ম্ম। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্র, ধনসম্পত্তি কিছুই স্থায়ী থাকে না। আগে পাছে সমস্তেই চলিয়া যায়। মৃত্যুগ্রস্তই সংসার।

সংসার দুঃখময়। জন্মিতে দুঃখ, মরিতে দুঃখ, বিদ্যাভ্যাস করিতে দুঃখ, ধনোপার্জ্জন করিতে দুঃখ, ধন রক্ষা করিতে দুঃখ, পিতামাতা, স্ত্রীপুত্র, সুহৃদ্ বান্ধব প্রভৃতির মৃত্যুতে দুঃখ। দেহী মাত্রই ত্রিতাপতপ্ত। ত্রিতাপ যেন প্রাণী মাত্রকেই জড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে।

ত্রিতাপ কি?—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক—এই ত্রিতাপ।

আধ্যাত্মিক—রোগাদি শারীরিক দুঃখ এবং প্রিয়বস্তু বিনাশে মনের দুঃখই আধ্যাত্মিক দুঃখ বা তাপ।

আধিদৈবিক—শীতকালে শীতের জন্য দুঃখ, গ্রীষ্মকালে গরমের জন্য দুঃখ, বর্ষাকালে বৃষ্টির জন্য দুঃখ, জলপ্লাবন—দুঃখ, প্রখর রৌদ্রে জল শুকাইয়া জলের অত্যন্ত অভাব হইলেই দুঃখ, অগ্নিদাহ দুঃখ ইত্যাদি দৈব সংঘটিত যে দুঃখ উহাই আধিদৈবিক দুঃখ বা তাপ।

আধিভৌতিক দুঃখ—সিংহ, ব্যাঘ্র, মহিষ, সর্প, বৃশ্চিক, মশা, মাছি এবং চোর, ডাকাত ও রাষ্ট্র বিপ্লব প্রভৃতি হইতে যে দুঃখ পাওয়া যায় উহাই আধিভৌতিক দুঃখ বা তাপ।

এই ত্রিবিধ প্রকারের দুঃখ বা তাপ সংসারী জীবমাত্রকেই ভোগ করিতে হয়। মনুষ্য সর্ব্বদাই এই ত্রিতাপে জ্বালাতন এবং পেশিত হইতেছে। সুতরাং সংসারটা যে বাস্তবিক দুঃখময় তাহাতে সন্দেহ নাই। মায়ামুগ্ধ অজ্ঞানী জীবই সংসারে সুখের আশা করিয়া থাকে। কিন্তু প্রতিপদেই দুঃখভোগ করিয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। স্বরূপতঃ সংসারটা দুঃখময় বলিয়াই ধারণা করা উচিত। সংসার লাভ করা মনুষ্যের বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিত নহে। যাহাতে সংসারনিবৃত্তি হইয়া দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি হয়, এবং শাশ্বত পরমকল্যাণ লাভ হয়, সেই উদ্দেশ্যে মনুষ্যমাত্রেরই কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। সেই পরমকল্যাণই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ। কারণ মনুষ্যমাত্রেই যাহা উপাদেয় এবং ইষ্ট তাহাই চায়। যাহা মন্দ, দ্বিষ্ট এবং দুঃখজনক তাহা হইতে মনুষ্যমাত্রই দূরে থাকিতে ইচ্ছা করে। দুঃখের বিষয় অবিদ্যার কুহকে ভুলিয়া অজ্ঞানীলোক আশুসুখকর, পরিণামবিরস বস্তুকেই সুখের উপকরণ মনে করিয়া উহা লাভের জন্য সমস্ত শক্তি ব্যয় করে। ফলে দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া অনুতপ্ত হয়।

সুখ ও দুঃখ।

কর্ম্মফলভোগের জন্য শরীর ধারণ বা জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কর্ম্মফলভোগ, সুখদুঃখ ভোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। শরীরী বা প্রাণীমাত্রেই সুখদুঃখ অনুভব করে। সুখ ও দুঃখ উভয়ই ভাবপদার্থ। অভাবপদার্থ নহে। অর্থাৎ সুখের অভাবে দুঃখের অনুভব এবং দুঃখের অভাবে সুখের অনুভব হয় এমত

নহে। স্বতন্ত্রভাবে সুখদুঃখের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। সুখ ধর্ম্মজন্য, দুঃখ অধর্ম্ম-জন্য। সুখদুঃখ গুণপদার্থ। সুতরাং কোন বস্তুর আশ্রয়ে থাকিবেই। সুখদুঃখ দেহের ধর্ম্ম। দুঃখ বৈষয়িক। সুখ ত্রিবিধ—বৈষয়িক, যোগজ এবং ব্রহ্মানন্দ।

শ্রীভগবান শরীরকে ক্ষেত্র বলিয়াছেন ;—হে কৌন্তেয়! এই শরীরই ক্ষেত্র।* এখন ক্ষেত্র কি?—শ্রীভগবান বলিয়াছেন ;—পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মূলপ্রকৃতি, একাদশ ইন্দ্রিয়, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ, দ্বেষ, শরীর, জ্ঞান নামক মনোবৃত্তি এবং ধৈর্য্য এতৎ সমুদয়কে সংক্ষেপে সবিকার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিসমন্বিত ক্ষেত্র বলা যায়। ক্ষেত্র মাত্রই পরিণামস্বভাব—সুখ, দুঃখ দেহের ধর্ম্ম বলিয়া সুখ দুঃখ প্রভৃতিকে ক্ষেত্রসংজ্ঞান অভিহিত করা হইয়াছে। †

শরীর ত্রিবিধ—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ। অন্তঃকরণ সূক্ষ্মশরীরের একটা অংশ। সুখ দুঃখ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম বা গুণ। এই কারণে সুখ দুঃখকে শরীরের ধর্ম্ম বলা হইয়াছে। শরীর অনিত্য, সুখ দুঃখও অনিত্য, সুখ দুঃখ শরীরের সঙ্গেই থাকে। স্থূল শরীর নষ্ট হইলে, সুখ দুঃখ সূক্ষ্ম শরীরের সঙ্গে চলিয়া যায়। যাঁহারা সাধনাবলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা দ্বন্দ্বাতীত ও গুণাতীত হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারা সুখ দুঃখ সমজ্ঞান করেন। সুখ দুঃখ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহারা সুখে নিস্পৃহ এবং দুঃখে অনুদ্বিগ্ন।

সাংসারিক জীবমাত্রেই বৈষয়িক সুখ দুঃখের হাত এড়াইতে পারে না। সকলেই সুখ দুঃখের অনুভব করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের এমনি সুব্যবস্থা আছে যে, উচ্চ, নীচ, ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, রাজা, প্রজা, সকল

* "ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে। গীতা ১৩।১।

† মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ।
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥ গীতা ১৩,৫।৬

প্রকার মনুষ্যই এবং সকল প্রকার প্রাণীই যে যে অবস্থায় থাকুন না কেন তিনি সেই অবস্থায় থাকিয়াই সমভাবে সমমাত্রায় বৈষয়িক সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন

সার্ব্বভৌম সম্রাটের সুখ দুঃখ ভোগের মাত্রা এবং অতি নিকৃষ্ট বিষ্ঠার ক্রিমি-কীটের সুখ-দুঃখ ভোগের মাত্রা ওজন করিলে সমানই দাঁড়াইবে। তাহার কারণ এই, সকলেই মনের সঙ্কল্পজাত দুষ্পূরণীয় বাসনার বশবর্ত্তী। সেইজন্য বর্ত্তমান অবস্থাতে কেহই তৃপ্ত এবং সন্তুষ্ট হইতে পারে না।

বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা সঙ্কল্পিত কাল্পনিক ভাল অবস্থা প্রাপ্ত হইতে সকলেই লালায়িত। বিষয়ভোগে কোনদিনই বাসনার পরিতৃপ্তি হয়না। অতৃপ্ত বাসনাতেই দুঃখ জন্মায়। সুতরাং সকল শ্রেণীর বিষয়লোলুপ জীবমাত্রেই নিজ নিজ অবস্থার গণ্ডীর ভিতরে সমান ভাবেই বৈষয়িক সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। মনের সঙ্কল্প বর্জ্জন করিয়া নির্ব্বাসন হওয়াই শান্তি ও ব্রহ্মানন্দরূপ সুখ লাভের এক-মাত্র উপায়।

জীবমাত্রেই সুখ চাহে। দুঃখ চাহেনা কেন? সুখ-স্বরূপ-পরমাত্মা আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, জগতের প্রত্যেক বস্তুর ভিতরে ও বাহিরে আছেন। ঘটাকাশ যেমন প্রকৃতির পরিণাম—ঘট-উপাধি—ঘট-শরীর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ হইয়াছে, পরমাত্মা ও তেমনি জীবাত্মা রূপে প্রকৃতির গুণ-জাত ভোগায়তন শরীর-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়াছেন। জীবাত্মা প্রতি শরীর ব্যাপী, পরমাত্মা সর্ব্বগত, সর্ব্বশরীরের ভিতরে ও বাহিরে আছেন। শরীরই জীবের বন্ধন-কারাগার। এই বন্ধনে বা কারাগারে থাকিয়া যতকিছু দুঃখ ভোগ করা হয়। জীবাত্মা স্বাভাবিক ইচ্ছাতেই বন্ধন বা কারাগার মুক্ত হইয়া পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়। পরমাত্মা আনন্দ বা সুখ-স্বরূপ। * সেই আনন্দকণা প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুতে বা বিষয়ে অল্প বা অধিক পরিমাণ আছে বলিয়া সেই আনন্দ পাইবার জন্য জীব লালায়িত, এবং মোহবশতঃ প্রকৃত সুখ পাইবে বলিয়া বৈষয়িক সুখে অনুরক্ত

---

* সুখশীর্ষক নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

হয়। যাঁহার পরমানন্দ স্বরূপ আত্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে, তিনি আনন্দ সাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বৈষয়িক ক্ষুদ্র আনন্দলাভে তৃপ্তি সাধন হয়না।

জল প্লাবনে দেশ ভাসিয়া গেলে ইচ্ছামত ব্যবহারোপযোগী জল সর্ব্বদাই পাওয়া যায়। কূপ, পুষ্করিণী এবং নদীর জল আহরণ করিতে হয়। সেইরূপ যাহার ব্রহ্মানন্দলাভের সৌভাগ্য হইয়াছে, তাহার বিষয়বিশেষে বিবিধ ক্ষুদ্রানন্দ লাভের ইচ্ছা থাকে না। ব্রহ্মেই সুখের প্রতিষ্ঠা সুতরাং সুখময় পরমাত্মাকে চাহে বলিয়া জীব সুখ চাহে—দুঃখ চাহে না। ব্রহ্মানন্দে দুঃখের অস্তিত্ব নাই—দুঃখের প্রতিষ্ঠা নাই।

দুঃখ।

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্।"

দুঃখ কি ?—মিথ্যাজ্ঞান-প্রবর্ত্তিত রজোগুণ হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়। মিথ্যা-জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়াই মনুষ্য পাপ বা অধর্ম্মাচরণ করে। তাহার ফলে দুঃখভোগ করে। রজঃ-কার্য্য দুঃখ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অধর্ম্মাচরণের ফল বলা যাইতে পারে। মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইলে দুঃখও নষ্ট হইয়া যায়। তত্ত্বজ্ঞান হইলে মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হয়, তখন দুঃখের অনুভব হয় না।

দুঃখ অন্তঃকরণের বৃত্তি বা ধর্ম্ম। প্রাণী মাত্রেই দুঃখের অনুভব করে। দুঃখ অনিত্য—দুঃখ ত্রিবিধ ;—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। সংসারের অনিত্যতা বর্ণনা প্রসঙ্গে সংক্ষেপে ত্রিবিধ দুঃখ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। এইস্থানে উহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

দুঃখের স্বরূপ—যাহা আত্মার প্রতিকূল বলিয়া জানা যায়, তাহাই দুঃখ। আত্মা বলিতে জীবাত্মাই বুঝিতে হইবে। আমরা দেহধারী জীব, দেহের বা

মনের যাহা দ্বিষ্ট বা প্রতিকূল তাহাই দুঃখ। যে বিষয় বা বস্তু হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়, সেই বিষয় বা বস্তু দুঃখজনক। জীবমাত্রেই সেই দুঃখজনক বস্তু বা বিষয় দেখিতে, শুনিতে বা পাইতে ইচ্ছা করেনা, ভালবাসে না। উহা যদি জীবের ভোগের জন্য উপস্থিত হয়, জীব উহা দেখিয়া শুনিয়া বা পাইয়া দুঃখ অনুভব করে। সেই দুঃখজনক বস্তু হইতে দূরে থাকিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে।

পণ্ডিতগণ বৈষয়িক সুখকেও দুঃখ মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়স্পর্শযোগে যে ভোগ হয়, তৎসমস্তই দুঃখের কারণ। এই সমস্ত ভোগের আদি ও অন্ত আছে। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি এইরূপ ভোগে অনুরক্ত হন না। যে সমস্ত বস্তুর আদি আছে অর্থাৎ যাহা সৃষ্ট বা উৎপন্ন হয়, তৎসমস্তের অন্ত বা নাশ আছে। এইরূপ অস্থায়ী বস্তু দুঃখেরই কারণ। এসমস্ত অস্থায়ী বস্তু হইতে দুঃখ প্রাপ্তি হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি অস্থায়ী ভোগ সুখের কখনই আদর করেন না। *

প্রাণী মাত্রেরই স্বভাবতঃ দুঃখ হইতে দূরে থাকিবার ইচ্ছা থাকিলেও জীব এতদূর মোহাচ্ছন্ন যে অস্থায়ী এবং পরিণাম দুঃখরূপ বৈষয়িক সুখলাভলালসায় ও সুখলাভের আশার ছলনায় শারীরিক ও মানসিক নানাপ্রকার দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়া লয়। মরণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া থাকে। বঙ্গের কবিকুল চূড়ামণি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বৈষয়িক সুখকে নিশার স্বপন-সুখের ন্যায় বলিয়াছেন :—

"নিশার স্বপন সুখে সুখী যে কি সুখ তার?
জাগে সে কাঁদিতে।
ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার,
পথিকে ধাঁধিতে!"

---

* "যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥"
গীতা—৫।২২।

"মুকুতা ফলের লোভে ডুবেরে অতল জলে,
যতনে ধীবর।
শত মুক্তাধিক আয়ু, কাল-সিন্ধু জল তলে,
ফেলিস্ পামর।"

ধনলোভী ধীবর মুক্তা আহরণ করিতে সমুদ্রজলে ডুব দেয়; ক্ষণকালও চিন্তা করেনা, তুচ্ছ মুক্তার লোভে শতমুক্তাধিক নিজের জীবন সমুদ্র জলে বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছে।

ধনলোভী সাপুরীয়া বিষধর সর্পের মণি আহরণের চেষ্টায় সেই সর্পদংশন-জনিত বিষের জ্বালায় কষ্টকষ্ট পাইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করে। কবি মধুসূদন ওজস্বিনী ভাষায় বলিয়াছেন;—

নারিলে লভিতে মণি, দংশিলরে কাল ফণি,
এবিষম বিষজ্বালা সাহবি মন কেমনে?

রজোগুণ আধিক্যেই মনুষ্য-জন্ম। রজোগুণ প্রধান বলিয়া মনুষ্যের দুঃখভোগ স্বাভাবিক। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন;—

"অনিত্য মসুখং ল্যেকম্।" গীতা।

মনুষ্যলোক অনিত্য ও অসুখময়। মনুষ্যের এই স্বাভাবিক দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির উপায় নির্দ্ধারণ জন্যই ষড় দর্শনের উপদেশ।

দুঃখ আমাদের অত্যন্ত দ্বেষ্য হইলেও পরমকল্যাণ লাভের সাধনায় আমাদিগকে অল্প বিস্তর দুঃখ সহ্য করিতে হয়। আত্মোন্নোতিসাধনে দুঃখ সহ্য করা বাঞ্ছনীয়। ইন্দ্রিয়ের বিষয়গ্রহণে আমরা স্বভাবতঃ অভ্যস্ত। জন্মাবধি আমাদের বহির্ম্মুখী মন রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ গ্রহণে সিদ্ধ। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে ঐ সমস্ত বিষয় হইতে মনকে ফিরাইয়া অন্তর্ম্মুখী করিতে হইবে। তদ্বিষয়ে দীর্ঘকালব্যাপী অভ্যাস ও বৈরাগ্যের প্রয়োজন।

সাধনা ভিন্ন কোন বিষয়েই সিদ্ধিলাভ হয় না। সাধনা করিতে হইলে অভ্যাস, পরিশ্রম ও দুঃখ সহ্য করা প্রয়োজন হয়। যে বিষয় যত উৎকৃষ্ট সেই বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে বিষয়ের উৎকর্ষানুসারে সেই পরিমাণে অধিক কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম স্বীকার ও দুঃখ সহ্য করিতে হয়। পরম-কল্যাণ-প্রার্থি-সাধক এইরূপ পরিশ্রম বা দুঃখ সহ্য করিতে ভীত বা কুন্ঠিত হন না। নানারূপ দুঃখ ভোগ করিয়াও সাধনমার্গে অগ্রসর হন।

কোন সাধক গাহিয়াছেন;—

বারে বারে যে দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা।
দুঃখ নয় সে দয়া তব জেনে'ছ মা দুঃখহরা॥
সন্তান কল্যাণতরে জননী তাড়না করে,
তাই আমি শিরে ধরি, সুখ দুঃখেরি পশরা॥
তাই বহিতেছি সুখে শিরে দুঃখেরই পশরা"

সাধক প্রবর রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন;—

"আমি কি মা! দুঃখেরে ডরাই?
আগে পাছে দুঃখ চলে মা! যেখানে সেখানে যাই,
লোকে সুখ পেয়ে মা গর্ব্ব করে, আমি করি দুঃখের বড়াই।"

যতই সাধনাপথে অগ্রসর হইবে, ততই অন্তঃকরণে এতই নির্ম্মল সাত্ত্বিক সুখের অনুভব হইবে যে, বাহ্যিক শীতোষ্ণ প্রভৃতি দ্বারা গুরুতর দুঃখ শরীর স্পর্শ করিলেও সাধক এই দুঃখ সহ্য করেন। সাধনার গন্তব্যপথ হইতে বিচলিত না।

শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন;—

"যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে" গীতা ৬।২২

ভোগ-সুখ-লাভ লালসায় দুঃখ সহ্য করিলে দুঃখ ও দুর্গতি লাভই শেষ ফল

হইয়া থাকে। কিন্তু পরম শ্রেয়ঃ লাভের জন্য অল্প বিস্তর দুঃখভোগ সহ্য করিলে তাহার ফলস্বরূপ শেষে পরম সুখ ও সদ্গতি লাভ হয়।

গীতায় শ্রীভগবান আরও বলিয়াছেন :—যাহরা কল্যাণকারী তাহাদের কথনই দুর্গতি লাভ হয় না। *

অতএব আপাত দুঃখ ভোগের ভয় করিয়া কাহারও ইষ্ট লাভের যত্ন ও চেষ্টা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে।

ব্রজগোপীগণের প্রাণাধিক শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় চলিয়া গেলে, ব্রজগোপ গোপীগণ, নন্দ-যশোদা, ব্রজ-রাখালগণ, শ্রীরাধা ও তাহার অন্তরঙ্গ সখীগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বিরহে দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবি শ্রীরাধার উক্তি এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ;—

"সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু, আগুনে পুড়িয়া গেল ;
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে, সকলি গরল ভেল!"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহ দুঃখের এরূপ বর্ণনা আছে :—

"... . ...

কৃষ্ণের বিরহ লীলা প্রভুর অন্তর॥
নিরন্তর রাত্রিদিন বিরহ উন্মাদে।
হাসে নাচে কান্দে গায় পরম বিষাদে॥"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাধাভাব অবলম্বন করিয়া দুঃখে বিলাপ করিয়াছিলেন ;—

"সখী হে না বুঝিয়ে বিধির বিধান।
সুখ লাগি কৈল প্রীত, হৈল দুঃখ বিপরীত
এবে যায় না রহে পরাণ॥"

* "নহি কল্যাণকৃত্ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।" গীতা

"কাহা কর কাহা পাও ব্রজের নন্দন। কাহা মোর প্রাণনাথ মুরলিবদন॥
কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুঃখ। ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক॥"
"অবলার শরীরে বিঁধি করে জরজর, দুঃখ দেয় নালয় জীবন।"

"অন্যের যে দুঃখ মান, অন্যে তাহা নাহি জানে, সত্য এই শাস্ত্রের বিচারে।
অন্যজন কাহা লিখি, নাহি জানে প্রাণসখী, যাতে কহে ধৈর্য্য ধরিবারে॥"

মঃ লীঃ দ্বিঃ পঃ

"কৃষ্ণ মথুরায় গেলে গোপীর যে দশা হইল, কৃষ্ণ বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা হইল॥

উদ্ধব দর্শনে রাধার বিলাপ,—

"হা হা সখি, কি করি উপায়? কাঁহা কর কাঁহা যাও কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাও,
কৃষ্ণ বিনু প্রাণ মোর যায়।"

ঈশ্বরভক্ত সাধকদিগের কেন অত্যন্ত দুঃখ হয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য-লীলায় তাহার কারণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ;—

"দেখি লোভী পঞ্চজন, এক অশ্ব মোর মন, চরি পঞ্চ পাঁচ দিকে ধায়।"
"সখি হে! শুন মোর দুঃখের কারণ। মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহা লম্পট
দস্যুগণ, সবেকরে হরে পরধন!
এক অশ্ব এককক্ষণে, পাঁচ পাঁচ দিকে টানে, একমন কোন দিকে চায়।
এককালে সবে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে, এদুঃখ সহনে না যায়।"

অন্ত্যলীলা।

জীবমাত্রই স্বভাবতঃ বহির্ম্মুখী। বলবান ইন্দ্রিয়গণ বাহিরের বিষয় ভোগের জন্য সততই মনকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ হইতে মনকে ফিরাইয়া অন্তর্ম্মুখী করিতে অর্থাৎ ভগবচ্চিন্তায় মনোযোগ করিতে হইলে দুঃখভোগ করা স্বাভাবিক।

যোগ সাধনায় ভগবানের প্রতি প্রেম হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইলে ভগবদ্দর্শন ও তৎপ্রাপ্তির উৎকট পিপাসায় মনের উদ্বেগজনিত যে দুঃখের অনুভব হয় উহা বাহ্যিক। অন্তরে যোগজ-সুখ ও ভগবচ্চিন্তায় বিমল আনন্দ সাধক এবং ঈশ্বর-প্রেমিককে বাহ্যিক দুঃখ সহ্য করিতে শক্তি দান করে। ভক্তিযোগের সাধনায় সিদ্ধ হইলে ভগবদ্দর্শন লাভ হয়। ভগবৎ প্রেম দৃঢ় করিবার জন্য ভগবান ইচ্ছা করিয়াই ভক্তের দৃষ্টিপথের অন্তরালে থাকেন। এইরূপ অদর্শনজনিত বিরহে ঈশ্বর-প্রেমিক ভক্ত মর্ম্মান্তিক দুঃখানুভব করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় উপরোক্ত ভাবের এইরূপ বর্ণনা আছে :

"বাহ্যে বিষ জ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়, কৃষ্ণ প্রেমার অদ্ভুত চরিত।
সেই প্রেমার আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ, মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে, বিষামৃতে একত্র মিলন।"

মধ্যলীলা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ও এই ভাবের আভাস আছে ;—

যাহা লাভ করিলে ইহা অপেক্ষা অপর অধিক লাভ হইতে পারে বলিয়া মনে হয়না এবং যে অবস্থায় স্থিত হইলে গুরুতর দুঃখ ভোগেও বিচলিত হয় না সেই অবস্থাই সমস্ত দুঃখ বিয়োগ স্বরূপ পরিপূর্ণ যোগ বলিয়া জানিবে।

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥" গীতা ৬।২২

সুখ।

"সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।"

সুখ কাহাকে বলে? প্রকৃত সুখের লক্ষণ কি? কি লক্ষণ দ্বারা প্রকৃত সুখের পরিচয় পাওয়া যায়? সুখ নিত্য কি অনিত্য? সুখের প্রতিষ্ঠা কোথায়? ইত্যাদি প্রশ্নের সংক্ষেপতঃ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিতেছি।

মীমাংসা দর্শনে স্বর্গসুখের ব্যাখ্যা এইরূপ আছে :—

"যন্ন দুঃখেন সং ভিন্নং নচ প্রস্ত মনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদম্॥"

যে সুখে দুঃখের মিশ্রণ নাই এবং যে সুখকে দুঃখে গ্রাস করিতে পারে না, যে সুখ শেষে দুঃখে পরিণত হয় না এবং ইচ্ছা করিলে যে সুখ আসিয়া উপস্থিত হয়, সে সুখ অক্ষয় স্বর্গীয় সুখ। যজ্ঞদ্বারা সেই অক্ষয় স্বর্গীয় সুখ লাভ হয়।

যাহা আমার বা আত্মার অনুকূল বা প্রিয়, যাহা শুনিতে, দেখিতে বা পাইতে আমার প্রীতি জন্মে—যাহা দেখিতে শুনিতে পাইতে ও ভোগ করিতে আত্মা ভালবাসে, তাহাই সাধারণ জ্ঞানে সুখের বস্তু বলিয়া বুঝিয়া থাকি; ইহাই বৈষয়িক সুখ। দুঃখের ন্যায় বৈষয়িক সুখও দেহের বৃত্তি বা ধর্ম্ম। একটু চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে, আমরা যে বিষয় বা বস্তুকে সুখের উপকরণ বলিয়া মনে করি বস্তুগত্যা সেই বিষয় বা বস্তু স্বভাবতঃ সুখ স্বরূপ কিনা?

যে বিষয় বা বস্তু সুখ-স্বরূপ হইবে উহা সকল অবস্থাতে নিত্য নিরবচ্ছিন্ন ও এক ভাবে আত্মাতে সুখ জন্মাইবে। অগ্নির দাহিকাশক্তি, মরিচের ঝালশক্তি এবং গুড়ের মিষ্টত্বশক্তি, যেমন বস্তুগত্যা ঐ সকল বস্তুতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত; যে বস্তু সুখের স্বরূপ হইবে, তাহাতে সকল কালে, সকল দেশে, সকল অবস্থায় সুখ নিয়তই থাকিবে, উহার ব্যতিক্রম হইবে না।

ধন বল, পুত্র বল, স্ত্রী বল, বস্ত্রালঙ্কার বল, রাজত্ব বল, ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যের যে কিছু সামগ্রী, কোনটীই স্বভাবতঃ সুখ-স্বরূপ নহে। অবস্থা বিশেষে ইহারা সকলেই সুখের উপকরণ হইতে পারে। যেকাল পর্য্যন্ত আত্মা ইহাদিগকে লাভ করিয়া সুখানুভব করে, সেই পর্য্যন্তই ইহারা সুখের সামগ্রী। আত্মাকে সুখ দেয় বলিয়া ইহারা সুখের বস্তু। ইহাদিগের দ্বারা আত্মা প্রীত বা সুখী না হইলে ইহারা আর সুখের বস্তু বলিয়া গণ্য হয়না। যে বস্তু এক সময় আত্মাতে সুখ জন্মায়, অন্য সময়ে সুখ জন্মাইতে পারে না, বরং দুঃখের কারণ হইয়া পড়ে, এবং যে বস্তু একের সুখের কারণ হইয়া অন্যের দুঃখের কারণ হয়, সে বস্তুকেও স্বরূপতঃ সুখ বলা যায় না।

পরমসুন্দরী গুণবতী স্ত্রী তাহার পতি ও শ্বশুর শাশুড়ীর সুখের কাবণ হয়। কিন্তু সেই স্ত্রীই সপত্নীর হিংসা ও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। অপরযে পুরুষ ঐ স্ত্রীর কুমাবী অবস্থায় তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক ছিল, এখন সেই স্ত্রীই অন্যের সহিত পরিণীতা হওয়ায় তাহারও নিতান্ত মনস্তাপ ও দুঃখের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেখা যাইতেছে, ভোগের সামগ্রী স্বভাবতঃ কোনটীই সুখের স্বরূপ নহে। পরন্তু যাহা সুখ-স্বরূপ তাহা নিত্যই সুখস্বরূপ হইবে—চিরকাল প্রত্যেককে সমভাবে সুখ দিবে। একজনের সুখের ও অপরের দুঃখের কারণ হইবে না।

সৃষ্ট বস্তুসমূহের বা যাহাদের আদি অন্ত আছে, উহাদের কোনটীই সুখ-স্বরূপ হইতে পারে না। প্রকৃত সুখ নিত্যবস্তু! ইহার আদি অন্ত নাই। ইহা সকল সময় সকল অবস্থাতেই অব্যভিচারী সুখ।

আমবা দেহধারী জীব; আমরা জীবাত্মাকে বা নিজের আত্মাকে সকল সময় সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসি। আত্মা স্বতঃই প্রিয় এবং ভালবাসার সামগ্রী। আত্মার প্রতি আমাদের প্রীতি বা ভালবাসা অব্যভিচারী এবং চিরপ্রসিদ্ধ। বাজা, প্রজা, ধনী, নির্দ্ধন, মনুষ্য, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর প্রাণী নিজ নিজ আত্মাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসে। আত্মাকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা ধন, পুত্র, স্ত্রী অথবা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হই না।

"আত্মানং সততং রক্ষেৎ পুত্র দারা ধনৈরপি।"

রাজদ্বারে অভিযুক্ত অনেক ব্যক্তি রাজ দণ্ডের ভয়ে নিজে স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া স্থানান্তরে চলিয়া যায়।

"আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ।"

দেহের সহিত আত্মার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সেইজন্য নিজদেহ লোকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসে। যখন দেহ রোগগ্রস্ত হইয়া আত্মার কষ্টদায়ক হয় তখন মোহবশতঃ কেহ কেহ আত্মাকে অত্যন্ত কষ্ট হইতে মুক্ত করিবার ভ্রান্ত-বিশ্বাসে উদ্বন্ধনে বা অন্য প্রকারে দেহ ত্যাগ করিয়া থাকে। আত্মা কাহারও প্রিয় নয় এবং আত্মাকে কেহ ভালবাসে না, এ কথা কেহ বিশ্বাস করে না—শুনাও যায় না। অতিক্ষুদ্র বিষ্টার ক্রিমিও নিজের আত্মাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসে এবং সযত্নে আত্মাকে রক্ষা করিতে চাহে। সকল জীবই নিজের আত্মাকে সকল সময়ে সকল অবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা অত্যন্ত ভালবাসে। আত্মাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসে বলিয়াই সকলে বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। কেহই সহজে মরিতে চাহে না। মরণ ভয় সকলেরই আছে।

যাহা সকল সময়ে সকল অবস্থায় প্রীতি বা ভালবাসার বিষয় তাহাই সুখ-স্বরূপ। আত্মার প্রতি জীবের প্রীতি বা ভালবাসা নিত্য, স্বাভাবিক এবং অব্যভিচারী। সকল প্রাণীরই আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ও সুখের বস্তু। আত্মাতে সুখের নিত্য প্রতিষ্ঠা। অতএব আত্মা সুখ-স্বরূপ। আত্মা নিত্য ও অবিনাশী। সুতরাং প্রকৃত সুখও নিত্য এবং অবিনাশী।

বেদান্ত মতে আত্মা পরমাত্মা হইতে পৃথক নহে। পরমাত্মা ও আত্মা অভিন্ন। পরমাত্মা সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ। এই আনন্দই সুখ। পরমাত্মাই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের স্বরূপই আনন্দ বা সুখ। ব্রহ্মানন্দই প্রকৃত-সুখপদবাচ্য।

ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে ব্রহ্মানন্দ বা প্রকৃত সুখ লাভ হয়। প্রকৃত সুখ দুর্লভ হইলেও উহা লাভ করাই পরমগতি বা পরম শ্রেয়োলাভ। পরম

শ্রেয়োলাভ করিলে পুনরধোগতি হয় না—আর সংসারে আসিয়া জন্ম, মৃত্যু, জরা, দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়—নিজের অস্তিত্ব ব্রহ্মানন্দে ডুবিয়া যায়। ইহাই প্রকৃত সুখ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে যে স্থানে সুখ শব্দের উল্লেখ আছে, এই প্রবন্ধের প্রয়োজনীয় ঐ সকল স্থল একত্র উল্লেখ করিয়া তৎসম্বন্ধে গীতার উপদেশ কি সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

"ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ নচ রাজ্যং সুখানিচ।" গীতা ১—৩১ ॥
"যেষামর্থেকাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যভোগাঃ সুখানিচ। „ ১—৩২ ॥
"স্বজনংহি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব।" „ ১—৩৬ ॥
"মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ সুখ দুঃখদাঃ। „ ২—১৪ ॥
সম দুঃখ সুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ „ ২—১৫ ॥
সুখদুঃখে সমেকৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। „ ২—৩৮ ॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ॥ „ ২—৫৪ ॥
শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু তথা মানাবমানয়োঃ ॥ „ ৬—৭ ॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমংপশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং সযোগী ॥ „ ৬—৩২ ॥
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো সমদুঃখ সুখক্ষমী। „ ১২—১৩ ॥
শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু সমঃসঙ্গ বিবর্জ্জিতঃ। „ ১২—১৮ ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনাধৃতিঃ। „ ১৩—৬ ॥
পুরুষঃ সুখ দুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ „ ১৩—২১ ॥
সুখ সঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞান সঙ্গেন চানঘ ॥ „ ১৪—৬ ॥
সত্ত্বংসুখে সঞ্জয়তি ॥ „ ১৪—৯ ॥
সমদুঃখ সুখঃস্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্ম কাঞ্চন ॥ „ ১৪—২৪ ॥
দ্বন্দ্বৈর্বিযুক্তাঃ সুখদুঃখ সংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ংতৎ। গীতা। ১৫—

উপরোক্ত শ্লোকগুলি বৈষয়িক সুখ সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। ইহা ভোগ সুখ।

বৈষয়িক সুখ কি? চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়—বহিঃকরণ। ইহারা বাহিরের রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ এই পাঁচটী বিষয় গ্রহণ করিয়া বহির্ম্মুখ মনকে দেয়। মন ঐ সমস্ত বাহিরের বিষয়গুলি গ্রহণ করিয়া আত্মাকে ভোগ করায় অর্থাৎ রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ এই পাঁচটী উক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। আমরা জগতে বা সংসারে যাহাকিছু দেখি, যাহাকিছু শুনি, যাহাকিছুর গন্ধানুভব করি, যাহাকিছুর রসাস্বাদন করি, শরীরে যাহাকিছুর স্পর্শানুভব করি, তৎসমস্তেরই জ্ঞান চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা লাভ করি। এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের যোগে বা স্পর্শে আমাদের সমস্ত বিষয় ভোগ হয়। এই জন্য সমস্ত বিষয়গুলি গীতার ভাষায়—"মাত্রাস্পর্শাঃ" এবং "সংস্পর্শজা ভোগাঃ" অতএব আমরা সুন্দর রূপ দেখিয়া যে সুখ পাই, মনোহর গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া যে সুখ পাই, শ্রুতিমধুর শব্দ শুনিয়া যে সুখ পাই, সুস্বাদু আহার্য্য আহার করিয়া ও সুপেয় জল পান করিয়া যে সুখ পাই, শীতকালে উষ্ণস্পর্শে ও গ্রীষ্মকালে শীতলস্পর্শে যে সুখ পাই, স্রক্ চন্দনাদি সম্ভোগে যে সুখ পাই, এইসমস্তই বৈষয়িক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এসমস্তই অনিত্য ও দুঃখজনক।

যে সমস্ত আত্মার প্রতিকূল, সেই সমস্ত বিষয় আত্মার ভোগের জন্য উপস্থিত হইলে উহাতে আত্মার দ্বেষ জন্মে। উহাই আত্মার দুঃখজনক। আর যে সমস্ত বিষয় ভোগের জন্য উপস্থিত হইলে আত্মার সুখ জন্মে ঐ সকল বিষয় আত্মার অনুকূল ও সুখজনক। এইরূপ বিষয় হইতে উৎপন্ন সুখ দুঃখকে বৈষয়িক সুখ দুঃখ বলে। অনিত্য সুখ দুঃখের এইরূপ দ্বন্দ্বে জীব মোহ প্রাপ্ত হয়।

সৃষ্ট জগৎ—সংসার ত্রিগুণাত্মক। বৈষয়িক সুখও ত্রিগুণাত্মক। সুখ সত্ত্বগুণাশ্রিত। জীব যখন সুখের অনুভব করে, তখন রজঃ ও তমোগুণ অভিভূত থাকে। তখন মনের চঞ্চলতা ও গুরুত্ব দূর হইয়া মন স্থির, সুস্থ, লঘু, দীপ্ত ও প্রফুল্ল হয়। মন ও শরীর পাতলা (হাল্কা) বোধ হয়। ইহা সত্ত্বগুণের

কার্য্য। প্রত্যেক বস্তুতে ত্রিগুণের মিশ্রণ আছে। সুখ ও গুণভেদে—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

"সুখ-দুঃখ" শীর্ষক প্রবন্ধে যে সুখের উল্লেখ করিয়াছি এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রধানতঃ যে সুখ প্রতিপাদ্য এই দ্বিবিধ সুখের স্বরূপ বর্ণনা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে আছে। তাহা এই :—

হে ভরতর্ষভ! সুখ গুণভেদে ত্রিবিধ—তদ্বিষয়ে শ্রবণ কর।

১ম। সাত্ত্বিক সুখ—

যে সুখ আপাততঃ বিষের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু পরিণামে অমৃততুল্য, অভ্যাসের ফলে যে সুখে রতি বা আসক্তি জন্মাইতে হয় এবং যে সুখ লাভ করিলে দুঃখের অন্ত হয় এবং আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতা লাভ করিলে যে সুখ উৎপন্ন হয় সেই সুখকে সাত্ত্বিক সুখ বলা যায়। *

২য়। রাজসিক সুখ—

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সংযোগে যে সুখ লাভ হয়, যাহা আপাততঃ অমৃতের ন্যায় কিন্তু পরিণামে বিষতুল্য তাহাকে রাজসিক সুখ বলে। †

৩। তামসিক সুখ—

যে সুখ আপাততঃ ও পরিণামে মোহকর অর্থাৎ যে সুখ উভয়কালে বিষবৎ হইলেও তাহাকে সেইরূপ বুঝিতে পারা যায় না—যাহা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে তামসিক সুখ বলে। ‡

*"অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি।
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্॥
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥" গীতা ১৮-৩৭॥

† "বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥ গীতা ১৮-৩৮॥

‡ "যদগ্রেচানুবন্ধেচ সুখং মোহন মাত্মনঃ।
নিদ্রালস্য প্রমাদোত্থং তৎতামসমুদাহৃতম্॥" গীতা ১৮-৩৯॥

উক্ত তিন প্রকার সুখমধ্যে তামসিক সুখ সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য ; উহা সকলেরই পরিবর্জ্জনীয়। যাহারা অত্যন্ত অলস প্রকৃতির লোক তাহারা নিষ্কর্ম্মা হইয়া, ঘুমাইয়া জীবন কাটাইতে সুখ বোধ করে। ইহারা যে সকলেরই হেয়, তৎসম্বন্ধে কাহারও সংশয় নাই।

এক শ্রেণীর প্রমাদী লোক নিজের স্বার্থ না থাকিলেও অন্যের অনিষ্ট করিয়া, অযথা পর-নিন্দা করিয়া সুখ বোধ করে। অপর কেহ বা মিথ্যাকথা বলিয়া শঠতাপূর্ব্বক অন্যকে বঞ্চনা করিয়া সুখ বোধ করে। দুষ্ট প্রকৃতির ছেলের পাখীর ডানা ছিঁড়িয়া সুখ বোধ করে। কেহবা তাস পাশা খেলিয়া কেহবা কলহ করিয়া সুখ বোধ করে। কেহবা এমন তমসাচ্ছন্ন বিকৃতমনা যে তামসা দেখিবার জন্য অন্যের ঘরে অগ্নি প্রদান করিয়া সুখ বোধ করে। এই জাতীয় সুখই তামসিক সুখ। মূর্খ ও অবিবেচক লোকই তামসিক সুখে অনুরক্ত হয়। তাহাদের অধোগতি অবশ্যম্ভাবী।

রাজসিক সুখের স্বভাব এই ; বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগে এই সুখের উৎপত্তি হয়। ইহা আপাততঃ বড়ই উপাদেয় ও মনের তৃপ্তিকর বোধ হয়। কিন্তু এই সুখে আসক্ত ব্যক্তির পরিণামে দুঃখ অনিবার্য্য। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিমাত্রেই বিষয়সম্ভোগে রত থাকিয়া পরম পুরুষার্থ লাভে বঞ্চিত হয়, এবং পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু ও দুঃখের অধীন হয়। ইহার দৃষ্টান্ত সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ধনী ব্যক্তি কেহবা নৃত্যগীতে, কেহবা সৌন্দর্য্যে, কেহবা পানভোজনে, কেহবা স্রক্ চন্দনাদি স্পর্শে মুগ্ধ হইয়া জলের ন্যায় অর্থব্যয় করতঃ পরিণামে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া মহাদুঃখে পতিত হয়। কামুক ব্যক্তি কামিনীতে আসক্ত হইয়া শেষে মহাদুঃখভোগে অনুতপ্ত হয়।

বনের মৃগ ব্যাধের বাঁশীর সুমিষ্ট স্বরে আকৃষ্ট হয়। ব্যাধ মুগ্ধ মৃগকে বাণবিদ্ধ করিয়া হত্যা করে। কবি বর্ণনা করিয়াছেন ;—ব্যাধের মোহন বেণু শ্রবণে মুগ্ধ মৃগ ব্যাধ কর্ত্তৃক বাণবিদ্ধ হইয়া অতি করুণস্বরে ব্যাধকে সম্বোধনপূর্ব্বক সানুনয়ে বলিতেছে ;—

হে ব্যাধ ! তোমার মোহনমুরলী শ্রবণে আমি মুগ্ধ হইয়া দৌড়িয়া তোমার দৃষ্টিপথে আসিয়াছি। তুমি বাঁশী না বাজাইয়া আমাকে হত্যা করিবার জন্য বাণ বিদ্ধ করিয়াছ ; আমার প্রাণ শীঘ্রই দেহত্যাগ করিবে। আমি সানুনয়ে অনুরোধ করিতেছি, তুমি পুনরায় তোমার ঐ শ্রুতিমধুর মোহনমুরলী বাজাও উহার চিত্তমোহকর সুমিষ্ট তান শুনিতে শুনিতে আমার ক্ষতবক্ষঃ হইতে প্রাণ বাহির হউক।”

রাজসিক সুখের এইরূপই পরিণতি ! যাহারা রাজসিক সুখভোগে রত, তাহাদের সংসারবন্ধন মোচন হয় না। তাহারা আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারে না। তামসিক ও রাজসিক সুখে বীতস্পৃহ হইবে ইহাই ভগবানের উপদেশ।

শ্রীভগবান্ সাত্ত্বিক সুখের তিনটী লক্ষণ উপদেশ করিয়াছেন ;—

(১ম) অভ্যাসদ্বারা যে সুখে অনুরাগ জন্মে এবং যে সুখ লাভ করিলে দুঃখ থাকে না।

(২য়) যে সুখ পূর্ব্বে বিষের ন্যায় ও পরিণামে অমৃতের ন্যায় বোধ হয়।

(৩য়) যে সুখ আত্মবুদ্ধির প্রসাদ হইতে উৎপন্ন।

বৈষয়িক রাজস ও তামস সুখ অভ্যাস করিয়া লাভ করিতে হয় না। পূর্ব্বে বিষতুল্যও বোধ হয় না। সুন্দর রূপ দেখিলে, মনোহর গন্ধ আঘ্রাণ করিলে, উপাদেয় পান ভোজন করিলে, কমনীয় বস্তু স্পর্শ করিলে এবং শ্রুতিমধুর শব্দ শ্রবণ করিলে সহজেই মনে সুখের উদয় হয়। এই প্রকার সুখ ক্ষণস্থায়ী। শীঘ্রই চলিয়া যায়। উহা পুনরায় ইচ্ছামত না পাইলে দুঃখের অনুভব হয়।

সাত্ত্বিক সুখ শ্রেষ্ঠ, স্পৃহণীয় ও কল্যাণকর হইলেও অভ্যাসদ্বারা লাভ করিতে অল্পবিস্তর ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। সাধু, ধার্ম্মিক এবং ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিই সাত্ত্বিক সুখের অধিকারী হয়। যোগিগণ যে যোগজ সুখ অনুভব করেন, উহাই পবিত্র সাত্ত্বিক সুখ।

আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুব্যক্তি যে বুদ্ধিদ্বারা বেদান্তাদি শাস্ত্রের অর্থগ্রহণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিয়া আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করেন, যোগিগণ যোগাসনে বসিয়া, "আত্মজ্ঞান লাভ করিব" এই যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধির সৎসঙ্কল্প লইয়া পরমাত্মার ধ্যানে সমাধিস্থ হন, সেই বুদ্ধি আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি। সাত্ত্বিক সুখ এই আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি হইতে লাভ হয়।

সমাধি দুই প্রকার; সম্প্রজ্ঞাত, অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে বুদ্ধির সঙ্কল্প বিকল্প থাকে—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই পৃথক্ জ্ঞানের অস্তিত্ব থাকে। এই অবস্থায় যে সুখের অনুভব হয় উহাও সাত্ত্বিক সুখ। এই মহৎ সুখও ত্রিগুণের গণ্ডির ভিতরে আবদ্ধ, এই সুখ সম্প্রজ্ঞাতসমাধিসাধ্য।

ব্রহ্মানন্দরূপ পরম সুখ বা আত্যন্তিক সুখ ত্রিগুণাতীত। ব্রহ্মানন্দ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিলভ্য। এই অবস্থায় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ভাবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না—কিছুরই পৃথক্ জ্ঞান থাকে না; সমস্তই ব্রহ্মানন্দে ডুবিয়া যায়।

পরোপকার করিয়া যে সুখের অনুভব হয়, বিপন্ন ব্যক্তিকে বিপদুদ্ধার করিয়া যে সুখের অনুভব হয়, আর্ত্ত ব্যক্তির আর্ত্তি দূর করিয়া যে সুখের অনুভব হয়, তাহাও এক শ্রেণীর সাত্ত্বিক সুখের মধ্যে গণ্য হইতে পারে। এই সমস্ত সৎকার্য্য করিতে হইলে অল্পবিস্তর ত্যাগ ও দুঃখভোগ স্বীকার করিতে হয়। সত্ত্বপ্রধান সাধুব্যক্তি ভিন্ন এইরূপ সৎকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন না।

শ্রীভগবান্ বৈষয়িক সুখ সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন যে বৈষয়িক সুখমাত্রেরই আদি ও অন্ত আছে। উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। বৈষয়িক সুখ স্থায়ী নহে। পণ্ডিত প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তিগণ এই সমস্ত সুখের আদর করেন না। কারণ বৈষয়িক সুখমাত্রই দুঃখ মিশ্রিত—পরিণামে দুঃখই। যিনি দুঃখের হাত এড়াইতে ইচ্ছা করেন তাঁহার বৈষয়িক সুখে বিরত হওয়া উচিত।

সাংসারিক বা বৈষয়িক সুখ দুঃখ সমানভাবে সহ্য করিবে। যাহারা বৈষয়িক সুখ-দুঃখ, শীতোষ্ণ, মান, অপমান, তুল্যজ্ঞান করেন এবং এই ভাবে

দ্বন্দ্বাতীত ও বিমৎসর হন, তাঁহারাই প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত। তাঁহারাই দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি লাভ করিয়া পরম মঙ্গল, বা আত্যন্তিক সুখ লাভ করিতে পারেন। এবং অত্যন্তসুখের প্রতিষ্ঠা যাহাতে সেই ভগবৎপদ লাভের অধিকারী হন।

এই অবস্থাপ্রাপ্ত সিদ্ধ পুরুষ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন ;—

"দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ" গীতা।

তিনিই বিমৎসর দ্বন্দ্বাতীত—সুখ দুঃখের অতীত।

"সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" গীতা ২—৫৬॥

তিনিই বৈষয়িক সুখে স্পৃহাশূন্য।

"সুখ দুঃখে সমেকৃত্বা......" গীতা ২—৩৮॥

সুখ দুঃখে সমান জ্ঞান করিয়া থাকেন।

"সম দুঃখ সুখং.........."গীতা ২—১৫॥

যিনি সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান করেন।

"শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু তথা মানবমানয়োঃ" গীতা ৬—৭॥

তাঁহার শীতোষ্ণ সুখ দুখ, মান অপমান তুল্য জ্ঞান হয়।

"নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃক্ষমী" ॥ গীতা ১২—১৩।

তিনিই মমতা শূন্য, অহঙ্কার শূন্য সুখে দুঃখে সমান এবং এবং ক্ষমাশীল।

"শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ"। গীতা ১২-১৮॥

তিনিই শীতোষ্ণ সুখ দুঃখে সমান এবং সঙ্গ বর্জ্জিত।

"সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।" গীতা ১৪—২৪॥

তিনিই সুখ দুঃখে একরূপ থাকিয়া স্বরূপে অবস্থান করেন এবং লোষ্ট্র, প্রস্তর ও স্বর্ণে সমজ্ঞান করেন।

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন ;—

"নায়ং লোকোঽস্তি নপরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।" গীতা ৪-৪০

যাহারা সংশয়াত্মা, শাস্ত্র বাক্যে এবং ঋষি ও মহাজন বাক্যে বিশ্বাস করে না, প্রতি কথায়, প্রতি কার্য্যে যাহাদের সংশয়, তাহারা ইহকাল ও পরকাল কোন প্রকার সুখই ভোগ করিতে পারে না। তাহারা অনিত্য বৈষয়িক সুখ বা নিত্য সুখ উভয় সুখ লাভ হইতেই বঞ্চিত হয়। তাহাদের অধঃপতন—বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মানন্দরূপ সুখের স্বরূপ সম্বন্ধে বলিয়াছেন ;—

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ গীতা ৬—২৮॥

অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত অত্যন্ত নিত্য সুখ প্রাপ্ত হয়।

এই রূপে রজোগুণহীন—সুতরাং প্রসন্নচিত্ত, নিষ্পাপ এবং ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত—এই যোগীকে উত্তম সুখ অর্থাৎ সমাধি সুখ আপনি আশ্রয় করে।*

যে অবস্থায় যোগী ইন্দ্রিয়ের অতীত নির্ম্মল বুদ্ধিমাত্র গ্রাহ্য, আত্যন্তিক সুখ অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ যে কি বুঝিতে পারেন এবং যে আত্মবিস্মৃতি হইতে বিচলিত হইতে চাহেন না। †

শব্দ স্পর্শাদি বাহ্য বিষয়ে অনাসক্ত ব্যক্তি শান্তি বিশিষ্ট সুখ লাভ করেন।

---

*"প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখ মুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥"
গীতা ৬—২৭॥

† "সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধি গ্রাহ্য মতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র নচৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥"
গীতা ৬—২১॥

তৎপরে তিনি ব্রহ্মযোগ অর্থাৎ সমাধি দ্বারা পরমাত্মার সহিত ঐক্য প্রাপ্তি রূপ অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন। তখন দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। *

যাঁহাদের এইরূপ ব্রহ্মানন্দ সুখ লাভের সৌভাগ্য ~~হয় এবং যাঁহারা নিয়ত~~ এই ব্রহ্মানন্দে ডুবিয়া থাকেন তাঁহারাই জীবন্মুক্ত। সংসারের কোলাহল এবং সুখ দুঃখ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সেই মহাপুরুষদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয়ে তাঁহাদের দেহ পতন হইলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। সংসার-বন্ধন মুক্ত হইয়া যায়। ইহাই পরম পুরুষার্থ।

পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত মানবজাতির কল্যাণার্থে তাঁহার অমৃতময়ী গীতার অধ্যায়ে অধ্যায়ে মুক্তিলাভের সাধন এই মহা ভাবগুলি ছড়াইয়া রাখিয়াছেন।

"ডুব দেরে মন, কালী ব'লে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে॥"

* "বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎসুখম্।
স ব্রহ্মযোগ যুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥
গীতা ৫—২১ ॥
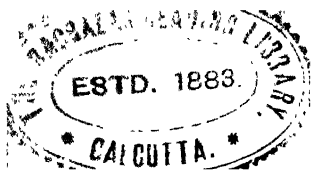
জ্ঞান।

(সত্যং জ্ঞানমানন্দংব্রহ্ম।)

জ্ঞান শব্দের আভিধানিক প্রতিশব্দ ;—জ্ঞান—অনুভূতি, বোধ, প্রতীতি, চেতনা, জানা।

জ্ঞান দ্বিবিধ—প্রমা, অপ্রমা। যথার্থ জ্ঞান, স্বরূপ জ্ঞান, প্রমা। অযথা জ্ঞান, অপ্রমা। পণ্ডিতকে পণ্ডিত বলিয়া জানা প্রমা ; পণ্ডিতকে মূর্খ বলিয়া জানা অপ্রমা। রজ্জুকে সর্প বলিয়া জানা, অপ্রমা।

ব্রহ্মের চিৎশক্তি—জ্ঞানশক্তি। জ্ঞান ব্রহ্মেরই স্বরূপ। পরমাত্মা সর্ব্বভূতে চেতনা স্বরূপ বর্ত্তমান আছেন।

ভূতানামস্মি চেতনা।
গীতা—১০—২২।

ভূতগণের মধ্যে আমি জ্ঞান শক্তি—চেতনা।

সৃষ্ট বস্তুর অন্তরে বাহিরে যেমন পরমাত্মা—ব্রহ্ম ওতপ্রোত ভাবে আছেন, সেইরূপ সৃষ্ট প্রত্যেক বস্তুতে জ্ঞানও আছে। যেবস্তুতে জ্ঞানের অভিব্যক্তি খুব কম তাহাকে আমরা জড় বলিয়া থাকি।

সৃষ্ট বস্তুমাত্রেই ত্রিগুণাত্মক। সত্ত্বগুণ—প্রকাশক। সুতরাং সত্ত্বগুণ-প্রধান বস্তুতে বা বিষয়ে জ্ঞানের অভিব্যক্তি অধিক হয়। জ্ঞানের অভিব্যক্তির তারতম্যানুসারে চেতন, অচেতন পদার্থ বিভাগ হইয়াছে। যাহাতে জ্ঞানের অভিব্যক্তি.অতি অল্প তাহাকেই অচেতন পদার্থ বলে। পাথরেরও চেতনা আছে ; অভিব্যক্তি নাই বলিয়া অচেতন সংজ্ঞায় কথিত হয়।

তমোগুণপ্রধান উদ্ভিৎ পদার্থে জ্ঞানশক্তি আছে, অধুনা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াতেও প্রতিপন্ন হইয়াছে।

বেদ—অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার। সংসার প্রতিপাদক যতকিছু জ্ঞান ও কর্ম্ম আছে, তৎসমস্তই আমরা বেদ হইতে জানিতে পারি।

অনন্ত ব্রহ্মের স্বরূপ বেদে উক্ত আছে। জ্ঞান ব্রহ্মের স্বরূপ; সুতরাং জ্ঞানও অনন্ত। ব্রহ্ম অখণ্ড-এক-অদ্বিতীয়। জ্ঞান ও ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া, এক অখণ্ড অদ্বিতীয়।

ব্রহ্ম-সৎ। অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্ব্বদাই সকল অবস্থায় বিদ্যমান আছেন। ব্রহ্মের অস্তিত্ব কখনই লোপ হয়না। ব্রহ্ম অবিনাশী। জ্ঞানও ব্রহ্মের স্বরূপ, অতএব জ্ঞানও সৎ-অবিনাশী।

ব্রহ্মজ্ঞান হইতে বৈষয়িক জ্ঞান পৃথক্ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলে, জ্ঞান আরও দুই প্রকার বলিবার প্রয়োজন হয়। বৃত্তিজ্ঞান ও ফলজ্ঞান। ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা বৃত্তি উৎপন্ন হয় বলিয়া বৃত্তিজ্ঞানকে জন্য জ্ঞান বলে। ফলজ্ঞানের ফলত্ব আরোপিত,—অখণ্ড জ্ঞানই তাহার স্বরূপ। এই জ্ঞানই ব্রহ্ম।

বৃত্তিজ্ঞানে যে জ্ঞানত্ব ব্যবহার হয়, তাহার মূলেও ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ব্যতীত জ্ঞানের প্রকাশতা বা স্বপ্রকাশত্ব থাকিতেই পারেনা।

চিত্রপটে নানা বর্ণের ও নানা রূপের চিত্র অঙ্কিত থাকে। প্রস্তর ফলকে নানা মূর্ত্তি ক্ষোদিত থাকে। চিত্রিত মূর্ত্তিগুলি বা ক্ষোদিত মূর্ত্তিগুলির যেমন পট বা প্রস্তরই আধার, সেইরূপ জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্ম বা ব্রহ্ম-স্বরূপ জ্ঞানে জাগতিক নামরূপ নানাভাবে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে।

ব্রহ্ম—আনন্দ-স্বরূপ। জ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপ। বৈষয়িক জ্ঞান ত্রিগুণাত্মক হইলেও সাত্ত্বিকগুণ প্রবল না হইলে সেই জ্ঞানের স্ফুরণ হয়না। জ্ঞানের স্ফুরণ হইলে কিছু না কিছু আনন্দ অনুভূত হয়। রাজসিক ও তামসিক জ্ঞানে সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক জ্ঞানে নির্ম্মল আনন্দ পাওয়া যায়।

ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ হইলে অখণ্ড জ্ঞানের অনুভূতি হয়। ব্রহ্মজ্ঞানী অখণ্ড-ব্রহ্মানন্দে ডুবিয়া যায়।

যতক্ষণ আমাদের কোন বিষয়ের জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ আমরা সুখী হইতে

পারিনা—মনের তৃপ্তি হয় না বিষয়টী জানিবার জন্য আমাদের উৎকণ্ঠা থাকে। বিষয়ের বোধ বা প্রতীতি হইলে মন প্রফুল্ল হয়—আমরা সুখী হই। ইহাদ্বারাও আংশিক ভাবে বুঝা যায় প্রকৃত জ্ঞান আনন্দ-স্বরূপ। সৎ, চিৎ, আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ। চিৎই জ্ঞান; অতএব সৎ, চিৎ, আনন্দের মধ্যে কোন ভেদ নাই—পরস্পর একই পদার্থ; ব্রহ্মেরই স্বরূপ।

বিদ্যাই জ্ঞান। ব্রহ্মবিদ্যাদ্বারা আমরা ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝিতে পারি। বৈষয়িক জ্ঞান অবিদ্যা-সম্ভূত। অবিদ্যাই অজ্ঞান—জ্ঞানের বিরোধী। জ্ঞানের আবরক। অবিদ্যাদ্বারাই সংসার চলিতেছে। আদ্যা শক্তি মহামায়া বিদ্যা ও অবিদ্যারূপা। সেই মহামায়া অবিদ্যা বা অজ্ঞান স্বরূপা হইয়া সংসারের স্থিতিকারিণী হন। তিনি বিদ্যাস্বরূপা হইয়া সংসারী জীবের মুক্তিদায়িনী হন।

বৈষয়িক জ্ঞান সমস্ত বিষয়ের প্রকাশক। সত্ত্বগুণ হইতে এই জ্ঞান জন্মে। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় সাত্ত্বিক বৃত্তি হইতে উৎপন্ন। সেই জন্যই ইহারা বিষয়ের প্রকাশক। সাংসারিক যতকিছু বিষয়ের জ্ঞান আমাদের হয়, তৎ সমস্তই এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা হইয়া থাকে। চক্ষুঃ না থাকিলে, রূপের জ্ঞান হয়না, কর্ণ না থাকিলে শ্রবণ জ্ঞান হয় না, নাসিকা না থাকিলে ঘ্রাণের জ্ঞান হয় না, জিহ্বা না থাকিলে রসের জ্ঞান হয়না, এবং ত্বক্ না থাকিলে স্পর্শ জ্ঞান হয় না। ইন্দ্রিয়জন্য সমস্ত জ্ঞানই বৈষয়িক।

বৈষয়িক জ্ঞান ভেদ-রূপ দোষযুক্ত, অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী। বিষয়ের নানাত্ব-ভেদে জ্ঞানও নানারূপ হইয়া যায়। চক্ষুঃ সুন্দর বা অসুন্দর রূপ দেখাইয়া, সুন্দররূপের প্রতি জীবের অনুরাগ, অসুন্দর রূপের প্রতি জীবের দ্বেষ উৎপন্ন করায়। সেইরূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের প্রতি আমাদের রাগ বা দ্বেষ জন্মিয়া থাকে। প্রিয় বিষয়ের জ্ঞান হইলে আমাদের সুখ বোধ হয়, অপ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান হইলে আমাদের দুঃখ উপস্থিত হয়। ভেদ-দুষ্ট বৈষয়িক জ্ঞান-বশতঃই আমরা কাহাকে ভালবাসি, কাহাকে ঘৃণা করি, কাহাকে ভয় করি, কাহাকে শত্রু মনে করি, এবং কাহাকে মিত্র বলিয়া আদর করি। এইরূপ

রাগ-দ্বেষ সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বে, আমরা মোহপ্রাপ্ত হই। এই ভেদ-দুষ্ট জ্ঞানদ্বারাই সংসারের বৈচিত্র্য সংঘটিত হয়। এই ভেদ-জ্ঞান দ্বারা চিত্ত মলিন হইয়া, তত্ত্বজ্ঞান লাভে বঞ্চিত হই; সংসারের বন্ধন দূর হয় না। বৈষয়িক জ্ঞানের ইহাই অপরিহার্য্য প্রধান দোষ।

তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান ইন্দ্রিয়জন্য নহে। তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান অতীন্দ্রিয়, বুদ্ধিগ্রাহ্য। এইজ্ঞান অতি পবিত্র—নির্ম্মল-ভেদরূপ দোষশূন্য—এক অখণ্ড—অদ্বিতীয়। এইজ্ঞান লাভ করিবার সৌভাগ্য হইলে, এবং এইজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে, ভেদ-জ্ঞান সমূলে দূর হয়। তখন নির্ম্মল সাত্ত্বিক বুদ্ধি বৃত্তিতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—সমস্তই ব্রহ্ম—সমস্তই বাসুদেব এই পরজ্ঞান প্রতিভাত হয়। এইজ্ঞানে জীব মুক্ত হইয়া যায়।

তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান দুইরূপে আমাদের বুদ্ধিগোচর হয়। শাস্ত্রাদি পাঠে এবং তত্ত্বজ্ঞানী সদ্‌গুরুর উপদেশে ভগবদ্বিষয়ক আমাদের যে জ্ঞান লাভ হয়, উহা পরোক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান। তপস্যা, যোগসাধনা বা অহৈতুকী ভক্তির অনুশীলনে আমাদের সাত্ত্বিক বুদ্ধিবৃত্তিতে ভগবদ্বিষয়ক যে জ্ঞানের স্ফুরণ হয়, উহা প্রত্যক্ষ, অপরোক্ষ বা বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান।

ইন্দ্রিয়জন্য বৈষয়িক জ্ঞানে বিষয়ই জ্ঞেয় বস্তু, অর্থাৎ বৈষয়িক জ্ঞানে বিষয়ের জ্ঞানই লাভ হয়। ইহা মিথ্যাজ্ঞান—অজ্ঞান।

স্বরূপতঃ একমাত্র ব্রহ্মই জ্ঞেয় পদার্থ। ব্রহ্মকে জানিবার জন্য যে বিদ্যা লাভ করিতে হয় উহাই ব্রহ্মবিদ্যা। এই বিদ্যালাভ করিলে, ব্রহ্ম অনুভূত হয়। তাহার ফলে সমস্ত বস্তুরই জ্ঞান লাভ হয়। ব্রহ্মবিদ্যালাভের প্রধান সাধন-গুলিকে শ্রীভগবান্ জ্ঞান বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন ;—

"অমানিত্ব মদম্ভিত্ব মহিংসা ক্ষান্তি রার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্য মনহঙ্কার এবচ।
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ দোষানু দর্শনম্ ॥ ৮ ॥
অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্ব মিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯ ॥
ময়ি চানন্য যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্ব মরতির্জ্জনসংসদি ॥ ১০ ॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞান মিতি প্রোক্ত মজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১১ ॥"

গীতা—১৩—৭—১১

(১) অমানিত্ব—মানরাহিত্য, আত্মশ্লাঘাশূন্যতা ; মান—অভিমান। মান বা অভিমান যত অনর্থের মূল। আমাদের মান অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য আমরা মানান্ধ হইয়া সংসারে বিবাদ, দলাদলি, এমনকি যুদ্ধবিগ্রহে মন উৎসর্গ করি। ফলে অশান্তি ভিন্ন কিছুই লাভ হয় না। যিনি ব্রহ্মবিদ্যা লাভের সাধক, তিনি মান বিষয়ে উদাসীন হন। জ্ঞান হৃদয়ে উদয় হইলে, মানের প্রভাব দূর হয়। "অমানিত্ব" জ্ঞানের প্রধান সাধন বলিয়া, অমানিত্বকে ভগবান্ জ্ঞান বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(২) অদম্ভিত্ব—দম্ভরাহিত্য। আমি বুদ্ধিমান্, আমি জ্ঞানী, আমি বলবান্, আমি ধনী, আমি ইচ্ছা করিলে অন্যের সর্ব্বনাশ করিতে পারি, ইচ্ছা করিলে উপকার করিতে পারি, ইত্যাদি আসুর ভাবগুলি, জ্ঞানী সাধকের মনে স্থান পায় না। সুতরাং অদম্ভিত্বকেও জ্ঞান বলিয়া ধরা হইয়াছে।

(৩) অহিংসা—পরপীড়া বর্জ্জন করার ভাব জ্ঞানী ব্যক্তির হৃদয়ে উদয় হয়। অহিংসাও জ্ঞান মধ্যে গণ্য।

(৪) ক্ষান্তি—ক্ষমা, সহিষ্ণুতা। কেহ অন্যায় কার্য্য করিলে তৎপ্রতি ক্রোধ হওয়া স্বাভাবিক ; সেই অন্যায়কারীকে শাস্তি দিবার শক্তি থাকিলেও

জ্ঞানী লোক অপরাধীকে ক্ষমা করিয়া থাকেন। অতএব ক্ষান্তি বা ক্ষমা জ্ঞান বলিয়াই গণ্য।

৫। আর্জ্জব— অবক্রতা, সরলতা। যিনি জ্ঞানী হইবেন, তাহার মনে কুটিলতা বা বক্রভাব থাকিতে পারে না। জ্ঞানী ব্যক্তি অবশ্যই সরল হইবেন। সুতরাং আর্জ্জবকে জ্ঞান বলিয়া ধরা হইয়াছে।

৬। আচার্য্যোপাসনা—গুরুসেবা। যিনি জ্ঞানীসাধক হইতে চেষ্টা করিবেন, তাহার গুরুভক্ত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। পিতা, মাতা, এবং সদ্‌গুরুর প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি না থাকিলে তিনি কখনই জ্ঞানী হইতে পারিবেন না। যাহার গুরুভক্তি ও গুরুসেবার যতটুকু অভাব হইবে তিনি জ্ঞান লাভের পথে ততটুকু পাছে পড়িয়া থকিবেন। সুতরাং আচার্য্যোপাসনা জ্ঞান বলিয়াই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

৭। শৌচ—পবিত্রতা। বাহ্য এবং আভ্যন্তর পবিত্রতা। স্থূল সূক্ষ্ম উভয় শরীরকেই পবিত্র রাখা কর্ত্তব্য। যিনি জ্ঞানী এবং ভগবদ্ভক্ত হইবেন, তিনি সর্ব্বদাই দেহের ও মনের পবিত্রতা রক্ষা করিবেন। যেন তাহার শরীর ও মন ইষ্টদেবের আসনোপযোগী হয়। সুতরাং শৌচ ও জ্ঞান মধ্যে গণ্য।

৮। স্থৈর্য্য—স্থির ভাব। সৎপথে চলার ইচ্ছা সর্ব্বদাই স্থির রাখা কর্ত্তব্য। মনের চঞ্চলতাপ্রযুক্ত সৎপথ ছাড়িয়া উন্মার্গগামী হইবেনা। সেই জন্য স্থৈর্য্যকে ও জ্ঞান বলা হইয়াছে।

৯। আত্ম-বিনিগ্রহ—শরীর-সংযম। বহির্ম্মুখ মনকে নিগৃহীত করিয়া অন্তর্ম্মুখী করিতে চেষ্টা করাই জ্ঞানের কার্য্য। মনকে অন্তর্ম্মুখী করিতে না পারিলে জ্ঞানী হওয়া যায় না। সুতরাং আত্ম-নিগ্রহ জ্ঞান।

১০। 'ইন্দ্রিয়ার্থেষু' বৈরাগ্য—বিষয়বৈরাগ্য। বিষয়-ভোগে বিতৃষ্ণা। যিনি জ্ঞানী এবং ভগবদ্ভক্ত, তাঁহার বিষয়-বৈরাগ্য আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। সেই সাধক মনের নির্ম্মল জ্ঞানালোকে পরিপুষ্ট ও প্রফুল্ল হইয়া পরমানন্দ ভোগ করেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-ভোগের প্রতি তাঁহার স্বঃতই বিতৃষ্ণা জন্মে।

বিষয়বৈরাগ্য ভিন্ন ভক্তি ও জ্ঞান লাভ হয় না সুতরাং বিষয়-বৈরাগ্য জ্ঞান বলিয়াই কথিত হইয়াছে।

১১। অনহঙ্কার—অহঙ্কার রাহিত্য।—প্রকৃতির গুণে সমস্ত ক্রিয়া, সম্পন্ন হইতেছে। মোহ বা ভ্রান্তিবশতঃ মনে হয়, আমি সেই সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা—আমিই সমস্ত কাজ করিতেছি। ইহাকেই আসক্তি বলে; এইরূপ ভ্রান্তবুদ্ধি বা আসক্তি না থাকাই অনহঙ্কার, জ্ঞানলাভ না হইলে এইরূপ অনহঙ্কারত্ব, অনাসক্ত-ভাব মনে আসিতেই পাবে না। অতএব অনহঙ্কারই জ্ঞান।

১২। জন্ম-মৃত্যু জরা-ব্যাধি দুঃখ দোষানু দর্শন—জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রভৃতিতে সর্ব্বদাই দুঃখরূপ দোষের পর্য্যালোচনা করা, যখন শরীর ধারণ করিয়াছি তখন, জরা ব্যাধি, মৃত্যু পুনর্জ্জন্ম হইয়া পুনঃপুনঃ দুঃখভোগ ভিন্ন প্রকৃত সুখলাভ কবা বড়ই কঠিন, ইত্যাদি চিন্তা করিয়া শরীর ধারণের দোষই দৃষ্টি করিবে। জ্ঞানী সাধকগণ এইরূপ দোষদৃষ্টি করিয়া থাকেন। যাহারা শরীর সম্বন্ধে এইরূপ দোষদৃষ্টি না করিয়া শরীরের মমতায় মুগ্ধ হন তাহারা জ্ঞানী হইতে পারেন না। সুতরাং এইরূপ দোষদশনকেই জ্ঞান বলা হইয়াছে।

১৩। 'আসক্তিরনভিষঙ্গঃপুত্রদারগৃহাদিষু'—পুত্র, দার ও গৃহাদিতে অনাসক্তিব ভাব বা নির্ম্মলতা পোষণ করা, পুত্রাদির সুখে দুঃখে আমি সুখী দুঃখী, এইরূপ বোধ না করাই জ্ঞানী ব্যক্তির স্বাভাবিক মনেব গতি হয়। পুত্র দার ও গৃহাদিতে আসক্ত বা মুগ্ধ না হইয়া পড়াই জ্ঞানের কার্য্য।

১৪। 'নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্ব মিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু'—ইষ্ট ও অনিষ্ট সংঘটিত হইলে সর্ব্বদাই মনে একরূপ নির্ব্বিকার ভাব রক্ষা কবা। শুভ বা অশুভ যাহাই আসুক না কেন তাহাতেই হৃদয়ের বা চিত্তেব সাম্যাবস্থা রক্ষা করিয়া থাক অর্থাৎ সুখের কারণ উপস্থিত হইলে আনন্দে নৃত্য এবং দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলে মৃতপ্রায় হইয়া পড়া, মনে এরূপভাব থাকা উচিত নহে। সকল অবস্থাতে নির্ব্বিকার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিবে, ইহাই জ্ঞান।

১৫। 'ময়িচানন্য যোগেন ভক্তির ব্যভিচারিণী'—পরমেশ্বরে অনন্য যোগদ্বারা

অব্যভিচারিণী ভক্তি। প্রাণের সমস্ত ভালবাসা ভগবান্‌কে ঢালিয়া দেওয়া। যে ভালবাসায় নিজের কোনই স্বার্থ-বুদ্ধি নাই, নিজের কোনই কামনা নাই, এবং ভগবানের ভজনা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া ভগবানের প্রতি ভালবাসার বিচ্ছেদ হয় না। ভগবানের প্রতি এইরূপ অহৈতুকী ভক্তি যাহার হৃদয়ে জন্মিয়াছে সেই প্রকৃত ভক্ত—প্রকৃত জ্ঞানী।

১৬। 'বিবিক্তদেশসেবিত্বং—পবিত্র' এবং চিত্তপ্রসাদকর নির্জ্জন দেশে নিরুপদ্রব স্থানে বাস করা। যাহার মনে প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তিনি জনকোলাহলপূর্ণ স্থান ভাল না বাসিয়া নিরুপদ্রব নির্জ্জন স্থানে বাসপ্রিয় হইয়া থাকেন। নির্জ্জন পবিত্রস্থানে বাস জ্ঞানসাধনের অনুকূল। সুতরাং উহাকে জ্ঞানই বলা হইয়াছে।

১৭। 'অরতির্জ্জন সংসদি'—আত্মজ্ঞানবিমুখ প্রাকৃত জনের সংসর্গে বিরাগ। যাহারা কেবলই বিষয়াসক্ত ভগবচ্চিন্তা যাহাদের মনে আদৌ প্রবেশ করে না, জ্ঞানী সাধক সেই বিষয়াসক্ত তত্ত্বজ্ঞানবিমুখ ব্যক্তির সংসর্গ ত্যাগ করিতে যত্নবান্ হন। বিষয়াসক্ত তত্ত্বজ্ঞানবিমুখ লোকের সংসর্গে অরুচি জ্ঞানেরই লক্ষণ।

১৮। অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব—আত্মানাত্ম 'বিবেকপরায়ণতা, অর্থাৎ আমি কি? জগৎ কি? ঈশ্বরই বা কি পদার্থ? এই সকল বিষয় বিচার করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতঃ সেই জ্ঞানে নিত্য স্থিত থাকার অবস্থা। ইহা জ্ঞানলাভের প্রধান সাধন বলিয়া জ্ঞানরূপেই গণ্য করা হইয়াছে।

১৯। তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন—তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ বা প্রয়োজন যে মোক্ষ তাহার আলোচনা ও প্রত্যক্ষ দর্শন। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে যে মুক্তি হয় ইহা অনুভবসিদ্ধ। যিনি তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিয়া মুক্ত হইয়াছেন তিনি ইহা বুঝিতে সক্ষম। ইহা অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

"অমানিত্ব" হইতে "তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন" পর্য্যন্ত যে উনিশ প্রকার জ্ঞান সাধনের কথা ভগবান্ বলিয়াছেন জ্ঞানী ব্যক্তিগণের এই সমস্ত ভাব ও লক্ষণগুলি ক্রমে হৃদয়ে প্রকাশ পায়। যাহাদের হৃদয়ে এই সমস্ত ভাব স্থান পায় না তাহারা

অজ্ঞান। এইজন্য ভগবান্ বলিয়াছেন, "অমানিত্ব" হইতে "তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন" পর্য্যন্ত সমস্ত ভাবগুলি প্রকৃত জ্ঞান লাভের সাধন বলিয়া এই সমস্তই জ্ঞান। ইহার অন্যথায় যত কিছু মনের ভাব তৎসমস্তই অজ্ঞান।

উপরিউক্ত জ্ঞানের সাধন দ্বারা যে বস্তু জ্ঞেয়, সেই বস্তু কি? শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন ;—

"অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে।"

গীতা ১৩-১২।

আদ্যন্ত-শূন্য আমার (পরমাত্মার) পরম নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম সৎও নয়, অসৎও নয়, অর্থাৎ তিনি সদসতের অতীত—গুণাতীত। এই গুণাতীত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই জ্ঞেয় অর্থাৎ জানিবার বস্তু—যাঁহার জ্ঞানলাভ করিলে সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান লাভ হইয়া মুক্তিলাভ হয়। ভগবানের যে ভক্ত এই জ্ঞান লাভ করেন তিনি ভগবদ্ভাবই প্রাপ্ত হন। ইহাই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা।

পরম কারুণিক ভগবান্ তাঁহার অমৃতময়ী গীতায় এই তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে সপ্তম অধ্যায় হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত ভক্তি ও জ্ঞানযোগ উপদেশ দিয়া জীবের মুক্তিপথ দেখাইয়াছেন।

"জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞান মিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।"
যজ্ জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমেব শিষ্যতে॥

গীতা ৭।২॥

আমি তোমাকে বিজ্ঞান সহিত সেই জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে উপদেশ দিতেছি, যাহা জানিলে আর কিছু জানিবার বিষয় অবশিষ্ট থাকে না।

অত্যন্ত গোপনীয় বিজ্ঞানসহিত জ্ঞানের উপদেশ, অসূয়াশূন্য তোমাকে প্রদান করিতেছি। এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।

এই জ্ঞান বিদ্যাসমূহের রাজা। এবং যত কিছু গোপনীয় আছে, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহা উত্তম, পবিত্র, প্রত্যক্ষগম্য, সুখসাধ্য, অক্ষয় ফলজনক এবং ধর্ম্মমূলক। *

ভগবান্ যে জ্ঞানের উপদেশ দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সেই জ্ঞান তাঁহার মতে সকল জ্ঞানের রাজা বা শ্রেষ্ঠ। এই জ্ঞানই ব্রহ্মবিদ্যা—সংসারের সকল প্রকার বিদ্যার রাজা। ভগবান্ আরও বলিয়াছেন এই জ্ঞান গুহ্যতম—রাজগুহ্য। অর্থাৎ যতকিছু গুহ্য বা গোপনীয় বিষয় আছে, তন্মধ্যে এই জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্য ও গোপনীয়। ভগবানের প্রতি অর্জ্জুনের অসূয়া বা দ্বেষ ত ছিলই না বরং ভক্তি ও শ্রদ্ধাই ছিল। সেইজন্য অর্জ্জুনকে এই রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্য জ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন। যাহারা ভগবানকে দ্বেষ করে বা যাহাদের ভগবানের প্রতি মনের অনুরাগ নাই, তাহাদের নিকট এই জ্ঞানের কথা বলিলে কোনই ফল হইবে না। অসূয়াশূন্য বলার ইহাই তাৎপর্য্য॥

তপস্যা ও কর্ম্মাদিবিষয়ক জ্ঞান সমূহের মধ্যে মোক্ষ হেতু বলিয়া উত্তম পরমাত্ম-নিষ্ঠজ্ঞান পুনর্বার বলিতেছি; যাহা জানিয়া ব্রহ্মবিদ্‌গণ এই দেহ বন্ধন হইতে মোক্ষলাভ করেন। ১॥

এই বক্ষ্যমাণ জ্ঞান অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ জ্ঞান সাধনের অনুষ্ঠান করিয়া আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহারা সৃষ্টিকালে পুনরুৎপন্ন হন না এবং প্রলয় দুঃখও অনুভব করেন না অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন।২॥ †

*"ইদন্তুতে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যন সূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞান সহিতং যজ্ জ্ঞাত্বা মোক্ষসেঽশুভাৎ॥ ১॥
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্র মিদ মুত্তমম্॥
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্মং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্॥ ২॥"

গীতা ৯—১।২

† "পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞান মুত্তমম্।
যজ্ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধি মিতোগতাঃ॥ ১॥

সেই বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান কি?

"ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥ ১॥
ক্ষেত্রজ্ঞ ঞ্চাপিমাং বিদ্ধি সর্ব্ব ক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্ জ্ঞানং মতং মম॥ ২॥"

গীতা—১৩—১।২

হে কুন্তীনন্দন! এই শরীরের নাম ক্ষেত্র, যিনি এই শরীরে থাকিয়া "আমি" বা "আমার" ইত্যাকার অভিমান করেন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। ইহা বিবেকিগণের সিদ্ধান্ত।

হে ভরতনন্দন! সকল ক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞকে অবগত হওয়া আর আমাকে অবগত হওয়া একই কথা।

বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ নানা শাস্ত্রে এই জ্ঞানেরই উপদেশ করিয়া গিয়াছেন।

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভি র্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্র পদৈশ্চৈব হেতু মদ্ভির্বি নিশ্চিতৈঃ॥

গীতা—১৩—৪।

(এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব) ঋষিগণ বহুপ্রকারে কীর্ত্তন করিয়াছেন; নানাবিধ বেদে এবং যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত ব্রহ্মসূত্র পদ দ্বারাও বিভিন্ন রূপে ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ভক্তি জ্ঞানের প্রধান সাধন। ভক্তি ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভ হয়না। গীতায় শ্রীভগবান্ এইমত প্রকাশ করিয়াছেন—জ্ঞানই মুক্তির হেতু; জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হয়না।

ইদং জ্ঞান মুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্য মাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপ জায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥ ২॥

গীতা ১৪ ১-২

সাংখ্য দর্শনে জ্ঞানেরই প্রশংসা করা হইয়াছে।

"জ্ঞানান্মুক্তিঃ।"

সাংখ্য সূত্র—৩।২৩

মুক্তি বা দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির প্রধান উপায় জ্ঞান।

জ্ঞান কি? সাংখ্য মতে প্রকৃতি পুরুষের বিবেক বা পার্থক্যজ্ঞান। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব এবং পুরুষ এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান হইলে মুক্তি হয়।

শ্রীভগবান্ গীতায় ও প্রকৃতি পুরুষের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান বলিয়াছেন;—

"ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্ জ্ঞানং মতং মম॥"

গীতা—১৩—২॥

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের যে পার্থক্য জ্ঞান, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান।

গীতার মতে প্রকৃতি, পুরুষ উভয়ই অনাদি। পুরুষ তিন প্রকার; ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ এবং পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তমের জ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান এবং মুক্তির হেতু।

যোমামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতিমাং সর্ব্বভাবেন ভারত॥

গীতা—১৫—১৯॥

হে ভারত! যিনি অসংমূঢ় হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম রূপে জানেন, তিনি সর্ব্বভাবেই আমাকে ভজনা করেন এবং তাহার ফলে সর্ব্ববিদ্ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—সর্ব্বত্র সমদর্শনই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা; সমদর্শনই যোগ।

"সমত্বং যোগউচ্যতে।"

গীতা

"ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥১৯॥"

যাঁহাদের মন সাম্যে স্থিত হইয়াছে, অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যাঁহারা নিজের সুখ দুঃখ বুঝিয়া সেইরূপ সুখ দুঃখ অন্যেরও হয়, এইভাবে অন্যকেও নিজের মতই দেখেন, তাঁহারা ইহ জীবনেই মুক্ত—তাঁহাদিগকে জীবন্মুক্ত বলা যাইতে পারে।

ভেদ-রূপ দোষরহিত নির্ম্মল সমভাবই ব্রহ্ম। "ব্রহ্মই জ্ঞানস্বরূপ।" যাঁহার এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে তিনিই ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করিয়াছেন।

"বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকেচ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

গীতা—৫।—১৮॥

যাঁহার দৃষ্টিতে বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর, চণ্ডাল প্রভৃতি অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন জীব এক ব্রহ্মেরই মূর্ত্তি, তিনিই পণ্ডিত। এইরূপ জ্ঞানী বড়ই দুর্লভ।

"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।"

গীতা

সকলই বাসুদেব বা ব্রহ্ম, অনুভব দ্বারা যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যাঁহার সর্ব্বত্র এইরূপ ব্রহ্মদর্শন লাভ হইয়াছে, তাহারই দেহাত্মজ্ঞান দূর হইয়া সর্ব্বত্রই ব্রহ্মদর্শন প্রত্যক্ষ হইয়াছে। এইরূপ মহাত্মা অতি দুর্লভ।

এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী যাঁহারা হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেই এইরূপ সমত্ব দর্শন সম্ভবপর। কারণ তাঁহাদের ভেদবুদ্ধি চলিয়া গিয়াছে।

সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে জীবের স্বাভাবিক ভেদজ্ঞান দূর হয়। তখন সর্ব্বত্রই সমদর্শন হয়। তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হইলে স্বাভাবিক ভেদ-জ্ঞান দূর হয়না।

ভেদজ্ঞান—জীবের স্বাভাবিক হইবার কারণ কি ?

পরব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ এবং অদ্বিতীয়। তিনি ইচ্ছাময়। তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সৃষ্টি কল্পিত হয়। তিনি "বহু হইব" এইরূপ সঙ্কল্প করিবামাত্রই সৃষ্টি আরম্ভ হয়। তাঁহারই অধ্যক্ষতায় গুণময়ী প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করেন। সৃষ্ট প্রত্যেক বস্তুতে আত্মা অনুপ্রবিষ্ট আছেন।

নাম ও রূপ উপাধিতে সৃষ্ট প্রত্যেক বস্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অভিব্যক্ত হয়। নাম ও রূপ উপাধি দ্বারা দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি অনন্তজীব একে অন্যকে পৃথক্ বলিয়া মনে করে। প্রকৃতিজাত অহঙ্কার হইতেই "আমি" "তুমি" "তিনি" ইত্যাদি জ্ঞান হয়।

কুক্কুর, হাতী, বিষ্ঠার ক্রিমি, গো, মহিষ, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে সমদৃষ্টি কিরূপে লাভ হয় ? কিরূপে ইহার কল্পনা হইতে পারে ?

এইরূপ সমদৃষ্টি প্রত্যক্ষ-জ্ঞানসাধ্য। যাঁহারা এই সমত্বভাব প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে বা অনুভূতিতে জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা এইভাব বুঝাইতে পারেন। যোগসিদ্ধ ব্যক্তিই সমত্বযোগের স্বরূপ বলিতে পারেন। বহু সাধনায় সিদ্ধ হইলে এই জ্ঞান লাভ হয়।

মাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানহীন মূঢ় ব্যক্তির সমদর্শনের ভাব বুঝিতে চেষ্টা করা সাহসিকতার কার্য্য। তথাপি একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা অতি সামান্য ভাবে এই জ্ঞানের কণামাত্র পরোক্ষ ভাবে কিঞ্চিৎ বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি।

"যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রা বস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥"

গীতা—১৩—৩২

আকাশ যেমন সর্ব্বব্যাপী হইয়াও কিছুরই সহিত লিপ্তনহে (অর্থাৎ বায়ু, অগ্নি, জল ও মৃত্তিকা দ্বারা যেমন মলিন হয়না) এই আত্মাও তদ্রূপ এই শরীরের সর্ব্বত্র স্থিত হইয়াও, শরীরের কোন প্রকার গুণ বা পরিণাম প্রাপ্ত হন না।

আকাশ সর্ব্বব্যাপী, নিরবয়ব এবং সকল ভূতের আশ্রয়। আকাশ প্রত্যেক বস্তুর অন্তরে বাহিরে আছে। সকল বস্তুর আধার স্বরূপ আকাশ। আকাশ মহৎ এবং অপরিচ্ছিন্ন। দৃষ্টান্তস্থল,—ঘটের ভিতরে ও আকাশ আছে।' এস্থলে ঘটদ্বারা আকাশ পরিচ্ছিন্ন বা সীমা বিশিষ্ট হইয়াছে। আকাশ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। আকাশের গতি নাই, কিন্তু ঘটে যেটুকু আকাশ আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, ঘটের স্থানান্তর গতিতে সেই আবদ্ধ আকাশেরও স্থানান্তর গতি প্রতীত হয়। আমরা ঘটটী হাতে করিয়া চলিয়া গেলে সঙ্গেসঙ্গে ঘটাকাশও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায় বলিয়া প্রতীত হয়।

বায়ু আকাশের সর্ব্বত্রই চলিতেছে। বায়ুর সহিত আকাশের লিপ্ততা নাই। এখন কতগুলি ঘট বা ঘটাকাশের ভিতর আমরা যদি কোন ঘটে চন্দন, কোন ঘটে বিষ্ঠা, কোন ঘটে ছাই, কোন ঘটে আর কিছু সুগন্ধ বা দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু রাখি তখন সেই ঘটস্থিত আকাশ সুগন্ধ বা দুর্গন্ধযুক্ত বলিয়া প্রতীত হয়।

ঘটস্থিত বস্তুর সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ বায়ুদ্বারা নাসিকায় প্রবেশ করিলে বস্তুর গুণে নির্লিপ্ত আকাশকে সুগন্ধ বা দুর্গন্ধযুক্ত বলিয়া অনুভূত হয়। ঘটে আকাশ আছে বলিয়া ঘটের চলনের সঙ্গে সঙ্গে আকাশও চালিত হয় এবং ঘটস্থিত সুগন্ধ ও দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু হইতে আকাশকে ও সুগন্ধ বা দুর্গন্ধযুক্ত মনে হয়। আকাশ সুগন্ধ এবং দুর্গন্ধ উপাধি যুক্ত হইয়া সুগন্ধ আকাশ হইতে দুর্গন্ধযুক্ত আকাশ পৃথক্ বলিয়া মনে করি। সুগন্ধযুক্ত আকাশ প্রিয় হইয়া পড়ে; দুর্গন্ধযুক্ত আকাশ অপ্রিয় হইয়া পড়ে। যদি উক্ত বস্তুগুলি ঘট হইতে উঠাইয়া নিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলি, সেই উপাধিযুক্ত পরিষ্কৃত ঘটাকাশে সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ উপাধি নষ্ট করিলে কোনই গন্ধ পাওয়া যাইবে না। ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও ঘটাকাশ অপরিচ্ছিন্ন মহাকাশের সহিত মিলিয়া যাইবে। সমস্ত ঘটেই নির্দ্দোষ আকাশ আছে। ঘটস্থিত বস্তুর গুণে তৎস্থিত আকাশও সেই গুণযুক্ত অনুভূত হইয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে আকাশ নির্ম্মল, দোষশূন্য।

আকাশও ভূত। আকাশেরও আধার পরমাত্মা। পরমাত্মা স্বরূপতঃ

নির্দ্দোষ ও সমভাবপূর্ণ। ইনি সর্ব্বদাই একরূপ। ইঁহার গুণ-বিকার নাই। ইনি গুণাতীত। এই পরমাত্মা বা পরব্রহ্মই প্রকৃতির আশ্রয়ে জীবভাব—জীব উপাধি প্রাপ্ত হইয়া বহু হইয়াছেন। সেইজন্য এক জীব অন্য জীব হইতে পৃথক্ মনে করে। কেহ হাতী, কেহ কুক্কুর, কেহ চণ্ডাল, কেহ ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। কিন্তু নির্দ্দোষ সমব্রহ্ম এই বহুভাবে প্রতীয়মান জীবের অন্তরে বাহিরে সমভাবে আছেন। ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞাত হইলে সর্ব্বত্রই এই ভেদভাব উঠিয়া যায়; ভেদজ্ঞান সমস্তই দেহ বা ঘট উপাধিগত। দেহ বা ঘট না থাকিলে বা উপাধির নাশ হইলে "এক মেবা দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" এক এবং সমভাবেই স্থিত থাকা অনুভূত হয়। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী পণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বত্র সমভাব বা নিরঞ্জন ব্রহ্মভাব দর্শন করেন।

আমরা উপাধিযুক্ত বদ্ধজীব। পদে পদে আমাদের ভেদজ্ঞান আছে। নিজের সন্তানকে, স্ত্রীকে, নিজের অর্জ্জিত ধনকে আমরা আপনার বলিয়া তাহাতে আকৃষ্ট ও অনুরক্ত হই। বিষয়ে এইরূপ আসক্তি থাকা সত্ত্বে মলিন মনে ব্রহ্মের সমত্ব উপলব্ধি হইবেই না। এমত অবস্থায় ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, হাতী, কুক্কুর এক মনে করিয়া জ্ঞানাভিমান করিলে প্রতারিত হইতে হইবে।

স্থূল-সূক্ষ্ম উভয় রূপেই সমদর্শন হইতে পারে। সূক্ষ্ম চিন্তায় কিরূপে সমদর্শন হইতে পারে তাহার আভাস উপরে দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

স্থূল দৃষ্টিতেও দেখা যায় প্রত্যেক জীব দেহের রস, রক্ত, অস্থি, মেদ, মজ্জা এক উপাদানেই গঠিত। অন্তঃকরণের বৃত্তি, সুখ-দুঃখ, ভয় অভয় প্রভৃতি এক ভাবেই হইয়া থাকে। এইরূপ চিন্তাতে ও সমদর্শন হইতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিতে অভ্যাস করিলে ক্রমে সূক্ষ্মজ্ঞানে সমদর্শন লাভ হওয়া সম্ভব পর হয়।

তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে অপরোক্ষজ্ঞানে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়। যাঁহার এইরূপ অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে, তিনিই পরম যোগী—তিনিই সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করিতে সমর্থ হন। তিনিই সর্ব্বত্র সমদর্শী।

সমদর্শন সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীশ্রীভগবানের উপদেশ এইরূপ ;—

সর্ব্বভূতস্থ মাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগ যুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
যোমাংপশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
সর্ব্বভূত স্থিতং যোমাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥
গীতা—৬-২৯।৩০।৩১।৩২॥

সর্ব্বত্র সমদর্শী আত্ম-যোগী আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্ব ভূতকে আত্মাতে দর্শন করেন।২৯॥

যে যোগী সর্ব্বত্র আমাকে (পরমাত্মাকে) দর্শন করেন এবং আমাতে সমস্ত পদার্থ দেখিতে পান, আমি তাহার প্রত্যক্ষ বহির্ভূত হইনা এবং তিনিও আমার কৃপাদৃষ্টির বহির্ভূত হন না॥৩০॥

যে যোগী পুরুষ সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে (পরমাত্মাকে) আপনার (জীবাত্মার) সহিত অভিন্নরূপ অনুভব করেন, তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন আমাতেই অবস্থিতি করেন (অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন)। ॥৩১॥

হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি আত্মদৃষ্টান্তে সুখ-দুঃখ সর্ব্বত্র সমভাবে দর্শন করেন, তিনি পরম যোগী।

অজ্ঞান।

(অজ্ঞানেনাবৃতংজ্ঞানম্)

যাহা জ্ঞানের বিরোধী—জ্ঞানের আবরক এবং যাহা হইতে মোহ উৎপন্ন হয়, তাহাই অজ্ঞান। সংসার অজ্ঞানমূলক। সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে অজ্ঞান দূর হয়। সংসার বন্ধন মুক্ত হয়।

সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ পরমেশ্বরের মায়াশক্তি—মূল প্রকৃতি আদ্যাশক্তি মহামায়ার দুইটী ভাব আছে—বিদ্যা এবং অবিদ্যা। আদ্যাশক্তির ত্রিগুণাত্মকা প্রকৃতির সত্ত্বগুণ বিদ্যার আশ্রয়ে পুষ্ট হয়। রজঃ ও তমোগুণ অবিদ্যাদ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সত্ত্বাশ্রয়া বিদ্যারূপা মহাদেবী জ্ঞান, ধর্ম্ম, ঐশ্বর্য্য এবং বৈরাগ্যের গর্ভ-ধারিণী মা। বিদ্যা হইতেই জ্ঞান, ধর্ম্ম, ঐশ্বর্য্য এবং বৈরাগ্য লাভ হয়।

রজস্তমোময়ী সেই মহামায়া অবিদ্যারূপা হইয়া অজ্ঞান, অধর্ম্ম, অনৈশ্বর্য্য ও অবৈরাগ্য প্রসব করেন। অবিদ্যা হইতেই অজ্ঞান, অধর্ম্ম, অনৈশ্বর্য্য ও অবৈরাগ্য উৎপন্ন হয়।

শ্রীশ্রীচণ্ডীমাহাত্ম্যে জ্ঞান ও অজ্ঞানরূপা মহামায়ার এইরূপ স্তুতি মন্ত্র আছে ;—

সা বিদ্যা পরমা মুক্তেহের্তুভূতা সনাতনী।
সংসার বন্ধ হেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥

চণ্ডী—মধুকৈটভ বধ—৫২ শ্লোক।

তিনি মুক্তির হেতুভূতা সনাতনী পরমা বিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যা। তাঁহার প্রসন্নতায় জীব মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। তিনি সংসারের বন্ধনের হেতু। তাঁহার ইচ্ছাতেই জীবের সংসার বন্ধন হয়। তিনিই সর্ব্বেশ্বরী তিনি বিশ্বেশ্বরী—জগদ্ধাত্রী এবং স্থিতিসংহারকারিণী।

তিনিই—মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী ॥
চণ্ডী—ঐ—৭২।

সেই অদ্যাশক্তি, তাঁহারই সত্ত্বগুণকে যখন অনুগ্রহ করেন, তখন তিনি মহাদেবী-দ্যোতন-শীলা জ্ঞানরূপা হইয়া মেধা ও স্মৃতির পুষ্টি সাধন করেন। জীবের ব্রহ্মবিদ্যা লাভের সহায়তা করেন। যখন তিনি রজস্তমোগুণকে অনুগ্রহ করেন, তখন তিনি অজ্ঞানরূপা মহামোহা মহাসুরী তামসী হইয়া দাঁড়ান। তাহা হইতে জীব অজ্ঞানপ্রভব মোহ ও আসুরভব প্রাপ্ত হয়। তাহার ফলে জীব সংসারে বদ্ধ হয়।

অবিদ্যারূপা তিনি জীবের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, ও ভ্রান্তিরূপে স্থিতা হন। তিনি আবার বিদ্যারূপা হইয়া জীবের শান্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, স্মৃতি, দয়া ও তুষ্টি রূপে স্থিতা হন। তিনিই সুকৃতিশালী লোকের স্বয়ং লক্ষ্মী এবং পাপাত্মাদিগের অলক্ষ্মী ; পণ্ডিতদিগের বুদ্ধি এবং সৎদিগের শ্রদ্ধা।

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং যেন সমস্ত মেতৎ
ত্বং বৈ প্রপন্না ভুবি মুক্তি হেতুঃ ॥
চণ্ডী—নারায়ণীস্তব। ৫।

তুমি বৈষ্ণবী শক্তি, অনন্ত বল শালিনী ; তুমি বিশ্বের বীজ, পরম মায়া ; তুমি সমস্ত জগৎ মোহিত করিয়া রাখ, তুমি প্রসন্না হইলেই জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে।

এই অজ্ঞানরূপা তামসী মহামায়া, অপরাজিতা। তাঁহাকে কেহই পরাজয়

করিয়া মায়ামুক্ত হইতে পারে না। তিনি প্রসন্না হইলেই জীবকে সংসার বন্ধন হইতে উদ্ধার করিয়া মুক্তি দান করেন।

জীবের বিষয়গতজ্ঞান অজ্ঞানরূপেই গণ্য। বিষয়গোচরজ্ঞান প্রাণিসাধারণেরই আছে।

রাজা সুরথ শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া রাজ্য ভ্রষ্ট হন। অমাত্যগণও তখন তাঁহার প্রতি সদ্ব্যবহার না করায় তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়া একাকী বনে চলিয়া যান। বৈশ্য-কুল-জাত সমাধি নামক এক ধনী ব্যক্তি ধনলোভী স্ত্রী পুত্র কর্ত্তৃক নিষ্কাষিত হইয়া বনে চলিয়া গিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে মেধস্ মুনির আশ্রমের নিকটবর্ত্তী বনমধ্যে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যের পরস্পর দেখা হয়। আলাপ করিয়া উভয়েই উভয়ের মনোবেদনা ও বন গমনের কারণ জানিলেন। কিন্তু অজ্ঞানরূপা মহামায়ার শক্তির এমনি প্রভাব যে উভয়ের বিষয়-বিরক্তির যথেষ্ট কারণ থাকিলেও উভয়েই বাড়ীর ও স্ত্রী পুত্র পরিবার প্রভৃতির মমতায় বড়ই দুঃখিত ও দুর্ম্মনা হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যের মনে বড়ই সংশয় উপস্থিত হইল ;—"আমরা অজ্ঞান নহি, জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এইরূপ মোহ ও দুঃখ উপস্থিত হইল কেন ? যাহারা আমাদিগের প্রতি এত দুর্ব্যবহার করিয়াছে, তাহাদের জন্য আমাদিগের মন এত চঞ্চল ও মমতাকৃষ্ট হয় কেন ?"

মনের এই সংশয় মীমাংসা জন্য উভয়ে মেধস্ মুনির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ভক্তির সহিত প্রণিপাত পূর্ব্বক তাহাদের মনের ভাব জানাইয়া বলিয়াছিলেন ;—

তৎ কেনৈ তন্মহাভাগ যন্মোহো জ্ঞানিনো রপি।
মমাস্য চ ভবত্যেষা বিবেকান্ধস্য মূঢ়তা ॥

চণ্ডী—সুরথোপাখ্যান—৪০ ॥

অবিবেকীরাই মোহান্ধ হইয়া থাকে, এই বৈশ্য এবং আমি উভয়েই জ্ঞানী। কি জন্য বিবেকান্ধের ন্যায় আমরা মোহপ্রাপ্ত হইলাম ?

মেধস্ মুনি উত্তর করিলেন—"আপনারা যে জ্ঞানের অভিমান করিতেছেন, উহা প্রকৃত জ্ঞান নহে। উহা অজ্ঞানের মধ্যেই গণ্য।

জ্ঞান মস্তি সমস্তস্য জন্তো বিষয় গোচরে।"

চণ্ডী ॥ ৪২ ॥

বিষয় গোচরজ্ঞান জন্তুমাত্রেরই আছে

"মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেতে কিং ন পশ্যতি॥"

চণ্ডী—৪৭ ॥

হে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ! তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না যে, মনুষ্যগণ লোভের বশবর্তী হইয়া এবং প্রত্যুপকার লাভের আশায় স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতিকে ভালবাসিয়া থাকে; ইহা অজ্ঞানেরই কার্য্য। অজ্ঞানরূপা মহামায়াই জীবগণকে এইরূপ মায়ামুগ্ধ করিয়া মোহ গর্ত্তে পাতিত করেন। প্রকৃত জ্ঞানী লোকেরা এইরূপ মোহান্ধ হন না। সংসারস্থিতিকারিণী মহামায়ার অবিদ্যা প্রভাবে সংসার চলিতেছে।

অজ্ঞান সম্বন্ধে দার্শনিক আচার্য্যদিগের উপদেশ কি?—সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি।—

সাংখ্য দর্শনের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে অবিবেক বা অজ্ঞান নিমিত্ত জীবের বৈষয়িক সুখ দুঃখ ভোগ হয়। অবিবেক বা অজ্ঞান নষ্ট হইলে, আর জীবের ভোগ হয় না। জীব সংসার মুক্ত হয়।

অবিবেক—অজ্ঞান কি?—পুরুষ প্রকৃতির অভেদ জ্ঞানই অবিবেক বা অজ্ঞান। পুরুষ প্রকৃতির ভেদজ্ঞান হইলে অজ্ঞান থাকে না।

পাতঞ্জল দর্শনমতে;—

"ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃপুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।"

যে পুরুষবিশেষ ক্লেশ, কর্ম্ম-বিপাক ও আশয়ের সম্পর্কশূন্য তিনিই ঈশ্বর। সাধারণ পুরুষ বা জীব ক্লেশ, কর্ম্ম-বিপাক ও আশয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত।

ক্লেশ—পাঁচ প্রকার ;—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। অবিদ্যা মিথ্যাজ্ঞান ; অস্মিতা—ভিন্ন বস্তুতে অভেদ জ্ঞান ; রাগ—আসক্তি ; দ্বেষ—বিরাগ ; অভিনিবেশ—মরণ ভয়।

বিপাক—কর্ম্মফল। কর্ম্ম দুইপ্রকার—সুকৃত ও দুষ্কৃত (পাপ ও পুণ্য) কর্ম্মফলে, জন্ম, আয়ু ও ভোগ হয়।

যোগদ্বারা প্রকৃতি পুরুষের ভেদের নিশ্চয়রূপে জ্ঞান হয়। তাহাতেই মুক্তি।

"যোগ শ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।"

চিত্তের পাঁচটি ভূমি বা অবস্থা।

(১) ক্ষিপ্ত—রজোগুণের আধিক্য বশতঃ চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠে।

(২) মূঢ়—তমোগুণের আধিক্য হইলেই—চিত্ত মোহাচ্ছন্ন হইয়া থাকে।

(৩) বিক্ষিপ্ত—সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হইলে কখন কখনও মন স্থির ও শান্তভাব প্রাপ্ত হয়। আবার কখন কখনও চিত্ত অস্থির হইয়া পড়ে।

(৪) একাগ্র—ধ্যেয় বস্তুতে চিত্তের একতান প্রবাহ হয়।

(৫) নিরুদ্ধ—চিত্তবৃত্তিগুলি নিরোধ হইয়া কেবল বৃত্তিজনিত সংস্কার মাত্র থাকে।

ক্ষিপ্ত এবং মূঢ় অবস্থায় চিত্ত সম্পূর্ণ অবিদ্যা বা অজ্ঞানের বশীভূত থাকে। এ অবস্থায় যোগ অসম্ভব। বিক্ষিপ্ত অবস্থায় যোগের চেষ্টা হইতে পারে। যখন সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয় তখন মনকে স্থির রাখা যাইতে পারে।

চিত্তের একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থাতেই যোগ সহজ সাধ্য হয়। যোগসিদ্ধ হইলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়—অজ্ঞান দূর হয়। তাহার ফলে অপবর্গ বা মুক্তিলাভ হয়।

গীতাই বেদান্ত—উপনিষদ্ সার এবং স্মৃতি প্রস্থান।

অজ্ঞান সম্বন্ধে গীতার উপদেশ কি ?— জানিতে পারিলে মোটামুটি ভাবে বেদান্ত দর্শনের উপদিষ্ট জ্ঞান লাভ হয়।

শ্রুতির "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভই তত্ত্বজ্ঞান। পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গীতায় এই জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন। তত্ত্বমসির জ্ঞান হইলে সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়। এই এক বস্তুর জ্ঞান হইলেই সমস্ত বস্তুর জ্ঞান লাভ হয়। পুরুষের পরম শ্রেয়ঃ লাভ হয়। ব্রহ্ম পরমাত্মা এবং জীবের স্বরূপ জানাই "তত্ত্বমসি" জ্ঞান। এই জ্ঞান লাভের উপায় শ্রীভগবান্ গীতায় তিন ভাগে উপদেশ দিয়াছেন।

(১) কর্ম্মযোগে চিত্ত শুদ্ধিলাভ।

(২) ভক্তিযোগে ভগবানের উপাসনা করিয়া তাঁহার স্বরূপ জ্ঞান লাভ।

(৩) কর্ম্ম ও ভক্তিযোগের শেষ ফল, জ্ঞানযোগে পরব্রহ্মে স্থিত হইয়া নির্ব্বাণ—পরমা শান্তি লাভ করা।

মনুষ্যের পক্ষে ভগবান্কে তত্ত্বতঃ জানা বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা কঠোর তপস্যা এবং সংযম সাধ্য। বিষয়-বৈরাগ্য মনে উদয় না হইলে কেহই আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টাই করে না।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততা মপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"

গীতা—৭-৩॥

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কদাচিৎ কেহ এই জ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টা করে। আবার এই যত্নশীল সাধকদিগের সহস্র সহস্রের মধ্যে কদাচিৎ কেহবা আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারে।

তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করা এত কঠিন কেন ?—

তমোগুণাধিক্যে পশু-যোনিতে জন্ম হয়, রজোগুণাধিক্যে মনুষ্য কুলে জন্ম হয়। মনুষ্যেতর প্রাণীর তত্ত্বজ্ঞান লাভের অধিকার নাই। কারণ তমোগুণে প্রাণীদিগকে

মোহিত করিয়া রাখে। উহাদের মধ্যে সাত্বিক ভাবের বিকাশ একেবারেই হয় না।

মনুষ্য রজোগুণপ্রধান বলিয়া আসক্তি এবং তৃষ্ণা প্রবল হইয়া তাহাকে কর্ম্মে রত করায় এবং তাহার ভোগেচ্ছা প্রবল হয়। এই রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা যাহাদিগের চিত্ত ক্ষিপ্ত এবং মূঢ় তাহারা তত্ত্বজ্ঞানের চেষ্টাই করে না। বিষয়ভোগেই রত থাকে। যাহাদের মন বিক্ষিপ্ত, তাহারা সত্ত্ব গুণের উদ্রেক বশতঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টা করে। সেই জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন, "বহুসহস্র ব্যক্তির মধ্যে কেহ কদাচিৎ আমাকে জানিবার চেষ্টা করে এবং চেষ্টাশীলদিগের সহস্র সহস্রের মধ্যে কদাচিৎ কেহ আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারে।" ইহার কারণ ভগবান্ বলিয়াছেন :—

"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥"

গীতা—৫—১৫ ॥

অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে। সেই জন্য জন্তুগণ মোহ প্রাপ্ত হয়।

স্বচ্ছ দর্পণ যেমন ময়লায় ঢাকা পড়ে, মেঘাচ্ছন্ন হইলে সূর্য্য যেমন ঢাকা পড়ে, জরায়ু দ্বারা যেমন গর্ভস্থ ভ্রূণ ঢাকা থাকে, ধূমের দ্বারা যেমন অগ্নি ঢাকা থাকে, সেইরূপ অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান ঢাকা থাকে।

ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির রজঃ ও তমোগুণ হইতে উৎপন্ন কাম ক্রোধ প্রভৃতি জ্ঞানের আবরক আসুর ভাবগুলি সাত্বিক গুণকে অভিভূত করিয়া বল পূর্ব্বক ইচ্ছার বিরুদ্ধে মনুষ্যদিগকে পাপাচরণ করায়।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতোমুনেঃ ॥

গীতা—২-৬৯।

মনুষ্যমাত্রেই স্বভাবতঃ দিবায় জাগ্রৎ থাকে, রাত্রে নিদ্রা যায়। প্রকৃত অজ্ঞান মনুষ্যই বিষয়ভোগে জাগ্রৎ থাকে। তত্ত্বজ্ঞান তাহাদের নিশা বা রাত্রি স্বরূপ। অর্থাৎ বিষয়ভোগই তাহাদের দিবা, তত্ত্বজ্ঞান তাহাদের রাত্রি। যাহারা

বিষয়-বিরক্ত, সংযমী এবং জ্ঞানী তাহাদের সম্বন্ধে বিষয়ভোগ রাত্রি এবং তত্ত্বজ্ঞান দিবা স্বরূপ হয়।

"ত্রিভির্গুণময়ৈ র্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভি জানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে॥"

গীতা—৭-১৩। ১৪

এই তিন গুণের ভাবদ্বারা জগৎ মুগ্ধ; রজঃ ও তমোগুণের আধিক্যে অজ্ঞান ও অবিবেক দ্বারা জগৎ মোহিত। সেইজন্য স্বয়ং পরমেশ্বর এবং ত্রিগুণের অতীত যে আমি এবং আমার যে অব্যয় ভাব আছে, মুগ্ধ জীব আমার সেই মায়াতীত নির্ব্বিকার ভাব এবং আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পাবে না।

এই মায়া দৈবী=বৈষ্ণবী মায়া—অলৌকিক সত্ত্বাদি গুণযুক্ত মায়া; পরমেশ্বরেরই শক্তি। সেই জন্য দুরত্যয়া—অপরাজিতা বা দুরতিক্রম্যা। যে আমাতে প্রপন্ন হয়, অর্থাৎ যে আমাকে স্মরণ ও কীর্ত্তনাদি দ্বাবা ভজনা করে, সে সর্ব্বভাবে আমার শরণ লয়, সেই এই মায়ার হাত এড়াইয়া মুক্তি লাভ করিতে পারে।

যিনি সগুণ উপাসক তিনি ভক্তিযোগে ভগবান্‌কে ভজনা করিয়া স্বরূপতঃ তাঁহাকে জানিয়া অজ্ঞান বা অবিদ্যার হাত এড়াইয়া মুক্তি লাভ করেন।

যিনি সাংখ্য জ্ঞানী তিনি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিয়া মায়া মুক্ত হন।

যিনি বেদান্তোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান-সাধক, তিনি নির্ব্বিকার গুণাতীত পরব্রহ্মের শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম বা আত্মার সাক্ষাৎ লাভ করতঃ মুক্তি লাভ করেন।

যিনি পাতঞ্জল দর্শনোক্ত সিদ্ধ যোগী, তিনি ধ্যান, ধারণা, প্রাণায়াম, যম, নিয়ম ও ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা পরমাত্মার দর্শন লাভ করিয়া মায়ামুক্ত হন।

মায়া সম্বন্ধে শ্রুতি এইরূপ বলেন ;—

"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।"

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্।

মায়াকে প্রকৃতি বলিয়াই জানিবে। যিনি মায়াবান, অর্থাৎ যাঁহার মায়া, তিনিই মহেশ্বর।

মায়া ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের বশীভূত। জীব মায়ার বশীভূত। মায়া যখন শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন থাকেন, তখন তিনি বিদ্যা। আর যখন মায়া রজস্তমোময়ী হইয়া মলিনা হন, তখনই তিনি অবিদ্যা বা অজ্ঞান রূপা।

এই মায়া স্বরূপ বুদ্ধিকে মোহিত বা আবরিত করেন। বেদান্ত মতে ব্রহ্মের পরাশক্তিই মায়া।

বেদান্তসার বলেন ;—

"অজ্ঞানন্তু সদসদ্‌ভ্যাং অনির্ব্বচনীয়ম্ ত্রিগুণাত্মকং
জ্ঞান বিরোধি ভাবরূপম্ যৎ কিঞ্চিৎ।"

বেদান্তসার।

অজ্ঞান সৎ ও অসৎ হইতে অনীর্ব্বচনীয় ত্রিগুণাত্মক জ্ঞান বিরোধী ভাবরূপ যৎ কিঞ্চিৎ।

মায়া সমষ্টি। অজ্ঞান বা অবিদ্যা ব্যষ্টি। মায়া আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিযুক্ত। অঘটন ঘটন পটীয়সী শক্তি। অজ্ঞানের দুইটী শক্তি। (১) আবরণা শক্তি; এই শক্তি দ্বারা বস্তুর স্বরূপকে আবরণ করিয়া বা ঢাকিয়া রাখে। বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে দেয় না। (২) বিক্ষেপ শক্তি। এই শক্তি দ্বারা বাস্তব পদার্থ বা বস্তুতে অন্য পদার্থ বা বস্তু বিক্ষেপ বা আরোপ করিয়া বাস্তব পদার্থকে অন্য পদার্থ বলিয়া ভ্রম জন্মাইয়া দেয়।

আবরণ শক্তি দ্বারা রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া বুঝিতে দেয় না। বিক্ষেপ শক্তিদ্বারা

সেই রজ্জু বা দড়িতে অন্য পদার্থ-সর্প-আরোপ করিয়া রজ্জুতে সর্প বলিয়া ভ্রম জন্মাইয়া দেয়। আবরণ শক্তিদ্বারা ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে দেয় না। ধর্ম্মকে আবরণ করিয়া রাখে। বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা ধর্ম্মের উপর অধর্ম্ম বিক্ষেপ বা আরোপ করিয়া ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া ভ্রম জন্মায়।

অজ্ঞান দূর হইলে রজ্জুকে রজ্জু বলিয়াই বোধ হইবে; ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়াই বোধ হইবে। ভ্রান্তি দূর হইয়া যাইবে। ইহাই দার্শনিক দিগের মত।

শ্রুতিতে ব্রহ্মের স্বাভাবিক জ্ঞানবল ক্রিয়াত্মিকা বিবিধ পরা শক্তির উল্লেখ আছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য—বলিয়াছেন,—"ব্রহ্মের এই পরা শক্তিই মায়া।"

ব্রহ্ম বহু হইবার সঙ্কল্প করিয়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির অধিষ্ঠানে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং বহু শত সহস্র রূপে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া অভিব্যক্ত হইয়াছেন। প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণের মিশ্রণের অনুপাতানুসারে বিচিত্র জগতের অসংখ্য বহু জীব হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা পরস্পর ভিন্ন, নানা বর্ণের নানা আকৃতির। জীবের অহং ভাবই ভেদ-জ্ঞান। ভেদ জ্ঞানই অবিদ্যা বা অজ্ঞান।

মায়া শক্তিকে নদীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এই মায়ানদীর স্রোতই (বাসনা রূপ স্রোতস্বতী সরিৎ) দুই ভাগে বিভক্ত। পুণ্যবহা এবং পাপবহা। সুকৃত কর্ম্মবশে জীব পুণ্য মহাস্রোতে গা ঢালিয়া দিলে, সেই পুণ্যবহা স্রোত জীবকে ক্রমোন্নতির দিকে বহিয়া নেয়। পাপাচারী দুষ্কৃত জীবকে পাপবহা স্রোতে ভাসাইয়া নেয়। তাহার ফলে সেই পাপী জীবের অধোগতি হয়।

লোকে যদি ভগবানের ভজনা করিলে সুখৈশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে, এবং মোক্ষলাভও করিতে পারে, তবে লোকে এই সুপথ পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের ভজনা করেনা কেন?

শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছিলেন;—

নমাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥

গীতা—৭—১৫।

দুষ্কৃতিশালী মূঢ় নরাধমগণ মায়া দ্বারা অপহৃত জ্ঞান হইয়া আসুরভাব আশ্রয় করে। সেইজন্য তাহারা আমাকে ভজনা করে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মায়া বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়রূপা। দৈবী মায়া শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা, আসুরী মায়া রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা। আসুরী মায়াদ্বারা মোহিত ব্যক্তি দম্ভ, দর্প, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির বশীভূত হইয়া, ভগবান্‌কে ভজনা করা দূরে থাকুক তাঁহাকে দ্বেষ করিয়া থাকে।

মায়াদ্বারা অপহৃতচিত্ত নরাধম ব্যক্তিগণ ঘোর অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তাহাদের সদ্বিষয়ের দৃষ্টিলোপ হইয়া যায়। মলিন মায়ার আবরণে তাহাদের চক্ষুঃ ঢাকা থাকে বলিয়া তাহারা তত্ত্বার্থ দর্শন করিতে পারে না। বাহিরের বিষয়-ভোগেই অনুরক্ত থাকে। মন অন্তর্ম্মুখ না হওয়ায় অন্তর্দৃষ্টির অভাবে ভগবানের স্বরূপ অনুভব করিতে বা জানিতে পারে না। তাহারা ক্রমাগত সংসার চক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জন্মমৃত্যুর দুঃখ ভোগ করে। জ্ঞানাগ্নি দ্বারা অজ্ঞান ভস্মীভূত করিতে না পারিলে মুক্তিলাভের আশা নাই।

শ্রীভগবান্ গীতায় আরও বলিয়াছেন ;—

অজ্ঞশ্চা শ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥
গীতা—৪—৪১ ॥

সদ্‌গুরুর উপদেশে শ্রদ্ধা করিয়া গুরূপদিষ্ট জ্ঞানলাভ করিবে। যাহারা বেদ, ঋষি ও শাস্ত্রবাক্য ও গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাহীন—সংশয়াত্মা, তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাহাদের ইহলোক বা পরলোকে কিছুই লাভ হয় না। সুখ বা পরাগতি কিছুই লাভ করিতে পারে না।

এই মারাত্মক সংশয় কি হইতে উৎপন্ন হয়? ভগবান্ বলিয়াছেন ;—"অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়।"

"তস্মাদ জ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥"

গীতা—৪—৪৩ ॥

হে ভারত! জ্ঞানরূপ অস্ত্রের দ্বারা তোমার হৃদয়স্থিত অজ্ঞান জাত সংশয় ছিন্ন করিয়া যোগাবলম্বনে ক্রমে উন্নতির পথে উঠিতে থাক।

এই অজ্ঞান-জাত কুহক বা কুজ্ঝটিকা দ্বারা সমস্ত জগৎ সমাচ্ছন্ন থাকে। ভগবানের অনুগ্রহে তাহার স্বীয় পরম জ্যোতির দর্শন লাভ হইলে, সমস্ত কুহক নিরস্ত হয়—অজ্ঞান দূর হয়। তখন স্ব প্রকাশ ভগবানের দর্শন লাভ হয়।

"ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি।"

শ্রীমদ্ভাগবত ॥

সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন ;—

"মা! আমায় ঘুরাবে কত? কলুর চোক্ ঢাকা বলদের মত।
কলুর গাছে ঘুড়ে দিয়ে মা! পাক দিতেছ অবিরত।
... ...
খুলে দে মা চক্ষের ঠুলি দেখি ব্রহ্ম মনের মত॥"

লিখা বাহুল্য অবিদ্যা বা অজ্ঞানই চক্ষের ঠুলি।

মুক্তাগাছার পরম ভক্ত রাজর্ষি শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী মহোদয়ের প্রতিষ্ঠিত "হরিভক্তি প্রদায়িনী" সভায় সদস্যগণের রচিত হরিসংকীর্ত্তনের গান হইয়া থাকে, সেই সকল গান হইতে একটী গান উদ্ধৃত হইল ;—

"হে কেশব! তব মায়ায় কত ভুলে রব, কতদিনে তোমায় পাব?
মম হৃদয় শতদলে হে কবে শ্রীপদ পূজিব?

মিটিল না পাপ আশা,
গেল না বিষয় পিপাসা,
হ'ল প্রবল মনের দুরাশা,
উপায়হীনের নাই সে আশা হে, আশুতোষ তোমায় তোষিব।
জ্ঞানের আলোকে আমার,
ঘুচিবে কি মনের আন্ধার,
দীনে দয়া হবে কি তোমার ?
কবে সরল আকুল প্রাণে হে, দয়াময় তোমায় ডাকিব ?
সংসার বাসনা, বিষয় কামনা,
সদা জাগে—মনে মনে ;
মিছে ভোগ আশায়,
মন কুপথে ধায়,
মনের মোহ যাবে কত দিনে ?
তোমাকে না জেনে,
এ পাপ জীবনে,
সদা দুঃখ পদে পদে ;
কবে দেখা দিবে,
দুঃখ দূরে যাবে,
শ্রীপদ প্রসাদে।
কত দিনে তব পদে হে, দেহ মন নিবেদিব !"
সঙ্গীত পুষ্পাঞ্জলি—মুক্তাগাছা হরিভক্তি প্রদায়িনী।

অজ্ঞানের হাত এড়াইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। অজ্ঞান নষ্ট না হইলে দুঃখ যাইবে না। সদাচার, কুলাচার এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া গুরূপদিষ্ট ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে থাক এবং করণীয় কর্ম্ম গুলি

কর্ত্তব্যবোধে করিয়া যাও। নিজের ন্যায্য প্রাপ্য লাভে সন্তুষ্ট থাকিবে। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির মতলব আটিয়া অন্যায় কোন কর্ম্ম করার প্রবৃত্তি যেন তোমার না হয়। গুরুজনে এবং ভগবানে ভক্তি রাখ। তাহা হইলেই ক্রমে চিত্ত শুদ্ধি হইয়া মন পবিত্র হইবে। অজ্ঞানের প্রভাব ক্রমে দূর হইয়া যাইবে।

মনে রাখা উচিত জাগতিক ভাব পদার্থ সমস্তই ত্রিগুণাত্মক। সাত্ত্বিক বৃত্তি জন্য জ্ঞান দয়া ধর্ম্ম ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্য প্রভৃতি সত্ত্ব প্রধান হইলেও উহাতে রজঃ ও তমো গুণের মিশ্রণ আছে। গুণের অভিব্যক্তির তারতম্যানুসারে ইহারা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক হইয়া থাকে।

রজঃ ও তমোগুণ জাত অজ্ঞান, অধর্ম্ম, অনৈশ্বর্য্য ও অবৈরাগ্য প্রভৃতি রজঃ ও তমোগুণ প্রধান হইলেও ইহাতে সত্ত্বগুণ বর্ত্তমান, কিন্তু অভিভূত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ব্রহ্ম।

(সত্যম্ জ্ঞানম্ আনন্দম্)

ব্রহ্মচর্য্যই মনুষ্যের পরম শ্রেয়ো লাভের প্রধান উপায়। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা মনুষ্য পবিত্র হইয়া যায়। ব্রহ্মচারী নির্ম্মল সাত্ত্বিক বুদ্ধিবলে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝিয়া ব্রহ্মভূত হইয়া মুক্তিলাভ করে। ব্রহ্মচর্য্যহীন মনুষ্য ভগবদ্ বিমুখ হইয়া পড়ে। তাহার বহির্ম্মুখ মন তখন বিষয় ভোগে আসক্ত হইয়া পরম শ্রেয়ো লাভে বঞ্চিত হয়। ব্রহ্মচর্য্যহীন মনুষ্য আত্ম-ঘাতী।

ব্রহ্মচর্য্য বলিতে কি বুঝায়? ব্রহ্মচর্য্য শব্দের অর্থ কি? ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে

ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে কিছু লিখিবার পূর্ব্বে "ব্রহ্ম" কি? বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

"ব্রহ্ম" সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠে,পুরাণাদি শ্রবণে "ব্রহ্ম" সম্বন্ধে যাহা কিছু পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছি, যথাসাধ্য অতি সংক্ষেপে তাহাই কিছু লিখিতে চেষ্টা করিতেছি।

"ব্রহ্ম"—"অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং।" গীতা ৮–৩।

পরম অক্ষর অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবিনাশী পরমাত্মাই—"ব্রহ্ম।" ব্রহ্ম-অবাঙ্ মনসগোচর—ব্রহ্ম-বাক্য ও মনের অগোচর। জীব, ঈশ্বর এবং ব্রহ্ম একই পদার্থ। জীব এবং ঈশ্বর সোপাধিক, ব্রহ্ম নিরুপাধিক। সগুণ-ব্রহ্ম—ঈশ্বর মায়াধীশ অর্থাৎ তিনি মায়ার অধীন নহেন। মায়াই তাঁহার অধীন। সোপাধিক জীব মায়ার

ত—পরব্রহ্মের পরা প্রকৃতির স্বরূপ।

বৃন্‌হ ধাতু হইতে ব্রহ্মপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, বৃন্‌হ ধাতুর অর্থ=অতি বৃহৎ= অতি বিস্তৃত—বিভু।

যাহা দ্বারা বস্তুর পরিচয় বা জ্ঞান হয়, তাহাই সেই বস্তুর লক্ষণ। দুইটী লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মকে জানার চেষ্টা করা হয়।

ব্রহ্মের সেই দুইটী লক্ষণ কি ?—(১) স্বরূপ লক্ষণ, (২) তটস্থ লক্ষণ।

ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ কি ?—সত্য, জ্ঞান এবং আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ এবং অনন্তও ব্রহ্মের স্বরূপ। ব্রহ্ম সত্য স্বরূপ, ব্রহ্ম জ্ঞান স্বরূপ, ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ এবং ব্রহ্ম অনন্ত স্বরূপ।

ব্রহ্ম সত্যময়। তিনি সকল কালে সকল অবস্থায় সত্য। সকল সময় সকল অবস্থাতে একভাবে বর্ত্তমান আছেন। (ব্রহ্মে মিথ্যার লেশমাত্র নাই)।

ব্রহ্ম—চিন্ময়,—জ্ঞান স্বরূপ, ব্রহ্মের জড়ত্ব নাই। ব্রহ্ম সকল বস্তুর প্রকাশক। ব্রহ্মের প্রকাশক অন্য কেহই নাই। ব্রহ্ম জ্ঞাতা—তিনি ভিন্ন অপর কেহ জ্ঞাতা নাই। তিনি স্ব-প্রকাশ। তিনি বিষয়ী—তিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহেন। ব্রহ্ম স্বয়ং অনুভূতি স্বরূপ।

ব্রহ্ম—আনন্দ স্বরূপ বা সুখ স্বরূপ। ব্রহ্ম আনন্দময় বা সুখময়। ব্রহ্ম-রসময় সকল সৌন্দর্য্যের আধার, সর্ব্ব সুন্দর।

ব্রহ্ম অনন্ত স্বরূপ। তিনি দেশ কাল বা বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ হন না। তিনি বিভু—তিনি সর্ব্বব্যাপী ;—তিনি মহৎ। তাহার মহত্ত্ব কিছুতেই সঙ্কুচিত হয় না। ব্রহ্মের উৎপত্তি বিনাশ নাই। তিনি নিত্য—সনাতন। সর্ব্বদাই এক—অদ্বিতীয়।

ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ এই ;—

"জন্মাদ্যস্য যতঃ" ব্রহ্মসূত্র।

যাহা হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। যিনি জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় কর্ত্তা।—তিনিই ব্রহ্ম।

বেদান্তসারে ব্রহ্ম চতুর্ব্বিধ বলিয়া উল্লেখ আছে। (১) বিরাট্। (২) হিরণ্যগর্ভ। (৩) ঈশ্বর। (৪) তুরীয়। কি কি লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মকে বুঝিতে পারা যায়?—ব্রহ্মের সেই লক্ষণ এই;—

যাহা লাভ করিলে অপর কোন লাভই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয় না, সমস্তই লাভ হয়। অর্থাৎ যাহা সমস্ত এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভ তাহাই ব্রহ্ম।

যে সুখ অপেক্ষা অন্য কোন সুখই শ্রেষ্ঠ নহে, যাহা সমস্ত এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ তাহাই ব্রহ্ম।

যে জ্ঞানাপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ জ্ঞান নাই যাহা সমস্ত এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান তাহাই ব্রহ্ম।

যাহা দেখিলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত দৃশ্যই দেখা হয়, সেই সমস্ত এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৃশ্যই ব্রহ্ম।

যাহা হইতে পারিলে পুনরুদ্ভব বা জন্ম হয় না উহাই ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি। সেই অবস্থাই ব্রহ্ম। *

ব্রহ্মের শ্রুত্যুক্ত লক্ষণ এই;—

"সত্যম্ আনন্দম্ অদ্বয়ম্ অমৃতম্ একরূপং বাঙ্‌মনোঽগোচরং সর্ব্বগং সর্ব্বাতীতং চিদেকরসং দেশকালানবচ্ছিন্নং অপাদমপি শীঘ্রগং অপাণি চ সর্ব্বগ্রহণং অচক্ষুরপি সর্ব্বদ্রষ্টৃ অশ্রুতমপি সর্ব্বশ্রোতৃ অচিন্ত্যমপি সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বশক্তি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তৃ কিমপিবস্তু বেদা বদন্তি।"

ব্রহ্ম—সত্য, আনন্দ, অদ্বয়, অমৃত; একরূপ, বাক্য মনের অগোচর, সর্ব্বগামী, সর্ব্বাতীত, চিদেকরস, অর্থাৎ চিন্মাত্র। দেশ-কাল দ্বারা ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন (পৃথক্) করা যায় না। যাহার পা নাই, অথচ শীঘ্র যাইতে পারেন,

* যল্লাভান্নাপরোলাভো যৎসুখান্না পরং সুখং।
যজ্জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং তৎ ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ॥
যদ্দৃষ্ট্বান্নাপরং দৃশ্যং যদ্ভূত্বা ন পুনর্ভবঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নাপরং জ্ঞেয়ং তৎ ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ॥

হাত না থাকিলেও সকলগ্রহণ করিতে পারেন। চক্ষুঃ না থাকিলেও সকল দেখিতে পারেন। কর্ণ না থাকিলেও সকল শুনিতে পারেন। যিনি আমাদে অচিন্ত্য হইলেও সর্ব্বজ্ঞ, যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বশক্তিমান্, এবং সকলের সৃষ্টি স্থিতি, ও লয়কর্ত্তা এইরূপ কোন পদার্থ বা পুরুষকে বেদ ব্রহ্ম বলিয়াছেন। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্মই পরমাত্মা—সগুণ-নির্গুণ ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ পুরুষোত্তম—এই জগতের মূলকারণ, সর্ব্বকারণেরও কারণ।

প্রত্যেকের গুরুদত্ত যে ইষ্ট মন্ত্র—সেই মন্ত্রময় দেবতাকে ব্রহ্মরূপে উপাসন করিবে ইহাই শ্রুত্যর্থ।

জগতের প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্ব প্রকাশমানতা এবং প্রিয়তা রূপ ও নাম এই পাঁচটী অংশ উপলব্ধি হয়। তন্মধ্যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ অপ দুইটী অর্থাৎ নাম এবং রূপ জগতের স্বরূপ। *

ব্রহ্ম বলিতে মূল প্রকৃতিকেও বুঝায়। মূল-প্রকৃতি পরব্রহ্মেরই যোনি। অর্থা গর্ব্ভাধান স্থান ;—

"মমযোনি মহৎ ব্রহ্ম।"

গীতা ১৪—৩।

শক্তি ও শক্তিমান্ পৃথক্ নহে। উভয়ই অনাদি। প্রকৃতি ব্রহ্মেরই শক্তি প্রকৃতি-গর্ব্ভধারিণী—সৃষ্টজগতের জননী। পুরুষ বীজ-প্রদ পিতা।

তত্ত্ব-জ্ঞানী ভক্তপ্রবর তুলসীদাস গাহিয়াছেন ;—

"নির্গুণ হ্যায় সো পিতাহামারি,
সগুণ হ্যায় মাতারী।
কাকো বন্দ্য কাকো নিন্দ
দোনো পাল্লা ভারী॥

* "অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশ পঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততোদ্বয়ম্"॥ পঞ্চদশী

কুম্ভকার মৃত্তিকা দ্বারা ঘট প্রস্তুত করে। কুম্ভকার সৃষ্টঘটের কর্ত্তা নিমিত্ত কারণ; মৃত্তিকা সৃষ্টঘটের উপাদান কারণ। সেইরূপ পরব্রহ্ম—পরমাত্মা সৃষ্ট জগতের নিমিত্ত কারণ বা কর্ত্তা, এবং পরব্রহ্মই সৃষ্টজগতের প্রত্যেক বস্তুর উপাদান কারণ রূপেও বর্ত্তমান। যেহেতু পরব্রহ্মের অপরা এবং পরা প্রকৃতি লইয়াই জগৎ। শ্রীশ্রীভগবদ্গীতার ইহাই উপদেশ। ত্রিজগৎ ব্রহ্মময়।

"কি দিয়ে পূজিগো ব্রহ্মময়ি।
আমি দেখিনা ব্রহ্মাণ্ডে কিছু আছে যে মা তোমা বই।
ব্রহ্মা আদি পরমাণু, সকলি মা তোমার তনু,
তুমি বিনা অন্য বস্তু ব্রহ্মাণ্ডে মা আছে কৈ?
আশা ছিল হৃদিপুরে, মানসিক উপচারে,
পূজিব তোমারে ভবদারা;
আবার মনে মনে দেখি ভেবে, সে সকলও তুমি শিবে,
কিছুইত নহে তোমা ছাড়া।
অহঙ্কারে, বলি আমি, আমিতো নাই তুমিই আমি,
বৃথা কবি আমি আমি, আমিতো নাই তোমা বই।"

মনঃশুদ্ধি।

নামরূপে ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই অভিব্যক্ত হন। সেইজন্য শব্দ—ব্রহ্ম; নাম—ব্রহ্ম এবং মন্ত্র—ব্রহ্ম।

"বীজেতে আছেত গাছ, চক্ষে দেয়কি দেখা?
মন্ত্র-বীজে তেম্নি দেব অজ্ঞানেতে ঢাকা।"

মনঃশুদ্ধি—টীপ্পনি।

জগতের প্রত্যেক বস্তুই ব্রহ্ম। শ্রীশ্রীভগবদ্গীতায় ইহার উপদেশ আছে।

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতং।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা॥"

ঘৃত-ব্রহ্ম, অগ্নি-ব্রহ্ম, হোমকর্ত্তাও ব্রহ্ম, সুতরাং আহুতিও ব্রহ্ম। এইরূপ ব্রহ্ম যজ্ঞেরও (অর্থাৎ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই ভেদমুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানের) ব্রহ্ম প্রাপ্তিই ফল।

বেদ—ব্রহ্ম ; ব্রহ্মই বেদের প্রতিপাদ্য। ব্রহ্ম নিরূপণই বেদের তাৎপর্য্য। সুতরাং বেদই ব্রহ্মলাভের একমাত্র সাধন বলিয়া বেদই ব্রহ্ম।

তপঃ—ব্রহ্ম ; তপস্যা না করিলে ব্রহ্মলাভ করা যায় না। সুতরাং ব্রহ্মলাভের প্রধান সাধন তপস্যা বলিয়া তপঃ ব্রহ্ম।

তত্ত্বম্—ব্রহ্ম। তত্ত্ব জিনিসটা কি ? বস্তুব স্বরূপই তত্ত্ব; জনশ্রুতিতে কোন বিষয় শুনিলে তাহার সত্যতা সম্বন্ধে মনে সংশয় হইলে তাহাব তত্ত্ব বা যাথার্থ্য জানিবার জন্য আমরা নিজে যাইয়া বা লোক পাঠাইয়া তত্ত্ব জানিয়া—অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপ জানিয়া—লই। বস্তুর স্বরূপই তত্ত্ব। ব্রহ্ম ছাড়া কোন বস্তুই নাই। সুতরাং তত্ত্ব ব্রহ্ম।

ওঁ, তৎ, সৎ, এই তিনই ব্রহ্মের নিদর্শন।

"ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃস্মৃতঃ।

গীতা—১৭—২৩

ওঁ তৎসৎ এই তিনটি শব্দ ব্রহ্ম নির্দ্দেশক রূপে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

"ওঁ"কার ব্রহ্মের বাচক। "তৎ" শব্দ ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করে। ব্রহ্মই "সৎ"। এই পবম তত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব ব্রহ্ম পরমাত্মা এবং ভগবান্ এই তিন ভাবে জীবেব অনুভবের সাধ্য হন—জীবের বুদ্ধি বৃত্তিতে প্রকাশমান হন।

(১) তিনি—সেই পরমতত্ত্ব ব্রহ্মরূপে জ্ঞেয়—জানিবাব বস্তু ; তিনি—বিদ্যাতত্ত্ব-সাংখ্যজ্ঞানে জ্ঞেয়।

(২) সেই পরমতত্ত্ব—অন্তর্য্যামী পরমাত্মা রূপে যোগীর ধ্যেয় ; তিনি আত্ম-তত্ত্ব। যম নিয়ম, প্রাণায়ামাদি দ্বারা ধ্যেয়।

(৩) সেই পবমতত্ত্ব—সকল মঙ্গলের আলয়। ভগবান্ রূপে অনন্যভক্তি দ্বারা লভ্য। তিনি সকল মঙ্গলেব আলয় শিবতত্ত্ব।

(ক) সেই পরমতত্ত্ব মুক্তিক্ষেত্র৺কাশীধামে কাশী স্বামী শিবশঙ্কর—বিশ্বেশ্বর। যিনি অন্তকালে কাশীস্থ সর্ব্বপ্রকার জীবকে তারকব্রহ্ম মন্ত্র দান করিয়া সংসার বন্ধন মুক্ত করিয়া দেন। তিনি নীলাচলে পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীজগন্নাথ। তিনি কামরূপ নীল পর্ব্বতে শ্রীশ্রীকামাখ্যা দেবী।

(খ) সেই পরমতত্ত্ব ভক্তদিগের পরমারাধ্য নবদূর্ব্বাদল শ্যাম তারকব্রহ্ম ভগবান্—শ্রীশ্রীরামচন্দ্র। সেই পরমতত্ত্বই পতিতপাবন ভবপারের কর্ণধার দীনদুঃখহারী শ্রীশ্রীহরি। সেই পরমতত্ত্ব ভক্তদিগের জীবনসর্ব্বস্ব সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় মাধুর্য্যের পূর্ণরসময় মূর্ত্তি নবজলধর শ্যামসুন্দর নটবর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ; যিনি সকল জীবকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন।

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

শ্রুতিতে ব্রহ্মের দুইরূপেই স্তুতি আছে।

(ক) ব্রহ্ম = নির্গুণ, নিরাকার, নিষ্ক্রিয়-নিরঞ্জন ইত্যাদি।

(খ) ব্রহ্ম = সগুণ, সাকার, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বরূপ, সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী, সর্ব্বসুন্দর, সর্ব্বরসময় এবং ইচ্ছাময় ইত্যাদি।

পুং স্ত্রী এবং নপুংসক এই তিন লিঙ্গেই ব্রহ্ম শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন ;—

"নৈবস্ত্রী ন পুমানেষ নচৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্ যচ্ছরীর মাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে॥"

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

ব্রহ্ম স্ত্রী নন্, পুমান্ নন্ নপুংসকও নন্, তিনি যখন যে শরীর গ্রহণ করেন সেই সেই শরীরের লিঙ্গেই যুক্ত হন।

ব্রহ্মোপাসনা করা সকল মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের অন্য নাম হিন্দুস্থান। ভারতের নানাস্থানে নানাতীর্থে পরম ব্রহ্ম স্ত্রী পুং নানারূপে প্রকট

হইয়া অধিকারী অনুসারে সকল শ্রেণীর লোকের ব্রহ্মোপাসনার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। যে কোন লোক শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত সেই সেই দেবতা যে কোন দেবতাকে ব্রহ্ম ভাবে উপাসনা করিলে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে পারে তৎপর তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়।

ব্রহ্মচর্য্য।

ব্রহ্মশব্দার্থ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখন ব্রহ্মচর্য্য বলিতে কি বুঝায় আলোচনা করিতে হইবে।

ব্রহ্মচর্য্য।—

(১) ব্রহ্মণি চর্য্যং ব্রহ্মে চরণশীলতা, ব্রহ্মে বিচরণ করার নিষ্ঠা।

ব্রহ্মে চরণশীল হওয়ার অর্থ এই ঃ—ব্রহ্ম চিন্তা, ব্রহ্ম ধ্যান এবং ব্রহ্ম ভাবনা করা ও তৎপর হওয়া। ব্রহ্মানুশীলন ভিন্ন মনকে অন্যদিকে—বাহিরের বিষয়ে—চলাফিরা করিতে না দেওয়া। কর্ত্তব্য সকল কাজে, সকল অবস্থায় ব্রহ্ম ভাবনা করিতে করিতে, ব্রহ্মে ভালবাসা জন্মে, ব্রহ্মে রতি ও প্রীতি জন্মে। ইহাই ব্রহ্মচর্য্য।

(২) ব্রহ্মণি—বেদার্থে চর্য্যং—আচরণীয়ং। বেদের অর্থের অনুশাসনে চলা। বেদ হইতে আমরা ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে পারি। সুতরাং বেদাধ্যয়ন এবং বেদমূলক শ্রুতি স্মৃতি বিহিত ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করা এবং বেদোক্ত সকল আশ্রমে থাকিয়া বেদের অনুশাসনে চলাই-ব্রহ্মচর্য্য

বেদ অ-পৌরুষেয়, স্মৃতি প্রভৃতি সমস্তই বেদ হইতে প্রাপ্ত। পুরাণ ও তন্ত্র বেদমূলক। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র সমস্তেই ব্রহ্মচর্য্যের প্রশংসা বর্ণিত আছে। ব্রহ্মই বেদের প্রতিপাদ্য বস্তু। পরম পুরুষ—পরম ব্রহ্ম শ্রীহরির মহিমাই বেদে, পুরাণে এবং তন্ত্রে আদিতে মধ্যে এবং অন্তে গীত হইয়া থাকে।

"বেদে রামায়ণে পুণ্যে পুরাণে ভারতে তথা
আদাবন্তেচ মধ্যেচ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।"

(৩) ব্রহ্মচারীর ভাব=ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচারীর মতি গতি এবং রতি ব্রহ্মেই হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারীর স্বভাব—ব্রহ্মচর্য্য।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" সকল বস্তুই ব্রহ্ম। জগৎ ব্রহ্মময়। এই জ্ঞান লাভ করাই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ। এই জ্ঞানে পৌছিতে পারিলে, মনুষ্যের জন্ম সার্থক হইয়া যায়। ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন এই জ্ঞান লাভ হইতে পারে না।

ব্রহ্মচর্য্য পরিপক্কাবস্থায় দাঁড়াইলে, ভেদবুদ্ধি চলিয়া যায়। তখন সকল বস্তুতেই পরম ব্রহ্মের অভিব্যক্তি অনুভূত হয়। ব্রহ্মচারী এই অবস্থায় আত্মতৃপ্ত হইয়া নির্ভয়ে বিচরণ করেন। তাঁহার অন্তঃকরণে কোন বিষয়ের অভাব বোধ হয় না। ব্রহ্মচারী বিগতজ্বর বিগতশোক হইয়া থাকেন।

ব্রহ্ম এক—অদ্বিতীয়। তিনি স্বকল্পনায় বহু হইয়া প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। তিনি দেহে প্রাণরূপে ইন্দ্রিয় এবং মনোরূপে, জঠরে অগ্নিরূপে বহুভাবে আছেন। তিনি জলে রসরূপে, পবনে বায়ুরূপে, পৃথিবীতে মৃত্তিকারূপে প্রত্যেক বস্তুর অধিপতি দেবতা বিষ্ণুরূপী ব্রহ্ম। এইরূপ ভাবনা করা ব্রহ্মচর্য্য।

ব্রহ্মভাব বুঝাইবার জন্য ঋষিগণ, স্মৃতি শাস্ত্রে এইরূপ বিধি করিয়াছেন :—যাহা দ্বারা ব্রহ্মের বা ভগবানের পূজা করিবে, যাহা ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণকে দান করিবে, যাহা পানাহার করিবে, তৎ সমস্তই সুপ্রোক্ষিত করিয়া সেই সেই বস্তুর অধিপতি দেবতা বিষ্ণুকে অর্চনা করতঃ তৎপর সেই বস্তু দ্বারা পূজা করিবে, সেই বস্তু দান করিবে, এবং সেই বস্তু পানাহার করিবে। ব্রহ্মভূত কোন বস্তুই উক্ত প্রকারে অর্চ্চনা না করিয়া নিজ প্রয়োজনে ভোগ ব্যবহার করিবে না। ইহাই ব্রহ্মানুশীলন বা ব্রহ্মচর্য্য। এইরূপে ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া, ঈশ্বর প্রীত্যর্থে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপ কর্ম্ম কর্ম্মযোগে পরিণত হয়।

ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে সাংখ্যজ্ঞানে স্থিত হইলে, গুণাতীত অবস্থায় পৌঁছিতে পারা যায়। ব্রহ্মচারী পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারেন।

পূজনীয় আরাধ্য দেবতাকে ব্রহ্মভাবে ভাবনা করিয়া সেই আরাধ্য ঈশ্বরে বা ব্রহ্মে প্রীতি লাভের জন্য তাঁহার পূজা, তাঁহার নাম জপ এবং তাহাকে লাভ করার জন্য অনুবিধ তপস্যা করিয়া ঈশ্বরে বা ব্রহ্মে অনুরক্ত হওয়াই ভক্তিযোগ। ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালনে ভগবদ্ ভক্তি লাভ হয়।

চরধাতু গত্যর্থে বা জ্ঞানার্থে প্রয়োগ হয়।

চরধাতুর প্রয়োগযুক্ত সাধারণ কতকগুলি শব্দ আছে যথা :—

জলচর, স্থলচর, ভূচর, খেচর, বনচর, উভচর ইত্যাদি।

মনুষ্য গো, মহিষ প্রভৃতি ভূচর বা স্থলচর। পক্ষী, দেবতা এবং প্রেতযোনি জীব, ইহারা খেচর। সিংহ ব্যাঘ্রাদি বন্যপশু, বনচর। কচ্ছপ, কুম্ভীর প্রভৃতি উভচর কিন্তু ইহারা খেচর নহে। মৎস্য জলচর। মৎস্যের জন্ম হইতে স্বভাবতঃ জলে গতি, স্থিতি রতি বা প্রীতি বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। মৎস্য স্থলে থাকিতে পারে না। কেহ উহাকে স্থলে আনিলে মরিয়া যায়। জলই মৎস্যের আশ্রয়। সেইজন্য মৎস্য জলচর।

মনুষ্যের জন্ম হইতেই স্বভাবতঃ স্থলে বা ভূমিতে গতি, স্থিতি এবং প্রীতি। মনুষ্য স্বভাবতঃ জলে বাস করিতে পারে না। জলে অনেকক্ষণ থাকিতে বাধ্য হইলে মরিয়া যায়। স্থল বা ভূমি মনুষ্যের আশ্রয়। সেইজন্য মনুষ্য স্থলচর। সেইরূপ যাহারা ব্রহ্মচারী, তাহাদের ব্রহ্মে গতি, স্থিতি এবং রতি হইয়া থাকে।

মৎস্য জন্ম মাত্রই স্বভাবতঃ জলে গমন করিবার, থাকিবার ও স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করিয়া আনন্দ লাভ করিবার অধিকার পায়। মনুষ্য ও জন্ম মাত্রই স্বভাবতঃ স্থলে গমন করিবার, থাকিবার ও স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করিবার অধিকার পায়। কিন্তু মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর প্রাণী জন্মমাত্র স্বভাবতঃ ব্রহ্মে গমন করিতে, অবস্থান করিতে বা থাকিতে এবং ব্রহ্মে রমণ করিতে সমর্থ হয় না। অর্থাৎ মনুষ্য জন্মমাত্রই স্বভাবতঃ ব্রহ্মচারী হইতে পারে না। ব্রহ্মচারী হওয়া মনুষ্যের সহজাত ধর্ম্ম নহে। তাহার প্রধান কারণ এই :—মনুষ্য জন্ম মাত্রই বাহ্য বস্তুর সম্মুখীন হইয়া উহার আকর্ষণে, বাহ্য বিষয়ের সহিতই জড়িত হইয়া পড়ে। সেইজন্য ব্রহ্ম ভাবনা করিতে মনুষ্যের স্বাভাবিক শক্তি থাকিলেও সেই শক্তির অনুশীলনের অভাবে অন্তঃকরণে ব্রহ্মভাব সুপ্ত ও প্রচ্ছন্ন থাকে। চক্ষুঃ মেলিলেই বাহ্যরূপ দেখে, শব্দ হইলেই কাণে শুনে, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শানুভব করে, জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন করে, নাসিকা দ্বারা সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ অনুভব করে, এইরূপে জন্মের পর হইতেই পাঁচ ইন্দ্রিয়কে দ্বার করিয়া বাহ্য বিষয়েই চরণশীল

হইয়া পড়ে। অভ্যাস এবং বিষয় বৈরাগ্য দ্বারা মন অন্তর্মুখ না হইলে, ব্রহ্মে চরণশীল হইতে পারে না। ব্রহ্মে চরণশীল হইতে মনুষ্য স্বভাবতঃ অধিকার পায় না। উহা সাধনা সাপেক্ষ।

আহার, নিদ্রা, শিক্ষালাভ, কার্য্যতৎপরতা, এবং বিষয় বিশেষে রুচি, অল্পাধিক-রূপে এসমস্তই অভ্যাস সাপেক্ষ। অভ্যাস দ্বারা পুনঃ পুনঃ মনকে যে বিষয় চালিত করা যায় মন সেই বিষয়েই নিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে। ব্রহ্মচারী হইতে হইলে, ব্রহ্মচিন্তা ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্ম ভাবনা অভ্যাস করিতে হয়।

স্থূল শরীর স্থূলাহারে পবিপুষ্ট হয়। সূক্ষ্ম শরীর অন্তঃকরণ সূক্ষ্মাহারেই পরিপুষ্ট হয়। আহার্য্য বাহ্যবস্তু স্থূল শরীরেব পুষ্টি সাধন করে; ব্রহ্মচর্য্য সাধনা দ্বারাই আত্মার পুষ্টি ও উৎকর্ষ লাভ হয়।

মনুষ্য যথা নিয়মে যত্ন এবং অভ্যাস করিলে আকাশে জলে বা ব্রহ্মে গমন, অবস্থান ও রমণ করিতে সমর্থ হয়। ইহাই মনুষ্য শক্তির বিশেষত্ব। মনুষেতব প্রাণীকে ভগবান্ বিধাতা এই শক্তি দেন নাই। মনুষ্যেতর নিম্নস্তরের প্রাণী স্বভাব নিয়ত শক্তি অনুসারে জন্ম কাটায়, সাধনা কি অভ্যাস দ্বারা কোনরূপ বিশেষ শক্তিলাভ করিতে পারে না। মনুষ্যের ব্রহ্মচারী হইতে হইলে, দৃঢ়তার সহিত শাস্ত্রোপদিষ্ট প্রণালী অবলম্বনে যত্ন ও অভ্যাস করিতে হইবে। ব্রহ্মে বিচরণ করা মনুষ্যের সহজাত ধর্ম্ম নহে। এই শক্তি অর্জ্জন করিতে হয়।

সাধনাবলে যোগ সিদ্ধ হইলে, মনুষ্য আকাশে, জলে বা ব্রহ্মে চরণশীল হইতে পারে। ব্রহ্মচারী হওয়া মনুষ্যের তপস্যার ফল। নর নারী মাত্রই তপস্যা দ্বাবা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে স্থিত হইতে পারেন।*

---

* মন্তব্যঃ—চরধাতুর দুই রূপে নিষ্পন্ন শব্দ আছে—

(২) জলচর, স্থলচর, খেচর। (২) বনচারী, ব্রতচারী, ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারী শব্দেরই ব্যবহার আছে। ব্রহ্মচর শব্দের ব্যবহার নাই। চর ধাতু ণিন্ চারী। ণিন্ প্রত্যয় সামর্থ্যে বা শীলতায় প্রয়োগ হইয়াছে। আমার মনে হয়, প্রকৃতি গত শক্তির দ্বারা যাহারা জলে স্থলে চরণ করিতে পারে তাহাদিগকে জলচর স্থলচর বলে। যাহারা অভ্যাস

দেহধারণই সংসার ; বিষয় প্রপঞ্চ লইয়াই সংসার। সংসারের বিষয়ের সহিত জীবের জন্মাবধি মাখামাখি স্বাভাবিক। জীবের অন্তঃকরণের ব্রহ্মভাব মোহ মলিনতায় সমাচ্ছন্ন হইয়া ক্ষীণ ও সুপ্তাবস্থায় থাকে। সংযম নিয়ম প্রভৃতি শাস্ত্রীয় উপায়ে চিত্তশুদ্ধি সংসাধিত হইলে, ব্রহ্মভাব সতেজ হইয়া জাগিয়া উঠে। জীব তখন নির্ম্মল অন্তঃকরণে ব্রহ্মে চরণশীল হইতে শক্তি লাভ করে। জীব এই অবস্থায় বিষয়ভোগ করিয়াও বিষয়ে চরণশীল না হইয়া ব্রহ্মানুশীলন ও ব্রহ্মভাবনা করিতে সমর্থ হয়।

হিন্দুশাস্ত্রের চারিটী আশ্রম বেদ-বিহিত। ব্রহ্মচর্য্যই প্রথমাশ্রম। এই আশ্রমে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করাই মুখ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বাল্যকাল হইতে যে ভাবে শিক্ষালাভ করা যায়, জীবনের গতি উত্তরোত্তর সেই দিকেই চালিত হয়। যে শিক্ষায় ব্রহ্মচিন্তা, ব্রহ্ম ধ্যান এবং ব্রহ্মে মতি, রতি সমুৎপন্ন হয়, ব্রহ্মে প্রীতির জন্য প্রত্যেক কার্য্যের অনুষ্ঠান করার প্রবৃত্তি জন্মে, ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে সেই প্রণালীর শিক্ষা দেওয়াই শাস্ত্রোক্ত বিধান ছিল। প্রাচীন কালে, গুরুগৃহে, প্রত্যেক বালক বিদ্যার্থী এই ভাবে সদ্‌গুরু কর্ত্তৃক শিক্ষা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইত। বাল্যকালই শিক্ষার সময়। বাল্যকালে মন পবিত্র এবং কপটতা শূন্য থাকে। সরল নির্ম্মল মনে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, উহাই মনে গাঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া ভাবী জীবনের গতি পবিত্র পথে চালিত করে। গুরু কর্ত্তৃক ব্রহ্ম বিদ্যায় শিক্ষালাভ করিয়া সদ্‌গুরুর কৃপালাভ করতঃ দ্বিতীয় আশ্রম—গৃহস্থাশ্রমের উপযোগী প্রত্যেক কার্য্যে দক্ষতা লাভ করে। ব্রহ্মচারী গৃহে ফিরিয়া আসিয়া শাস্ত্রবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হইতেন এবং ব্রহ্মচর্য্যে স্থিত থাকিয়া গৃহস্থাশ্রমের যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিতেন। প্রত্যেকের মন প্রফুল্ল ও তৃপ্ত থাকিত।

বা সাধনা দ্বারা বনে, ব্রতে বা ব্রহ্মে চরণ করিতে ক্ষমবান্ হয় বা অভ্যাস লাভ করে, তাহাদিগকে বনচারী ব্রতচারী এবং ব্রহ্মচারী বলিয়া থাকে। জনক সনকাদি মহর্ষি এবং শুকদেব বামদেব ইঁহারা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্মচর বলিতে বাধা কি ?

গৃহস্থাশ্রমীরাই অন্য তিন আশ্রমীদিগের সহায়তা করিতেন। ব্রহ্মচর্য্যের অবলম্বনে ব্রাহ্মণগণ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন। ব্রহ্মচর্য্যের অবলম্বনে ক্ষত্রিয় রাজা রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতেন। ব্রহ্মচর্য্যের অবলম্বনে বৈশ্যগণ কৃষি ও বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা অর্থাগম করিতেন। ব্রহ্মচর্য্যের অবলম্বনে শূদ্রগণ উপরোক্ত তিন শ্রেণীর সেবা অর্থাৎ চাকরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। হিন্দু শাস্ত্রের এই আদর্শ এখন সমাজে লোপ পাইতে চলিয়াছে বলিয়া সমাজ-বিপ্লব উপস্থিত। হিন্দুত্বের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়িতেছে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রভাব লোপ পাইয়াছে বলিয়াই হিন্দুর অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নরনারী মাত্রেরই ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিত থাকা উচিত। কাল-প্রভাবে পুরুষদিগের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাব কমিয়া গেলেও নারীদিগের মধ্যে এখনও ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। সধবা পুরস্ত্রীগণের স্বামীসেবাই প্রধান ব্রহ্মচর্য্য। বিধবা পুরস্ত্রীদিগের ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে এখনও হিন্দুর ঘরে ঘরে শাস্ত্রোক্ত অনেক সদাচার প্রচলিত আছে।

ব্রহ্মচর্য্য, বিষয় চিন্তা, বিষয় ধ্যান এবং বিষয় ভোগ সংযমিত ও নিয়মিত করে। ব্রহ্মচর্য্যে স্থিত হইতে হইলে সংযম এবং নিয়মের মধ্য দিয়া বিষয় ভোগ করিতে হয়।

গৃহস্থাশ্রম সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। গৃহস্থাশ্রমে নানা প্রলোভনের মধ্যে সংযত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা বড়ই কঠিন। বিষয় ভোগের মধ্য দিয়া গৃহস্থাশ্রমীদিগকে বিষয় বৈরাগ্যের পথ ধরিতে হয়। শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিতে শিথিল প্রযত্ন হইলে, প্রতি পলেই ব্রহ্মচর্য্য ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ব্রহ্মচর্য্যই বিষয়ভোগ লিপ্সা সংযত করিয়া বিষয় আসক্তির প্রবল বন্যা প্রতিরোধ করে। ব্রহ্মচর্য্যই প্রবল বিষয় বাসনাকে দমিত করিয়া শাস্ত্রবিহিত ভোগে মনের গতি চালিত করে।

ব্রহ্মচর্য্যের শক্তি ও ফল।

ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা নরনারী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচর্য্যহীন মনুষ্য পশুত্বে পরিণত হয়। সধবা পুরস্ত্রীগণ ব্রহ্মচর্য্য পালন না করিলে ধর্ম্ম-ভ্রষ্টা ও নিন্দনীয়া হন। ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারণ করা ভিন্ন বিধবার গত্যন্তর নাই। ব্রহ্মচর্য্য-হীনা বিধবা সমাজে ঘৃণিতা এবং পতিতা হইয়া থাকেন। ব্রহ্মচর্য্যই বিধবার প্রধান ধর্ম্ম। যে ব্রহ্মচর্য্য মনুষ্যজাতির এতদূর প্রয়োজনীয় যে ব্রহ্মচর্য্যের প্রশংসা শাস্ত্রে নানা প্রকারে আছে, সেই ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা কি শক্তি লাভ হয়? ব্রহ্মচর্য্য পালনের ফলই বা কি?

আত্মোন্নতি লাভ করাই মনুষ্য মাত্রের প্রধান কর্ম্ম ও ধর্ম্ম। ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন আত্মোন্নতি লাভ হয় না। ব্রহ্মচর্য্য মনুষ্যের বলক্ষয় বারণ করে। ব্রহ্মচর্য্যেই বীর্য্য ধৃত হইয়া শক্তি বৃদ্ধি হয়। ব্রহ্মচর্য্য মনুষ্যের সদ্বৃত্তি সমূহের অনুশীলনের সহায়তা করিয়া, সেই সদ্বৃত্তি গুলিকে পরিপুষ্ট করিয়া উঠায় এবং মনের স্বাভাবিক অসদ্বৃত্তিগুলিকে দুর্ব্বলকরতঃ অভিভূত করিয়া রাখে। ব্রহ্মচর্য্য মনুষ্যের ধৃতি, বুদ্ধি এবং মেধা পরিপুষ্ট করে। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই মনুষ্য বিদ্যালাভ করিতে সমর্থ হয়। ব্রহ্মচর্য্য আত্মোন্নতি লাভের প্রধান ও প্রথম সোপান। সেইজন্য হিন্দু শাস্ত্রোক্ত আশ্রম ধর্ম্মের প্রথম আশ্রমই ব্রহ্মচর্য্য। বিদ্যার্থী বালকগণ এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়াই ব্রহ্মবিদ্যায় দীক্ষিত হয়। তথায় তাহারা ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে গুরূপদিষ্ট প্রণালীতে বিদ্যাভ্যাস করিলে, তাহাদের চিত্তশুদ্ধি এবং চরিত্র গঠিত হয়।

ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াই যোগাভ্যাস করিতে হয়। যোগসিদ্ধ হইলে ব্রহ্মবিদ্যা—ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। মনুষ্য যোগসিদ্ধ হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতঃ যথাভিলষিত শক্তি এবং ষড়ৈশ্বর্য্য লাভ করিতে সমর্থ হয়। সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং মন ব্রহ্মচারীর বশীভূত হইয়া পড়ে। ব্রহ্মচর্য্যের ইহাই অদ্ভুত শক্তি।

যে মনুষ্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া ইচ্ছানুরূপ কাম্য ফল প্রাপ্ত হন। ধন কামনা করিলে ধন লাভ হয়, বিদ্যা কামনা করিলে বিদ্যা লাভ হয়, রাজ্য কামনা করিলে রাজ্য লাভ হয়, স্বর্গ কামনা করিলে স্বর্গ লাভ হয়, এই সমস্ত ফল লাভের প্রধান সাধন ব্রহ্মচর্য্য।

যে মনুষ্য ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ধারণ করিয়া অনাসক্ত ভাবে সঙ্গ রহিত হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান করেন তিনি সেই সাধনার বলে পরমেশ্বরে ভক্তি, তৎপর পরজ্ঞান লাভ করিয়া মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ ব্রহ্মপদ লাভ করেন—যাহা লাভ করিলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভ করা হয় ও অন্য সমস্ত লাভই তখন অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার সংসার বন্ধন কাটিয়া যায়। এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনার মূলেও ব্রহ্মচর্য্য।

ব্রহ্মচারী যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল লাভ করেন এবং তাঁহার আসন যে বহু উচ্চ স্থানে, তিনি যে শক্তিশালী, জিতেন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবান্ এবং পরমেশ্বরের প্রতি পরম ভক্তিমান্ হন, তদুল্লেখে শাস্ত্রে ও পুরাণে তাঁহার বহু প্রশংসা আছে।

অনন্তদেবের অবতার নারায়ণের অংশ রামানুজ বীরবর লক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী ছিলেন; তিনি সংযমী এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া অগ্রজের সহিত চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসে ছিলেন। ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বনে তিনি এতদূর শক্তিশালী হইয়াছিলেন যে এই চতুর্দ্দশ বৎসর তিনি কোন স্ত্রীলোকের মুখ দেখেন নাই, আহার করেন নাই, নিদ্রা যান নাই। ব্রহ্মচারী হইলে কতদূর সংযমী হওয়া যায় বীরবর লক্ষ্মণ তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। শ্রীমান্ লক্ষ্মণদেব নর-নারায়ণ শ্রীরামচন্দ্রের পরম ভক্ত ছিলেন এবং তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন।

দেবাদিদেব জ্ঞানগুরু শঙ্কর আদর্শ ব্রহ্মচারী, আদর্শ সংযমী, আদর্শ জিতেন্দ্রিয় এবং আদর্শ বিষ্ণুভক্ত। সতী দক্ষালয়ে দেহ ত্যাগ করিলে মহাদেব বিপত্নীক হইয়া বহুদিন যোগাসনে ধ্যান মগ্ন ছিলেন। এদিকে তারকাসুর প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া দেবগণকে পরাজয় করতঃ স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। মহাদেব শঙ্করের পুত্র কার্ত্তিকেয় ভিন্ন তারকাসুর বধ হইবে না। মহাদেবের পুনরায়

বিবাহ না হইলে কার্ত্তিকেয়ের জন্ম সম্ভব হয় না। হিমালয় দুহিতা পার্ব্বতী হরকে পতিলাভ করিবার সঙ্কল্প করিয়া তপস্যা করিতে ছিলেন। দেবগণ এই সুযোগে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া তাঁহার সহিত পার্ব্বতীর বিবাহের সঙ্কল্প করিলেন। দেবাদিদেব হর ধ্যানমগ্ন; দেবগণ ব্রহ্মচারী সদা শিবের ধ্যান ভঙ্গ জন্য কামদেবকে নিয়োগ করিলেন, রতি সহ কামদেব তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিলেন। অকালে বসন্তের উদয় হইল, বনের বৃক্ষলতা পুষ্পিত হইল, এবং বনের পশুপক্ষী প্রভৃতিও মদনের প্রভাব অনুভব করিল; শক্তিশালী মদনের পুষ্প-বাণে যোগেশ্বর শিবের ধ্যান ভঙ্গ হইল, জিতেন্দ্রিয় হর চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, মদন তাঁহার সংযম ভঙ্গ করার জন্য সচেষ্ট; ব্রহ্মচারীর সাত্ত্বিক ক্রোধের উদয় হইল। তাঁহার নেত্র হইতে ক্রোধ বহ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। দেবগণ দেখিলেন মদন এই ক্রোধ-বহ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যায়। তখন দেবগণ কাতরস্বরে বলিলেন;—

"হে প্রভো! ক্রোধ সম্বরণ করুন, ক্রোধ সম্বরণ করুন।" দেবগণের এই বাক্য বায়ুভেদ করিয়া আকাশ-পথে চলিয়া শঙ্করের কর্ণ গোচর হইবার পূর্ব্বেই শঙ্করের নেত্রোদ্গীর্ণ ক্রোধবহ্নি মদনকে ভস্মাবশেষ করিয়া ফেলিল। *

ভগবান্ শঙ্করের যেই ক্রোধ হইল, অমনি তাঁহার নেত্র হইতে আগুন বাহির হইয়া নিমেষ মধ্যে মদনকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। দেবগণের কাতরোক্তি শঙ্করের কর্ণে প্রবেশের অবসর পাইল না। ভগবান্ শঙ্কর আদর্শ ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয়, স্বতন্ত্র এবং পরমেশ্বর। ইন্দ্রিয় জয়ে তাঁহার অসীম শক্তি ছিল। সমস্ত ইন্দ্রিয় তাঁহার বশীভূত ছিল। তিনি জ্ঞানগুরু এবং পরম বৈষ্ণব।

---

* "ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি।
যাবদ্ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি॥
তাবৎস বহ্নির্ভব নেত্র জন্মা
ভস্মাবশেষং মদন চকার॥"
—কুমারসম্ভব।

ভগবান্ দেবাদিদেব শঙ্কর যেরূপ আদর্শ ব্রহ্মচারী, আদ্যাশক্তি জগৎ প্রসবিনী জগন্মাতা ভগবতী দুর্গাদেবীও আদর্শ ব্রহ্মচারিণী। সমস্ত বিভূতি এবং ষড়ৈশ্বর্য্য ইঁহার করতলগত। ইনি বৈষ্ণবীশক্তি এবং বিষ্ণু ভক্তা।

ব্রহ্মচারিণী দুর্গাদেবীর দ্বিতীয় নাম। শ্রীশ্রীচণ্ডী মাহাত্মে দেবী কবচে যথা ;

হে মহামুনে! দেবীর পুণ্যময় কবচ শ্রবণ কর। দেবীর প্রথম নাম শৈলপুত্রী দ্বিতীয় নাম ব্রহ্মচারিণী।*

ত্রিলোচন বলিতে যেমন ভগবান্ শঙ্করকে বিশেষভাবে বুঝায়, পুরুষোত্তম বলিতে যেমন জনার্দ্দন হরিকে বিশেষভাবে বুঝায়, " ব্রহ্মচারিণী" বলিতে ভগবতী দুর্গাদেবীকেই বিশেষভাবে বুঝায়।

"ব্রহ্মচারিণী" বেদমাত্রগম্যা, চিচ্ছক্তিযুক্তা দুর্গা। ভগবদ্ভক্ত হওয়া ব্রহ্মচর্য্যের শেষ পরিণতি বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট চরম ফল।

ব্রহ্মচারী হওয়া যেমন পুরুষ মাত্রেরই "পরম শ্রেয়ঃ", সেইরূপ ব্রহ্মচারিণী হওয়া কি সধবা কি বিধবা সকলেরই পরম শ্রেয়ঃ। সৌভাগ্যবতী যে নারী সধবা কি বিধবা সম্যক্‌রূপে ব্রহ্মচর্য্য পালনে সমর্থা হইতে পারিবেন তিনি ব্রহ্মচারিণী হইয়া আদ্যাশক্তি দুর্গাদেবীর আসনে আসীনা হইতে পারিবেন এবং প্রকৃত মাতৃপদে অভিষিক্তা হইয়া ধন্যা ও পূজার্হা হইবেন। ব্রহ্মচর্য্যের ইহাই বাঞ্ছনীয় ফল।

ভগবদ্ ভক্ত হওয়া ব্রহ্মচর্য্যের শেষ পরিণতি বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল। সিদ্ধব্রহ্মচারী ভগবানের পরম ভক্ত হইয়া থাকেন। ভক্ত প্রবর দেবর্ষি নারদ গাহিয়াছেন ঃ—

আরাধিতো যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং ?
নারাধিতো যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং ?

---

* দেব্যাস্তু কবচং পুণ্যং তৎ শৃণুষ্ব মহামুনে।
প্রথমং শৈল পুত্রীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী ॥

অন্তর্ব্বহি র্যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং ?
নান্তর্ব্বহি র্যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং ?

হরি পূজিত হইলে তপস্যার প্রয়োজন থাকে না। হরি পূজিত না হইলে, তপস্যার ফল লাভ হয় না।

অন্তরে এবং বাহিরে যদি হরি প্রতিষ্ঠিত না হইলেন, তবে তপস্যার ফল কি ? অন্তরে এবং বাহিরে হরি প্রতিষ্ঠিত হইলে, তপস্যার আবশ্যকতা থাকে না।

ব্রহ্মানুশীলন করিতে যত্নবান্ হইলে, এবং ব্রহ্মচর্য্যে সিদ্ধি লাভ করিলে, নারদ ঋষির এই উক্তির সার্থকতা বুঝা যায়।

"অন্নং ব্রহ্ম" রসো বিষ্ণুঃ "ভোক্তা" দেবো জনার্দ্দনঃ "ভক্ষ্য বস্তু ব্রহ্ম" পানীয় জল ব্রহ্ম, অন্নজলের ভোক্তাও ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞান নির্ম্মল বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিভাত হয়।

ব্রহ্মচর্য্যের অচিন্তনীয় শক্তি, ব্রহ্মচর্য্যস্থিত মহাপুরুষ অচিন্তনীয় শক্তিশালী হইয়া থাকেন। জহ্নুমুনি ব্রহ্মচর্য্য বলেই, দ্রবময়ী খরস্রোতাঃ, বেগবতী গঙ্গা দেবীকে এক গণ্ডূষে পান করিয়া ছিলেন। তৎপর ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হইয়া নিজের জানু ভেদ করিয়া গঙ্গাকে বাহির করিয়া দিয়া ছিলেন। মহামুনি অগস্ত্য দেবদ্রোহী অতিথিঘাতী দুষ্ট রাক্ষস বাতাপিকে উদরস্থ করিয়া ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন। সরিৎপতি মহাসাগর তৎকর্ত্তৃক পীত হইয়াছিল।

মহর্ষি ভৃগু ব্রহ্মচর্য্যের বলেই নারায়ণের বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য্যের মাহাত্ম্য জগতে প্রচার জন্য স্বয়ং নারায়ণ, ভৃগুমুনির পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন। পুরাণাদিতে ব্রহ্মচর্য্যের বহু প্রশংসা বর্ণিত আছে।

ব্রহ্মচর্য্যের সাধন।

মনকে হৃদয়ে—অন্তঃকরণে নিরুদ্ধ করিতে না পারিলে, ব্রহ্মচিন্তা, ব্রহ্মধ্যান হইতে পারে না। ইন্দ্রিয় বশীভূত না হইলে মন নিরুদ্ধ হয় না। সংযমী না

হইলে, ইন্দ্রিয় বশীভূত হয় না। সংযম সাধনা সাপেক্ষ। **ইন্দ্রিয় সংযমই সকল সাধনার মূল।**

বিষয় ভোগ এবং ব্রহ্ম সংস্পর্শ-ভোগ এই দুইটী আলো অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিপরীত পদার্থ। আলো থাকিলে অন্ধকার থাকে না। আলো না থাকিলে, অন্ধকার রাজ্য বিস্তার করে। বিষয় ভোগে রত থাকিলে, ব্রহ্মসংস্পর্শ হইতে পারে না। ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিতে হইলে, বিষয়ভোগ ত্যাগ বা সংযমিত করিতে হয়। ভোগে—বন্ধন। ত্যাগে—ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা মুক্তি।

বিষয় ভোগ ত্যাগ সম্বন্ধে লেখা বা মুখে বলা যত সহজ, কার্য্যতঃ বিষয় ভোগ ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন।

বিষয় ভোগ ত্যাগ করা কঠিন কেন?

জন্ম হইতেই প্রাণিমাত্রই স্বভাবতঃ বিষয় ভোগে আসক্ত এবং জাগরিত। সেইজন্য ব্রহ্মচর্য্যের দিক্‌টা সকল প্রাণীর পক্ষেই অন্ধকার রাত্রি।

শ্রীশ্রীভগবান্ বলিয়াছেন:—সকল ভূতের বা প্রাণীর পক্ষে যাহা নিশা সংযমী বা ত্যাগী পুরুষ তাহাতে জাগরিত থাকেন। দৃষ্টিশালী মুনির পক্ষে যাহা নিশা ভূতসকল তাহাতে জাগরিত থাকে।*

জাগ্রৎ অবস্থায় লোকসকল, প্রবুদ্ধ থাকিয়া, বিষয়নিষ্ঠ হইয়া সমস্ত বিষয় দেখিতে ও শুনিতে পাইয়া বিষয়ই ভোগ করে। রাত্রিকালে নিদ্রা যায় বলিয়া বিষয় ভোগ করে না। অজ্ঞানী লোক বিষয়নিষ্ঠ হয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে পারে না। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী মুনিগণ, ব্রহ্মবিষয়ে প্রবুদ্ধ থাকেন। বাহ্য বিষয় ভোগ তাঁহাদের পক্ষে নিশা স্বরূপ।

জন্ম হইতেই, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পুনঃ পুনঃ বহির্বিষয়ের দিকে আমাদের মন আকৃষ্ট হওয়াতে অভ্যাস বশতঃ আমরা দৃঢ়রূপে বিষয়নিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছি। জন্ম

---

* যা নিশা সর্ব্ব ভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি, সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥ গীতা ২।৬৯।

জন্মের দেহাভিমান, মনে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আমাদের অহং ভাব ও মমতার অভিমান, স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। জন্ম জন্মের এই সুদৃঢ় সংস্কার আমাদের অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করিয়া বসিয়া আছে। এই সুদৃঢ় দুর্জ্জয় সংস্কার হটাইতে বা স্থান চ্যুত করিতে না পারিলে, ব্রহ্মচর্য্য অন্তঃকরণে দাঁড়াইবার স্থানই পাইবে না।

আমাদের অনেকেরই দিগ্‌ভ্রম হইয়া থাকে। আমি ভ্রান্ত বুদ্ধিতে, উত্তর দিক্, পূর্ব্ব এবং পূর্ব্ব দিক্ দক্ষিণ বলিয়া ধারণা করি। এই মিথ্যা সংস্কার এতই প্রবল যে সূর্য্যোদয় দেখিলেও সেই ভ্রান্তি দূব হয় না। সেইরূপ আমরা যতই কেন নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করি না, কিছুতেই দেহাভিমান, অহং-তা এবং মমতা দূর হয় না।

ইন্দ্রিয়গণই বিষয় জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ। আমরা যত কিছু বিষয় ভোগ করি, ইন্দ্রিয় দ্বারা মনের যোগে উহা ভোগ করিয়া থাকি। প্রবল ইন্দ্রিয়গণ চঞ্চল মনকে বহির্বিষয় ভোগের নিমিত্ত হরণ করিয়া নেয়। অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা মনকে অন্তর্মুখ করিয়া আত্মসংস্থ করিতে না পারিলে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা হইবে না। ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ দ্বার সংযত করিয়া অর্থাৎ চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা ও ত্বকের ক্রিয়া সংযত ও সৎপথে চালিত করিয়া এবং মনকে অন্তঃকরণে আট্‌কাইয়া রাখিয়া মনের মুখ ব্রহ্ম ভাবনার দিকে ফিরাইতে পারিলে ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা আয়ত্ত হইবে। ইন্দ্রিয় সংযমই ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম এবং প্রধান সাধনা। সাধনার ইহাই সূক্ষতত্ত্ব।

ব্রহ্মচর্য্যের সর্ব্ব প্রধান সাধনই ত্যাগ। এই ত্যাগধর্ম্মের অন্তর্গত অন্য যত কিছু সাধনা। অষ্টাঙ্গ মৈথুন নিবৃত্তি, দশবিধ সংযম এবং দশবিধ নিয়ম প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সংযমের সাধনাগুলি এই ত্যাগ ধর্ম্মেরই অন্তর্গত। ত্যাগের সাধনা করিলেই ব্রহ্মচর্য্যের সাধনায় সিদ্ধ হওয়া যায়। একটী স্বতন্ত্র অধ্যায়ে ত্যাগ সম্বন্ধে অমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে যত্ন করিব।

এখন ব্রহ্মচর্য্যের অপর সাধনাগুলি লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছি। বেদের

অনুশাসনে চলাই ব্রহ্মচর্য্য এবং ব্রহ্মচর্য্য সাধনা সাপেক্ষ বলা হইয়াছে। বেদ বিহিত কর্ম্ম করিয়া এবং বেদ নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অর্জ্জন করিতে হয়। অতএব কিরূপ সাধনা ও তপস্যা করিলে ব্রহ্মচারী হওয়া যায় এবং ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে স্থিত হওয়া যায়, তাহারই এখন আলোচনা করিতেছি।

ব্রহ্মচর্য্যের শ্রেষ্ঠ বা প্রধান সাধন কি? যাহার সাধনায় সিদ্ধ না হইলে, ব্রহ্মচারী হইতেই পারে না সেই সাধনা কি?

ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম এবং প্রধান সাধন অষ্টাঙ্গ মৈথুন নিবৃত্তি। অষ্টাঙ্গ-মৈথুন নিবৃত্তি ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে। এই অষ্টাঙ্গ মৈথুন নিবৃত্তি না হইলে, ব্রহ্মচর্য্য লাভের চেষ্টা বৃথা। সুতরাং অষ্টাঙ্গ মৈথুন * নিবৃত্তি প্রথম এবং প্রধান সাধন বলিয়া উহাকেই ব্রহ্মচর্য্য বলা শাস্ত্রের অভিপ্রায়।

পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখা আছে।

"ব্রহ্মচর্য্যমুপস্থ নিয়মঃ বীর্য্যধারণং বা
ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্য লাভঃ।"

উপস্থ নিগ্রহ করিলে অর্থাৎ নিয়মিত করিলে, বীর্য্যধারণ বা বীর্য্যরক্ষা হয়। তাহাতে স্থায়িরূপে শরীর ও মনের শক্তি বৃদ্ধি হয়। সুতরাং ব্রহ্মে চরণশীল হইতে হইলে, শরীরের, মনের যথেষ্ট শক্তি ও বল রক্ষা করা আবশ্যক। বীর্য্যক্ষয়—শক্তি ক্ষয় হইলে, কিছুতেই ব্রহ্মচর্য্যে পৌঁছিতে পারা যাইবে না। ব্রহ্মচর্য্য ভ্রষ্ট হইবে।

অষ্টাঙ্গ মৈথুন নিবৃত্তি নরনারীর উভয়েরই একান্ত কর্ত্তব্য।

*"স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্য ভাষণং।
সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নিবৃত্তিরেব চ।
এতৎ মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥"
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্য মনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ।

মৈথুন — সংযোগ, মিলন। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সহিত মনের মিলন বা সংযোগ। ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার গুলি সংযত করিতে হইবে। চক্ষুঃ রূপ দেখে; সৎ বিষয় ও ভগবানের বিভূতি দেখাই চক্ষুর সংযম। কর্ণ শব্দ শুনে, ভগবানের গুণ কীর্ত্তন, সৎকথা ও বেদান্তাদি শাস্ত্র শ্রবণ, কর্ণের সংযম। ইত্যাদি।

ব্রহ্মচর্য্যের আরও সাধন আছে। যমভেদ বা দশবিধ সংযম ব্রহ্মচর্য্যের দ্বিতীয় প্রধান সাধন।

ময়মনসিংহ দিয়াড়া গ্রাম নিবাসী সিদ্ধবংশোদ্ভব তত্ত্বজ্ঞানী ভক্তি ভাজন ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার ভট্টাচার্য্য তত্ত্বনিধি মহাশয় প্রণীত "মনঃশুদ্ধি" নামক উপাদেয় গ্রন্থে তিনি দশবিধ সংযম সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সকলেরই মনোযোগ সহকারে পাঠ করা কর্ত্তব্য।

আমি উক্ত "মনঃশুদ্ধি" পুস্তকের দশবিধ সংযম সম্বন্ধে আদর্শ গ্রহণ করিয়া সংক্ষেপতঃ কিঞ্চিৎ লিখিতেছি ;—

সংযম দশ বিধ—দশ প্রকার সংযম শিক্ষা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য লাভ করিতে হয়।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, আর্জ্জব, ক্ষমা, ধৃতি, মিতাহার এবং শৌচ এই দশবিধ কর্ম্মকে সংযম বলে। *

১। অহিংসা কি? এবং কিরূপে উহা সাধন করিতে হয়?

"কায়েন মনসা বাচা সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদা।
অক্লেশ জননং প্রোক্ত মহিংসা ত্বেন যোগিভিঃ॥"

যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

নিজের শরীর দ্বারা, মন দ্বারা এবং বাক্য দ্বারা সদাসর্ব্বদা সকল প্রাণীর ক্লেশ উৎপাদন না করার নাম অহিংসা। অর্থাৎ সর্ব্বকালে কোনরূপে কোনও প্রাণীর পীড়া না জন্মানের নাম অহিংসা।

২। সত্য কি?

যেরূপ দৃষ্ট, অনুমিত বা শ্রুত হয়, ঠিক্ সেইরূপই বাক্য ও মনের অবস্থা হইলেই সত্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ আমি যেরূপ দেখিয়াছি, মনে মনে যেরূপ

* "অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জ্জবং।
ক্ষমা ধৃতির্মিতাহারঃ শৌচঞ্চেতে যমা দশঃ॥"

যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

অনুমান করিয়াছি, কি শুনিয়াছি, ঠিক্ ঠিক্ সেইরূপই মনের ভাব বা অবস্থা থাকা চাই এবং ঠিক্ সেইরূপ বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা চাই। তাহা হইলেই সত্যে থাকা হইল। ব্রহ্মচর্য্য লাভ করিতে হইলে সেইরূপ সত্যনিষ্ঠ হইতে চেষ্টা করিতে হইবে। সত্য সম্বন্ধে আরও বিশেষ কথা এই, মনে রাখা কর্ত্তব্য যে সর্ব্বভূতের উপকারের জন্যই বাক্যের প্রবৃত্তি হইয়াছে। যে কথা বলিলে ভূতের পীড়া জন্মে সেই বাক্য যথা দৃষ্ট যথা শ্রুত হইলেও প্রকৃত সত্য বলা যায় না—সত্যাভাস মাত্র। অতএব বিবেচনা পূর্ব্বক সর্ব্ব ভূতের হিতকর সত্য বলিবে।

৩। অস্তেয় কি ?

অশাস্ত্রীয় উপায়ে পরদ্রব্য গ্রহণের নাম স্তেয়; অর্থাৎ চৌর্য্যাদি। ইহার সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনই অস্তেয়।

স্তেয়কে বঙ্গ ভাষায় চুরি বলা হইয়া থাকে। শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা পর-দ্রব্যের প্রতি স্পৃহা না রাখার নাম অস্তেয়। *

৪। ব্রহ্মচর্য্য।

"কায়েন মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
সর্ব্বত্র মৈথুন ত্যাগো ব্রহ্মচর্য্য প্রবক্ষতে॥"

যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

নিজের শরীর মন ও বাক্যদ্বারা সকল অবস্থায় এবং সর্ব্বদা বিষয়লোলুপ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়ের সহিত সংযোগ ত্যাগ ব্রহ্মচর্য্য; ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃই বহির্ব্বিষয়ে চরণশীল হইয়া তাহাতে মজিয়া থাকিতে চায়। শরীর মন ও বাক্যদ্বারা

*"কায়েন মনসা বাচা পর দ্রব্যেষু নিস্পৃহা।
অস্তেয়মিতি সংপ্রোক্তমৃষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥"

যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

যে কোন সময়ে, যে কোন অবস্থায় লোভী ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ের সহিত "মৈথুন" করিতে অর্থাৎ সংযুক্ত হইতে দিবে না।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমবাসী, যতি, নৈষ্ঠিক এবং অরণ্যবাসীদের পক্ষেই এই বিধি। গৃহস্থাশ্রমবাসীদিগের ব্রহ্মচর্য্যের বিধি পশ্চাৎ লিখিত হইবে। *

পাপবুদ্ধি পূর্ব্বক পুরুষের স্ত্রীর এবং স্ত্রীর পুরুষের দর্শন, স্পর্শনাদি বিষয়ে লোলুপ ইন্দ্রিয়ের সংযমের নাম ব্রহ্মচর্য্য। ইহা সকল আশ্রমীর পক্ষেই অবশ্য করণীয়।

৫। দয়া।

দয়া সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বত্রানুগ্রহস্পৃহা।
বিহিতেষু তদন্যেষু মনোবাক্কায় কর্ম্মণা॥

যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

শরীর, মন, বাক্য, এবং কর্ম্ম দ্বারা সকল অবস্থাতে অর্থাৎ বিহিত কি তদন্য অবস্থাতেও সর্ব্বভূতের প্রতি অনুগ্রহ করার স্পৃহাকে দয়া বলে। অবিহিত বিষয়ে দয়া করিতে হইলে বিশেষ বিবেচনা করিয়া করিতে হইবে। শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বিষয়ে দয়া করিতে নিশ্চেষ্ট থাকা—বৈধ নহে কি?

৬। আর্জ্জব।

"প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা একরূপত্ব মার্জ্জবং।"

যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি বিষয়ে সমভাব স্থাপনের নাম আর্জ্জব।

আর্জ্জব = সরলতা, অবক্রতা।

---

*"ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্থানাং যতীনাং নৈষ্ঠিকস্য চ।
ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ তৎপ্রোক্তং তথৈবারণ্যবাসিনাং॥"

যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

৭। ক্ষমা।

"প্রিয়াপ্রিয়েষু সর্ব্বেষু সমত্বং যচ্ছরীরিণাং।
ক্ষমা সৈবেতি বিদ্বদ্ভির্গদিতা বেদবাদিভিঃ॥"

যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

প্রিয়, অপ্রিয় বিষয়ে সমভাব থাকার নাম ক্ষমা। ক্ষমা—'শক্তৌ' অর্থাৎ অপ্রিয় বিষয়ের প্রতীকার করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও যিনি প্রতীকারের চেষ্টা না করিয়া সমভাবে থাকেন তাহাকেই ক্ষমাশীল বলে।

৮। ধৃতি।

"অর্থ হানৌচ বন্ধূনাং বিয়োগে চাপি সম্পদি।
ভূয়ঃ প্রাপ্তৌ চ সর্ব্বত্র চিত্তস্য স্থাপনং ধৃতিঃ॥"

যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

অর্থহানি, বন্ধুবিয়োগ, এবং সম্পদ্ হইলে এবং এই সকলের পুনঃ পুনঃ সংঘটন হইলে সকল অবস্থায় চিত্তের সমতা রক্ষার নাম ধৃতি।

"দুঃখাদিভিঃ অবসাদে চিত্তস্য স্থিরীকরণং—ধৃতিঃ।" দুঃখাদি দ্বারা চিত্ত অবসন্ন হইলেও চিত্তকে স্থির রাখিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকার নাম ধৃতি।

৯। মিতাহার।

"অষ্টৌগ্রাসা মুনের্ভক্ষ্যাঃ ষোড়শারণ্য বাসিনাং।
দ্বাত্রিংশদ্ধি গৃহস্থস্য যথেষ্টং ব্রহ্মচারিণাং॥
এষামেব মিতাহার স্বন্যেষামল্পভোজনং।"

যোগি যাজ্ঞবল্ক্য।

মুনিগণের অষ্টগ্রাস, অরণ্যবাসিগণের ষোলগ্রাস, গৃহস্থগণের বত্রিশগ্রাস, ব্রহ্মচারিগণের যথেষ্ট গ্রাস ও অপর ব্যক্তিগণের অল্পভোজনকে মিতাহার বলে। গ্রাসের পরিমাণ কুক্কুটের ডিম্ব সদৃশ। ব্রহ্মচারীদের শরীরের শক্তি ভেদে আহারের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। যে পরিমাণ আহার করিলে তপস্যার ব্যাঘাত না জন্মে সেই পরিমাণ আহার করা ব্রহ্মচারীদের বিধেয়।

১০। শৌচ

"শৌচন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরন্তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং মনঃ শুদ্ধিস্তথান্তরং।"

যোগি

শৌচ দ্বিবিধ—বাহ্য এবং আভ্যন্তর। মাটী এবং জল দ্বারা শরীর পরিষ্কার করা বাহ্য শৌচ, মনঃশুদ্ধি সম্পাদনের নাম আভ্যন্তর শৌচ।

যিনি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিবেন, এবং তাহাতে স্থিত থাকিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাকে সর্ব্বদাই পরপীড়া বর্জ্জন করিতে হইবে, সত্যনিষ্ঠ হইতে হইবে, অন্যায়রূপে পরদ্রব্য লাভে নিস্পৃহ হইতে হইবে, অষ্টাঙ্গ মৈথুন বর্জ্জন করিতে হইবে, সর্ব্বভূতে দয়া করিতে হইবে, অকপট ও সরল হইতে হইবে, ক্ষমা-শীল হইতে হইবে, সম্পদে এবং বিপদে ধৈর্য্যশীল হইতে হইবে, অর্থাৎ কি সুখে কি দুঃখে মনকে একভাবে স্থির রাখিতে হইবে; শরীর ধারণোপযোগী সাত্ত্বিক মিতাহার করিতে হইবে; শরীর ও মন অর্থাৎ বাহ্য এবং আভ্যন্তর শুচি অর্থাৎ বিশুদ্ধ রাখিতে হইবে'। ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বীর এই সমস্ত উপদেশ অবশ্য পালনীয়।

দশবিধ সংযমের কথা সংক্ষেপতঃ বলা হইল।

নিয়ম ও দশবিধ। যথাঃ—তপঃ, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, ঈশ্বরপূজা, সিদ্ধান্ত-শ্রবণ, লজ্জা, মতি, জপ এবং ব্রত এই দশবিধ নিয়ম। *

(১) পুরুষার্থ লাভের জন্য তপস্যা করিতে হইবে। (২) সকল সময় সন্তুষ্ট থাকিতে চেষ্টা করিতে হইবে। (৩) শ্রুতি, স্মৃতি এবং ঋষি প্রণীত ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রতি আস্তিক্য বুদ্ধি অর্থাৎ অবিচলিত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রাখিতে হইবে। (৪) দানের উপযুক্ত পাত্রে কালোচিত দান করিতে হইবে। (৫) ঈশ্বর ইষ্ট দেবের পূজা করিতে হইবে। (৬) বেদান্ত এবং অন্যবিধ শাস্ত্র সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিতে হইবে। (৭) লজ্জাশীল হইতে হইবে। (৮) শাস্ত্র বিষয় মনন অর্থাৎ মনে মনে, চিন্তা করিতে হইবে। (৯) ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে হইবে। (১০) শাস্ত্রোপদিষ্ট ব্রত পালন করিতে হইবে। এই দশবিধ উপদেশ পালন করাকে দশবিধ নিয়ম বলা হইয়াছে।

যম, নিয়মাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করাই ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান সাধন। ব্রহ্ম ব্রত ধারণ করিতে হইলে, শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা লাভ করা আবশ্যক। পবিত্রতা বলিতে শরীরের ও মনের বা চিত্তের নির্ম্মলতা ও চিত্তশুদ্ধি বুঝায়।

হিন্দু শাস্ত্রোক্ত চতুর্ব্বিধ আশ্রমে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা এবং ব্রহ্মচর্য্য লাভ করা যায়। চারিবর্ণের মনুষ্যই ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা করিয়া উহা লাভ করিতে পারেন।

যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম—গুরু-গৃহ হইতে সমাবর্ত্তন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না করিয়াই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করতঃ ব্রহ্মচর্য্য সাধনা করিয়া উহা লাভ করেন, তাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী।

গৃহস্থাশ্রমীও ব্রহ্মচারী হইতে পারেন। যাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম করেন, এবং ইষ্টা পূর্ত্ত প্রভৃতি সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাও

---

* তপঃ সন্তোষমাস্তিক্যং দানমীশ্বর পূজনং।
সিদ্ধান্তশ্রবণঞ্চৈব হ্রীর্মতিশ্চ জপো ব্রতং।
এতে চ নিয়মাঃ প্রোক্তাস্তাংশ্চ সর্ব্বান্ পৃথক্ শৃণু॥
যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন। যাঁহারা অনাসক্ত ভাবে সঙ্গ রহিত হইয়া, ঈশ্বর প্রীতির জন্য ঈশ্বরাভিপ্রেত সংসার চক্রের নিয়ম যথাযথ পালন করিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধান মতে অহংকারশূন্য হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যান, তাঁহারাও ব্রহ্মচারী। এরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা ব্রহ্মচর্য্য।

গৃহস্থাশ্রমস্থিতা ঋতুমতী স্ত্রী যথাশাস্ত্র শুদ্ধা হইয়া বিহিত সময়ে অপত্য কামনায় পতিসঙ্গ করিলে সাধ্বী স্ত্রীর এবং তৎপতির ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয় না। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের এইরূপ আচরণ ব্রহ্মচর্য্য। বৈশ্যের যথাশাস্ত্র নিজ বৃত্তি অবলম্বনে সাংসারিক কার্য্য করা ব্রহ্মচর্য্য। কর্ত্তব্য বোধে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের যথাশাস্ত্র শুশ্রূষা করা গৃহস্থ শূদ্রের ব্রহ্মচর্য্য। ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা বিশেষ ভাবে বিহিত। *

স্ত্রীদিগের পতি, শ্বশুর শাশুড়ী, পিতা এবং মাতা প্রভৃতি গুরুজনের শুশ্রূষা করা ব্রহ্মচর্য্য।

গৃহস্থাশ্রমীর পঞ্চ মহাযজ্ঞ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

পঞ্চ মহাযজ্ঞ কি ?

(১)। অধ্যয়ন, অধ্যাপন —ব্রহ্মযজ্ঞ (২) শ্রাদ্ধ তর্পণ —পিতৃযজ্ঞ। (৩) অতিথিসেবা, নৃযজ্ঞ। (৪) পশুপক্ষী প্রভৃতিকে অন্নদান ভূতযজ্ঞ। (৫) হোমাদি পূজার নাম দেবযজ্ঞ।

* ঋতাবৃতৌ স্বদারেষু সংগতি র্যা বিধানতঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং তদেবোক্তং গৃহস্থাশ্রম বাসিনাং॥
রাজ্ঞশ্চৈব গৃহস্থস্য ব্রহ্মচর্য্যং প্রকীর্ত্তিতং।
বিশাংবৃত্তিরতাশ্চৈব কেচিদিচ্ছন্তি পণ্ডিতাঃ॥
শুশ্রূষৈবতু শূদ্রস্য ব্রহ্মচর্য্যং প্রকীর্ত্তিতং।
শুশ্রূষয়া গুরৌ নিত্যং যোষিতাং তদুদাহৃতং॥

যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

শরীর মন এবং বাক্যের শুদ্ধি লাভ করা ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান সাধন। তপস্যা দ্বারা শরীর, মন ও বাক্যের শুদ্ধি লাভ করিতে হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই ত্রিবিধ তপস্যার উপদেশ আছে। তপস্যাই প্রধান নিয়ম।

ত্রিবিধ তপস্যা এই:—

"দেবদ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥"
অনুদ্বেগ করং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্‌ময়ং তপ উচ্যতে ॥
মনঃ প্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌন মাত্ম বিনিগ্রহঃ।
ভাব সংশুদ্ধি রিত্যেতৎ তপো মানস মুচ্যতে ॥

গীতা ১৭—১৪, ১৫, ১৬।

দেব, দ্বিজ, গুরু এবং জ্ঞানিগণের পূজা, শৌচ, সারল্য, ব্রহ্মচর্য্য এবং অহিংসা কায়িক তপস্যা বলিয়া অভিহিত ॥ ১৪ ॥

যাহাতে লোকের উদ্বেগ না হয় এই প্রকার সত্য প্রিয় এবং হিতকরবাক্য প্রয়োগ করা এবং বেদাভ্যাস করা বাচিক তপস্যা বলিয়া কথিত ॥ ১৫ ॥

চিত্ত প্রসাদ, ক্রূরতার অভাব, আত্মচিন্তা মনঃসংযম এবং অকপটতা মানসিক তপস্যা বলিয়া কথিত ॥ ১৬ ॥

আমাদের প্রতি গৃহে হিন্দু শাস্ত্রের শাসনানুযায়ী বর্ণগত, সমাজ-গত এবং বংশগত যে সমস্ত সদাচার ও ক্রিয়া কলাপ প্রতিষ্ঠিত আছে, নিষ্ঠার সহিত তাহা পালন করিলে গীতোক্ত তিন প্রকার তপস্যা যন্ত্র চালিতের ন্যায় দিনদিন সকলেরই কিছু না কিছু করা হইয়া থাকে।

আমাদের অনেকের বাড়ীতেই দেবমন্দির আছে। তাহাতে দেব বিগ্রহ বা দেব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। বিল্ববৃক্ষ ও তুলসী গাছ আছে। আমরা সদাচার পরায়ণ হইয়া ন্যূনাধিক রূপে দেবতার পূজা, তুলসী ও বিল্ববৃক্ষের পূজা ও সম্মান

করিয়া থাকি। সদাচারের অনুরোধে আমরা সকলেই ন্যূনাধিক রূপ শুচি অবস্থায় থাকি। অশুচি থাকিলে মন অপবিত্র বলিয়া বোধ হয়। সদাচার রক্ষা করিতে হইলে সংযত হইয়া সমস্ত কার্য্যই করিতে হয়।

মন ও বাক্যের তপস্যাই অপেক্ষাকৃত কঠিন।

বাক্যের তপস্যা :—

বিধাতা অনেক প্রাণীকেই বাক্‌শক্তি প্রদান করেন নাই। মনুষ্যকেই এই দুর্ল্লভ বাক্‌শক্তি পূর্ণমাত্রায় প্রদান করিয়াছেন। সেই বাক্‌শক্তির অপব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং বাক্‌সংযম করাই কর্ত্তব্য। যে বাক্য প্রয়োগ করিলে অপরে উদ্বেগগ্রস্ত হয় সেই বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। সত্য, প্রিয় এবং হিতকর বাক্য প্রয়োগ করাই বাক্যের সদ্ব্যবহার। অভ্যাস বা তপস্যা করিয়া সত্যবাদী, প্রিয়বাদী এবং হিতবাদী হইতে হইবে। ইহাই বাক্যের তপস্যা।

মনের তপস্যা।—

সর্ব্বদা চিত্তের প্রসন্নতা রক্ষা করিবে, অর্থাৎ সর্ব্বদা প্রসন্ন চিত্তে থাকিবে। মনে কপট বা কূট বুদ্ধি পোষণ করিবে না। সংযত বাক্য বলিবে। অন্যায় বা অসংযত বাক্য বলিবে না। মন সংযত রাখিবে, মনকে নিজের বশে রাখিবে। মনের সমস্ত কুটিলতা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ ও সরলভাব পোষণ করিবে। মনকে এই ভাবে গঠন করিতে অভ্যাস করিবে।

কায়, মন, ও বাক্যে সত্যনিষ্ঠ হইবে। হিতবাক্য ও প্রিয়বাক্য ব্যবহার করিবে। দেব, দ্বিজ, গুরু, তত্ত্বজ্ঞানী ও বিজ্ঞ প্রবীন লোকের পূজা অর্থাৎ সম্মান করিবে। মনের দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা প্রসন্ন চিত্তে থাকিতে চেষ্টা করিবে।

এইরূপ করিতে পারিলে অর্থাৎ নিজের চরিত্রকে এই রূপে গঠিত করিতে পারিলে চিত্ত শুদ্ধ হইবে। তখন ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইবে—ভগবদ্ভাব মনে স্থান পাইবে।

ক্ষেত্র বলিতে জমী বুঝাইয়া থাকে। ক্ষেত্রে ফসল বা শস্য হয়। ক্ষেত্রে বা জমীতে হাল চাষ করিয়া ঢিল ভাঙ্গিয়া জঙ্গল বাছিয়া বীজ বপন করিলে শস্য উৎপন্ন হয়, ক্ষেত্রের ফল পাওয়া যায়।

শরীরকে ক্ষেত্র বলে। এই দেহটাকেও জমী চাষের ন্যায়—তপস্যা অভ্যাস দ্বারা, বৈরাগ্যের দ্বারা এবং সংযমের দ্বারা উত্তম কর্ষণ করিলে দেহ মন ও বাক্য শুদ্ধ হইবে। দেহের ও মনের সমস্ত আবর্জ্জনা দূর হইবে। এবং বীজ বপনের উপযোগী হইবে। তৎপর ইষ্টমন্ত্ররূপ বীজ দেহে উপ্ত হইলে ভগবৎপ্রাপ্তি বা ব্রহ্মচর্য্য লাভরূপ ফসল বা শস্যোৎপন্ন হইবে। এ সম্বন্ধে সাধক প্রবর রামপ্রসাদ সেনের একটী গান উদ্ধৃত হইল ;—

"মন রে ! কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমীন রৈল পতিত, আবাদ কর্লে ফল্‌তো সোনা॥
কালীনামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছ্‌রূপ হবে না ;
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম্ ঘেঁসে না।"

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা যখন মনের সমস্ত ভাব ও বৃত্তি গুলি একমাত্র ঈশ্বরমুখ হইবে, জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সকল অবস্থাতেই যখন মনের ঈশ্বর চিন্তায় নিষ্ঠা হইবে,অবিশ্রান্ত তৈলধারার ন্যায় ঈশ্বর চিন্তায় বিরাম হইবে না, তখনই ব্রহ্মচর্য্য পরিপক্ক অবস্থায় দাঁড়াইবে—তখনই অহৈতুকী ভক্তি ও জ্ঞানের উদয় হইবে; তখনই ভক্তি ও জ্ঞান এক হইয়া যাইবে। তিনিই পরম ভক্ত,—তিনিই পরম জ্ঞানী। ভগবদ্ভক্ত হইলেই মনুষ্যের পরম শ্রেয়ঃ লাভ হয়।

ব্রহ্ম বিদ্যা লাভ করা, ব্রহ্মচর্য্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। ব্রহ্মচারী হইতে হইলে, ব্রহ্মবিদ্যালাভ করা আবশ্যক।

কি গুণ থাকিলে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায় ? সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইলে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের অধিকার জন্মে।

ব্রহ্মবিদ্যালাভের সাধন চতুষ্ঠয় এই ;—

১। নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক। কোন বস্তু নিত্য, কোন বস্তু অনিত্য ইহার জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

২। ইহামুত্র ফল ভোগ বিরাগ, অর্থাৎ বর্ত্তমান শরীরে কিংবা পরে, লৌকিক দেহে—পরকালে, যে কোন প্রকার ফল ভোগের বাসনা না থাকা আবশ্যক।

৩। শম দমাদি সম্পত্তি সম্পন্ন হওয়া চাই। শম দমাদি সম্পত্তি এই :— শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান এবং শ্রদ্ধা।

শম=বিষয় হইতে অন্তঃকরণের—চিত্তের ও মনেব নিগ্রহ। দম=বিষয় হইতে বহিঃকরণের অর্থাৎ চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। উপরতি=সন্ন্যাসাশ্রম পরিগ্রহ পূর্ব্বক শাস্ত্র বিহিত কর্ম্ম কলাপের পরিত্যাগ। শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গৃহস্থাশ্রমেই অনাসক্ত ভাবে, সঙ্গত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম যোগাবলম্বনে, অর্থাৎ আসক্তি এবং ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

কাম্যাণাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ।

গীতা ১৮—২

কাম্য কর্ম্ম ত্যাগকেই সূক্ষ্মদর্শীরা সন্ন্যাস, এবং সমস্ত কর্ম্মফলত্যাগকেই বিচক্ষণগণ ত্যাগ কহিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার উপদেশ এই :—সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ না করিয়া গৃহে থাকিয়াও নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া আসক্তি শূন্য হইয়া বিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া গেলে, "উপরতির" ফল লাভ হয়।

তিতিক্ষা=শীতোষ্ণাদির দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা। শীত গ্রীষ্মে, সুখে দুঃখে, লাভালাভে চিত্তের সমভাব থাকা।

শ্রদ্ধা=গুরুবাক্যে, ঋষিবাক্যে ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস।

সমাধান=শ্রবণাদি ও তদনুকূ'ল বিষয়ে মনের সমাধি বা একাগ্রতা অর্থাৎ তৎপরায়ণতার সমাধান।

মুমুক্ষুত্ব=মুক্তি লাভের ইচ্ছা। ভগবদ্ভক্ত হইলেই পরজ্ঞান লাভ হয়। পরজ্ঞান লাভ হইলেই মুক্তি।

এই সমস্ত সাধন সম্পন্ন না হইলে, মন অন্তর্মুখ হইবে না। ব্রহ্মবিদ্যা লাভও হইবে না।

ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়াই ভক্তির সাধনা করিতে হয়।

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীশ্রীহরির অর্চ্চনা করিতে হইলে যেরূপ হওয়া আবশ্যক উপদেশ করিয়াছেন তাহা এ স্থলে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

যদি হরিনাম কীর্ত্তন করিতে চাও, তাঁহার পূজা করিতে চাও, ও তাঁহার ভক্ত হইতে চাও, তবে তোমায় তৃণ হইতেও নীচ হইতে হইবে, তরু বা বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু হইতে হইবে। নিজে অমানী অর্থাৎ অভিমান শূন্য হইতে হইবে, এবং অন্যকে সম্মান করিতে হইবে, অর্থাৎ অন্যের মান বাড়াইতে হইবে।* তৃণের স্বভাব সকলের পায়ের নীচে থাকা, পদ দলিত হইলেও আপত্তি করে না। বৃক্ষের মত সহ্যগুণ কাহার? বৃক্ষের নীচে থাক সে ছায়া দান করিবে। বৃক্ষের ফল খাইতে ইচ্ছা কর সে ফল খাইতে দিবে। কাঠুরিয়া বৃক্ষের ডাল কাটিতেছে, ফলও খাইতেছে, ডাল কাটিয়া ক্লান্ত, ও পথ শ্রান্ত হইলে, বৃক্ষের ছায়ার তলে বসিয়া ক্লান্তি ও শ্রম দূর করিতেছে। বৃক্ষ সমস্তই সহ্য করিতেছে—ঝড় বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাত ও কঠোর আতপ সমস্তই একস্থানে থাকিয়া সমভাবে সহ্য করিতেছে। এই বৃক্ষেরও অধিক সহিষ্ণু হইবে। নিজে অভিমান শূন্য হইবে। চারি বিষয়ে মানুষের

---

* তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।

অভিমান বা গর্ব্ব হয়। যথাঃ--

(১) ধনের অভিমান, আমি ধনী এইরূপ গর্ব্ব হয়।

(২) পাণ্ডিত্যের অভিমান—আমি পণ্ডিত এইরূপ গর্ব্ব হয়।

(৩) সৌন্দর্য্যের অভিমান—আমি সুন্দর এইরূপ গর্ব্ব হয়।

(৪) কৌলীন্যের অভিমান—আমি কুলীন, আমার উচ্চবংশে জন্ম, এইরূপ গর্ব্ব হয়।

যিনি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যে স্থিত হইতে চান, তাঁহাকে উক্ত চারি প্রকার অভিমান শূন্য হইতে হইবে। এবং অপরকে, সমুচিত সম্মান করিতে হইবে।

"দয়া ধরম মূল, নরক মূল অভিমান।"—তুলসীদাস।

ত্যাগ ব্রহ্মচর্য্যের শ্রেষ্ঠ সাধন। পরন্তু ভক্তির সাধনা ব্রহ্মচর্য্যের শেষ সাধন।

ব্রহ্মচর্য্যের সাধন।

ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণের উচ্চাঙ্গ সাধন সদাচার যম নিয়মাদি অভ্যাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। উচ্চস্থানে উঠিতে হইলে যেমন নিম্নস্তরের সোপান ধরিয়া ক্রমে উচ্চতর সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া গন্তব্য সর্ব্বোচ্চ স্থানে পৌঁছিতে হয়, সেইরূপ নিম্নস্তরের সাধনার অনুশীলন আরম্ভ করিয়া গন্তব্যস্থান ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিত হইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

বিলাসিতা ও ভোগেচ্ছা ত্যাগের ভাব মনে উদয় না হইলে আত্মোন্নতিকল্পে কোন সাধনাই হইতে পারে না। অভ্যস্ত বিষয় ত্যাগ করা আপাততঃ কঠিন এবং দুঃখ জনক।

যাহাতে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়, আর জন্ম, মরণ, দুঃখ ভোগ করিতে না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই শাস্ত্রকার ঋষিগণ, দৈনিক কার্য্য, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভগবদ্ভক্তি এবং জ্ঞান লাভ করিয়া ভগবদ্ভাব প্রাপ্তিই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ। তাহাতেই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। সেই অভিপ্রায়েই কাম্য, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে ঈশ্বরারাধনার সূত্র গ্রথিত আছে।

প্রাতে নিদ্রা ভঙ্গে শয্যা হইতে উঠিতে ঈশ্বর নাম স্মরণ, ও ঈশ্বর চিন্তা করিতে হয়। যাহা আহার করিবে, তাহা ঈশ্বরকে নিবেদন করিয়া তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিতে হইবে। পথে চলিতে হইলে, ঈশ্বর নাম করিয়া বাহির হইতে হইবে। শয়নে ঈশ্বর নাম স্মরণ করিয়া শয়ন করিতে হইবে। অহোরাত্র সমস্ত সময়ে, সমস্ত কার্য্যেই ঈশ্বর চিন্তা ঈশ্বর ধ্যান করিতে হইবে। সেইরূপ উৎসবে ব্যসনে সকল অবস্থাতেই ঈশ্বর চিন্তার ও ঈশ্বর আরাধনার ব্যবস্থা আছে।

সমস্তই ঈশ্বরার্থে—ইহাই হিন্দু শাস্ত্রের সদাচার।

ধর্ম্ম সদাচারমূলক। সমস্ত সাধনার মূলেই সদাচার।

সৎ-আচার=সদাচার। সৎ অর্থাৎ সাধু এবং শিষ্ট আচার। যাহা সাধু এবং সজ্জনে আচরণ করেন, তাহাই সদাচার ; সদাচার ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম স্তরের সাধনা। এতৎ সম্বন্ধে কিছু লেখা প্রয়োজন। সদাচারের বহু প্রশংসা শাস্ত্রে আছে।

"ততোঽভ্যসেৎ প্রযত্নেন সদাচারং সদা দ্বিজাঃ।
তীর্থান্যপ্যভিলষ্যন্তি সদাচার সমাগমং॥

কাশীখণ্ড।

এই সমস্ত কারণে, ব্রাহ্মণ যত্ন সহকারে, সতত সদাচার করিবে। তীর্থগণও সদাচার পরায়ণ ব্যক্তিগণের আগমন অভিলাস করেন। ব্রাহ্মণ উপলক্ষ মাত্র, কল্যাণকামী সমস্ত মানব জাতিরই সদাচার পরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য।

সদাচারের অঙ্গগুলি পৃথক পৃথক করিয়া লিখিতে হইলে, এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। সদাচার সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে, অনেক গ্রন্থের প্রচার আছে। "হিন্দুর নিত্যকর্ম্ম" "হিন্দু-সৎকর্ম্ম মালা," "পুরোহিত দর্পণ" এবং "জীবন-শিক্ষা" প্রভৃতি অনেক পুস্তকে সদাচার সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ আছে। ঐ সমস্ত

পুস্তক স্মৃতিশাস্ত্রের "শুদ্ধিতত্ত্ব" "আহ্নিকতত্ত্ব" হইতে মূল বিষয় গ্রহণ করিয়া লিখা হইয়াছে। ঐ সমস্ত পুস্তকের কোন একখানা পাঠ করিলে, সদাচার সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যাইতে পারে। নিষ্ঠাবান হিন্দুর ঘরে ঘরে যথাশাস্ত্র নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কুলগত ধর্ম্ম বলিয়া উহা যথাযথ আচরিত হইতেছে।

সদাচারের মোটামুটি বিষয়গুলি এই।—রজনীর শেষ চরিদণ্ড ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত। সেই সময়ে, প্রত্যেক নর নারীর, ঈশ্বর নাম স্মরণ করিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতে হইবে। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে এবং রাত্রিতে, দৈনিক সমস্ত নিত্য নৈমিত্তিক কাজে ইষ্টচিন্তা, ইষ্টমন্ত্র জপাদি করিয়া পুনঃ ঈশ্বর নাম, ও পুণ্যাত্মাদিগের নাম স্মরণ করিয়া শয়ন করিবে।

সদাচার—নিদ্রা হইতে উঠিয়া মল মূত্রাদি ত্যাগ,দন্তধাবন, আচমনাদি দ্বারা মুখ পরিষ্কার করা, অরুণোদয়কালে প্রাতঃস্নান করিয়া শরীর পরিষ্কার করা সদাচার, প্রাতঃস্নানান্তে অথবা শরীর অসুস্থ থাকিলে, রাত্রিবাস পরিবর্ত্তন করিয়া সংযত চিত্তে, সন্ধ্যা বন্দনাদি করিবে। তৎপর সম্ভব মতে, নিজ হস্তে পুষ্প চয়ন করিয়া পবিত্র মনে, ইষ্ট পূজা করিবে। তৎপর গৃহ কর্ম্মের যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবে; ইহাই সদাচার।

ব্রহ্মচর্য্যের সাধন—

ত্যাগ।

হিন্দু সমাজে এবং হিন্দুর প্রতিগৃহে যে সমস্ত শাস্ত্রোক্ত আচার ও নিয়ম প্রচলিত আছে, তৎসমস্তই আত্মোন্নতি লাভের সাধন, সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা হিন্দু শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ নন, যাঁহারা ঘোর বৈষয়িক, আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করিতে যাঁহারা চিন্তা করেন না, এবং বিকৃত শিক্ষা লাভ করিয়া যাঁহাদের মন বহির্ম্মুখ হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহারা হিন্দুসমাজের শাস্ত্রোক্ত অনেক আচার ও নিয়মের আপাত-কঠোরতা দেখিয়া এ সমস্তই বর্ব্বরোচিত মনে করেন এবং উহার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করেন।

কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্য দিয়া কিরূপে ত্যাগ শিক্ষা হয় প্রথমে তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। স্মৃতি শাস্ত্রে অধিকারিভেদে সকাম, নিষ্কাম, ব্রতাচরণের বিধান আছে। তাহাতে ত্যাগ শিক্ষা হয়। এবং তাহা ব্রতাচারীকে কষ্ট সহিষ্ণু করাইয়া দৃঢ়তার সহিত ইষ্ট সাধনার পথে তাঁহার শরীর ও মনকে প্রস্তুত করে।

ষট্ পঞ্চমী ব্রতের নিয়ম এই;—প্রথম দুই বৎসর ব্রত গ্রহণের দিনে লবণ খাইবে না; তৎপর দুই বৎসর এই দিনে এক বেলা হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে। পঞ্চম বৎসরে ব্রত দিনে ফল ভোজন করিয়া থাকিবে, ষষ্ঠ বৎসরে সেই দিনে উপবাস করিবে।

সর্ব্বজয়া ব্রত—যে ব্রত সকল ব্রতকে জয় করে। সেই ব্রতের নিয়ম এই;—এই ব্রত বর্ষব্যাপী।:এই ব্রত ধারণের প্রথম মাসে পৌষে লবণ, মাঘে তৈল, ফাল্গুনে সুপারি, চৈত্রে দধি, শ্রাবণে বস্ত্র, ভাদ্রে মেঘজল, আশ্বিনে দুগ্ধ, কার্ত্তিকে শয্যা বর্জ্জন করিতে হয়।

যে কার্য্যে ত্যাগের পরিমাণ অধিক সেই কার্য্যের ফল-শ্রুতিও অধিক।

অমর লেখক বঙ্কিম বাবু তাঁহার প্রণীত "দেবী চৌধুরাণী" পুস্তকে ভবানী ঠাকুর দ্বারা প্রফুল্লকে আহার ব্যবহারে ত্যাগ ও সংযম শিক্ষা দিয়া চরিত্র ও শরীর গঠন করাইয়াছিলেন।

সধবা পুরস্ত্রীগণ সিঁথিতে সিন্দুর দিয়া মস্তক মণ্ডিত করিয়া রাখেন, সারাদিন তাম্বূলরাগে ওষ্ঠ রঞ্জিত রাখেন, সধবার চিহ্ন হাতে শাঁখা এবং লোহা পরা সধবার ধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনে করেন। তাঁহারা বড়ই অলঙ্কার প্রিয়, রঙ্গীন পেড়ে বস্ত্র তাঁহাদের পরিধেয়। এই সমস্ত অঙ্গভূষণ সধবা পুরস্ত্রীদিগের বড়ই প্রিয়। স্বামীর মৃত্যু হইলে তাঁহাদিগের কি করিতে হয়? সিঁথির সিন্দুর, পান খাওয়া, হাতের লোহা এবং শাঁখা পাইরদার কাপড় ও অলঙ্কার প্রভৃতি সমস্তই বৈধব্য দশার পরক্ষণেই জন্মের মত পরিত্যাগ করিতে হয়। মাথার চুল ছাটিয়া ফেলিতে হয়, অভ্যস্ত নানাবিধ আহার্য্য ও পেয় বস্তু পরিত্যাগ করিয়া একাহারে থাকিতে হয়। বিধবার সর্ব্বপ্রথমেই এই সমস্ত কঠোরতা অবলম্বন করা শাস্ত্রের শাসন।

বাল-বিধবা দিগকে এই সমস্ত কঠোরতা অবলম্বন করিতে বাধ্য করাইয়া নিজ পরিবারের সকলেই এবং আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণ অত্যন্ত শোক দগ্ধ হন—সেই পরিবারে বিষাদের ছায়া পতিত হয়।

প্রাকৃত সংসারী হিন্দু পরিবারের অনেকেই শাস্ত্র-শাসন পালনার্থ কষ্টানুভব করিয়াও উপরিউক্ত কঠোর নিয়মগুলি যথাযথ প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। যাঁহারা শাস্ত্রার্থ তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী, তাঁহারা শাস্ত্রের গূঢ় অর্থ অবগত হইয়া উপরি-উক্ত কঠোরতা গুলিকে আত্মোন্নতি লাভের সাধন জানিয়া দুঃখিত হন না। তাঁহারা জানেন বিষয়ভোগ পুরুষার্থ লাভের বিরোধী। পারলৌকিক পরম পুরুষার্থ লাভের পক্ষে ত্যাগ ধর্ম্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বপ্রধান সাধন। সংযম এবং ত্যাগের অনুশীলন ভিন্ন পুরুষার্থলাভের অন্য উপায় নাই। হিন্দু শাস্ত্রে ত্যাগ-ধর্ম্মের মহিমা শতমুখে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ত্যাগে শাশ্বত শান্তি লাভ হয়, ত্যাগ ব্রহ্মচর্য্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন।

সেই ত্যাগের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি :—

ত্যাগ। (ত্যাগাৎশান্তিরনন্তরম্) গীতা

ভোগে—বন্ধন। ত্যাগে—মুক্তি। ত্যাগ=উৎসর্গ; কর্ম্ম বিশেষ; যাহা আছে তাহা ছাড়িয়া দেওয়া। ত্যাগই সকল কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ, প্রকৃত কর্ম্মশব্দ বাচ্য।

শ্রীশ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন ;—

ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্ম সংজ্ঞিতঃ।

গীতা—৮।৩

ভূতের (উৎপত্তি) স্থিতি ও উন্নতি কল্পে যে বিসর্গ বা বস্তু ত্যাগ তাহাই কর্ম্ম।

দানধর্ম্ম ত্যাগেরই অন্তর্গত। ত্যাগ স্বীকার না করিলে অর্থাৎ যাহা আমার আছে, বা যাহা আমার প্রাপ্য তাহা ছাড়িয়া দেওয়ার ইচ্ছা না হইলে দান ধর্ম্মে মতি হইতে পারে না।

সংযম শিক্ষা ত্যাগের প্রথম সোপান। যিনি যে পরিমাণ সংযত হইবেন তিনি সেই পরিমাণ ত্যাগী হইতে পারিবেন এবং যে পরিমাণে ত্যাগী হইবেন সেই পরিমাণে ভক্ত ও জ্ঞানী হইতে পারিবেন। যে পরিমাণ ভক্তি ও জ্ঞান লাভ হইবে, তাঁহার সেই পরিমাণ আত্মোন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে।

যিনি যত ভোগাকাঙ্ক্ষী, তিনি তত দুঃখী। যিনি যত সংযমী ও ত্যাগী তিনি ততই সুখী। ত্যাগই শান্তি বা প্রকৃত সুখ লাভের একমাত্র সাধন।

বিষয় বৈরাগ্য মনে স্থান না পাইলে ত্যাগবুদ্ধি মনে উদয় হয়না। বিষয়াসক্ত ব্যক্তি স্বার্থপর। বিষয় বিরক্ত ত্যাগী ব্যক্তি পরার্থপর। সত্ত্বগুণ প্রধান মনুষ্যই ত্যাগী হইতে পারেন। দয়া, আর্জ্জব, বিনয়, সন্তোষ, সত্যনিষ্ঠতা প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি ত্যাগী মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করে।

রজঃ ও তমোগুণ প্রধান ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃ বিষয়াসক্ত হইয়া পড়ে। তাহার ফলে তাহারা প্রায়ই ধূর্ত্ত অবিনীত, কপট বিনয়ী, কপটাচারী, অসরল ও স্বার্থান্ধ হইয়া পড়ে।

সাংসারিক ব্যবহারেই দেখা যায়, যে পরিবারের কর্ত্তা নিজের স্বার্থ যথাসম্ভব ত্যাগ করিয়া পোষ্য পরিবারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য চেষ্টা করেন, সেই পরিবারের সকলেই সুখে থাকেন এবং এইরূপ সদাশয় কর্ত্তার প্রতি পরিজনবর্গ স্বভাবতই অনুরক্ত থাকে। পারিবারিক কলহ ঝঞ্ঝাট কিছুই উপস্থিত হয় না। গ্রামের লোক সেই পরিবারের প্রশংসা করিয়াই থাকেন।

যে পরিবারের কর্ত্তা স্বার্থান্ধ, নিজের বুঝ আঠার আনা বুঝেন, পোষ্যবর্গের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অল্প ত্যাগ স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত, সেই পরিবারের শান্তি নাই। পোষ্য পরিজন সর্ব্বদাই দুঃখে কালাতিপাত করে। সেই বাড়ী কলহ বিবাদের লীলা ক্ষেত্র।

কোন ব্যক্তি সাধু কি অসাধু পরীক্ষা করিতে হইলে দেখিতে হইবে তিনি কতদূর ত্যাগী। ত্যাগই সকল ধর্ম্মের মূল। ত্যাগের কষ্টি পাথরে কসিলেই বুঝা যায় তিনি কতদূর ধার্ম্মিক।

মহাভারতায় কুরু পাণ্ডবদিগের চরিত্র আলোচনা করিয়া দেখা যায় যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব, সাধু ও ধার্ম্মিক ছিলেন। কারণ তাঁহারা সকল বিষয়েই ত্যাগী ছিলেন।

কুরুকুলের ধৃতরাষ্ট্র ও তৎপুত্র দুর্য্যোধনাদি কেহই ত্যাগী ছিলেন না বলিয়া তাঁহারা অধার্ম্মিক। তাঁহারা অমানুষিক নৃশংস কাজ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

যুধিষ্ঠির ন্যায়তঃ সমস্ত রাজ্যের স্বত্বাধিকারী হইয়াও ত্যাগধর্ম্মে রত থাকিয়া অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রকে দিয়াছিলেন। পাপমতি স্বার্থপর দুর্য্যোধন তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া সমস্ত রাজ্য গ্রহণের লোভে নানারূপ পাপ উপায় অবলম্বনে পাণ্ডবদিগের জীবন নাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া কপট পাশায় ছল করিয়া যুধিষ্ঠির হইতে সমস্ত রাজ্য সম্পদ্ গ্রহণ করিয়া পাণ্ডবদিগকে বনবাসী করিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠির ও তদীয় ভ্রাতৃগণ নানারূপ ক্লেশ সহ্য করিয়াও ত্যাগধর্ম্মে অনুরক্ত থাকিয়া বনবাসের সর্ত্ত যথাযথ ভাবে প্রতিপালন করিয়া যথাসময় পুনঃ

দেশে আসিয়া তাঁহাদের অর্দ্ধরাজ্যের দাবী করিয়াছিলেন। পরিশেষে পঞ্চভ্রাতার জন্য পাঁচখানা গ্রাম মাত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য অর্দ্ধেক রাজ্য ত্যাগ করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। পাপমতি স্বার্থপর দুর্য্যোধন প্রতিজ্ঞা করিয়া পণ করিয়াছিলেন—"সূচ্যগ্রভূমিও বিনাযুদ্ধে দিবনা।"

দুর্য্যোধনের ত্যাগবুদ্ধি ছিলনা বলিয়া কুরু পাণ্ডবের মহাসমরে সমস্ত ভারত নিঃক্ষত্রিয় হইয়াছিল। এবং নিজেও শতভ্রাতার সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। পুরাণাদিতে নানা প্রসঙ্গে ত্যাগী যশঃ ও মহিমা কীর্ত্তিত আছে।

যম নিয়মাদি যে সকল উচ্চাঙ্গের সাধনা দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যের লাভ হয় বলা হইয়াছে তাহার মূলেও ত্যাগ। লোভী ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়ে মনুষ্যের মনকে ডুবাইয়া রাখিতে চায়। চঞ্চল মন ইন্দ্রিয়ের প্রলোভনে আসক্ত হইয়া বিষয় ভোগে মজিয়া থাকিতে চায়। ত্যাগবুদ্ধির প্রবল শক্তি দ্বারাই মন সংযমিত হইয়া বিষয়ভোগ হইতে প্রত্যাহৃত হয়। সংযমই ত্যাগ; ত্যাগী না হইলে সংযমী হওয়া যায় না। সংযমী না হইলে যোগ-সিদ্ধ হয় না। যোগ সিদ্ধ না হইলে পরম শ্রেয়ঃ লাভ হয় না। ত্যাগই আত্মোন্নতির মূল, ভব সমুদ্র পারের ত্যাগই কর্ণধার। ত্যাগই শান্তি লাভের প্রধান সাধন।

বিধবাদিগের বৈধব্য দশার সর্ব্ব প্রথমে সিঁথির সিন্দুর ত্যাগ; হাতের শাঁখা ত্যাগ, পরিধেয় পাড়দার কাপড় ত্যাগ, তিন সন্ধ্যা আহার ও আমিষ ভোজন ত্যাগ, গাত্রের অলঙ্কার ত্যাগ, মাথার চুল ত্যাগ, প্রভৃতি ত্যাগের ক, খ শিক্ষা। এইরূপ বাহ্যিক ত্যাগ হইতে মনে ক্রমে বিষয় পিপাসা ত্যাগের পথ ধরা যায়।

ত্যাগধর্ম্ম অতি পবিত্র ধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিবে না—ধর্ম্মের জন্য সমস্তই ত্যাগ করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইতে হইবে।

তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ ত্যাগী ছিলেন বলিয়া জগৎ-পূজ্য। তাঁহারা ভোগৈশ্বর্য্য কোনটাই আকাঙ্ক্ষা করিতেন না।

সংযমই তাঁহাদের ধন ছিল। তপস্যাই তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য ছিল। দধীচিমুনি পরোপকারের জন্য নিজদেহ ত্যাগ করিয়া অমর হইয়া আছেন।

সূর্য্যবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্র সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া জগতে অতুল কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অমৃতময়ী গীতার অনেক স্থলে ত্যাগের শক্তি ও মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ত্যাগের স্বরূপ উপলব্ধি জন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেশ সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—বেদান্ত মোক্ষ শাস্ত্র। গীতা মুমুক্ষু দিগেরই পাঠ্য। মুমুক্ষু না হইলে গীতা পাঠের অধিকার জন্মে না। ত্যাগী না হইলে মুমুক্ষু হওয়া যায় না।

নর-ঋষি অর্জ্জুন সর্ব্বদাই সত্ত্বস্থ এবং সংযমী ছিলেন। বিবেক বৈরাগ্য তাঁহার অঙ্গের ভূষণ ছিল। এইরূপ উত্তম অধিকারী জানিয়াই মহাযোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগতের হিতের জন্য যোগস্থ হইয়া অর্জ্জুনকে গীতামৃত পান করাইয়াছিলেন।

অর্জ্জুন যে স্বভাবতঃই ত্যাগী মহাপুরুষ, প্রথমেই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। অর্জ্জুন যুদ্ধার্থ প্রস্তুত, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার সারথি, যুদ্ধে জয়ী হইয়া রাজ্যলাভ করণার্থে তাঁহার যথেষ্ট শক্তি ছিল, যুদ্ধে জয়লাভ বিষয়ে তাঁহার মনে কোন প্রকার সন্দেহ ছিল না; কিন্তু রাজ্য ভোগ লাভের জন্য সংগ্রামে আত্মীয় জ্ঞাতি ও গুরুজন দিগকে বধ করিতে হইবে বলিয়া, ত্যাগবুদ্ধি অর্জ্জুনের মনে প্রবল হইয়াছিল।

অর্জ্জুনের উক্তি এই ;—

নচ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ॥

গীতা—১। ৩১॥

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্র পাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ॥

গীতা—১—৪৫।

যুদ্ধে স্বজন বধ করিয়া শ্রেয়ঃ দেখিতেছি না। হে কৃষ্ণ! আমি জয় চাহি না, রাজ্যও চাহি না, সুখও চাহি না। ৩১।

যদি শস্ত্রধারী ধার্ত্ত-রাষ্ট্রগণ প্রতীকার পরাঙ্মুখ নিরস্ত্র আমাকে যুদ্ধে বধ করে, তাহাও আমার অধিকতর হিতজনক হইবে। ৪৫।

মহানুভব গুরু দিগকে বধ না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজনও ভাল ; পরন্তু গুরুদিগকে বধ করিলে আমাদিগকে ইহলোকেই তাঁহাদের রুধিরাক্ত অর্থ কামাত্মক ভোগ্য বস্তু সকল উপভোগ করিতে হইবে অর্থাৎ ইহলোকেই নরক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। *

অর্জ্জুন অদ্বিতীয় মহাবীর ছিলেন, তিনি সর্ব্বত্র বিজয়ী বলিয়া তাঁহার নাম জিষ্ণু ছিল। সুতরাং ভীত হইয়া কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া উপরি উক্ত বাক্য বলিয়াছেন এরূপ অনুমান করা যায় না। ত্যাগ বুদ্ধির প্রেরণাতেই অর্জ্জুনের মনের ভাব যেরূপ হইয়াছিল, তাহাই বাক্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কি ত্যাগ বুদ্ধি ! এইরূপ ত্যাগ বুদ্ধি ছিল বলিয়া পাণ্ডবগণ জগজ্জয়ী হইয়াছিলেন। এরূপ বৈরাগ্যবান্ ছিলেন বলিয়া শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে গীতায় উপদেশ দিয়াছিলেন।

ত্যাগ ধর্ম্ম কঠিন ধর্ম্ম—আনায়াস সাধ্য নহে। অনেকের পক্ষেই ত্যাগী হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। সত্ত্ব গুণ প্রধান না হইলে কোন প্রকার ত্যাগেই লোকের ইচ্ছা জন্মে না।

যাঁহারা জ্ঞান (সাংখ্য) যোগী, তাঁহারা ত্যাগী—তাঁহারা পাপ ও পুণ্য উভয়ই ত্যাগ করিতে সমর্থ হন। তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে পাপ পুণ্য উভয়ই বন্ধনের হেতু সেইজন্য জ্ঞানযোগিগণ পাপ পুণ্য উভয়ই ত্যাগ করিয়া থাকেন।

---

* গুরুনহত্বাহি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
[illegible]

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত দুষ্কৃতে।

গীতা ২—৫০।

সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানযোগী ইহ জন্মেই সুকৃত (পুণ্য) দুষ্কৃত (পাপ) ত্যাগ করেন। ২—৫০।

সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানিগণ কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বোপদ্রব শূন্য মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হন।*

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্পার্থমনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিত প্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।।

গীতা—২—৫৫।

হে পার্থ! পরমানন্দ রূপ আত্মাতেই (অন্যবিষয়েতে নহে) স্বয়ং পরিতুষ্ট হইয়া অর্থাৎ আত্মারাম হইয়া যখন যোগী মনোগত সর্ব্ববিধ বিষয়াভিলাষ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করেন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া উক্ত হন।

যে ব্যক্তি প্রাপ্ত বিষয়ে উপেক্ষাশীল, অপ্রাপ্ত বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া সমস্ত অহঙ্কার বর্জ্জন পূর্ব্বক বিচরণ করেন সেই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। †

যিনি কর্ম্ম ও ফলের আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সতত সন্তৃপ্ত ও নিরালম্বন হইয়া থাকেন, তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিলেও কিছুই করেন না। অর্থাৎ তাঁহার কৃত কর্ম্ম বন্ধন হেতু নহে। যিনি কামনা শূন্য, কায়মনঃ সংযম সম্পন্ন এবং

---

* কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥

গীতা—২—৫১।

† বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তি মধিগচ্ছতি॥

গীতা—২।৭১।

সর্ব্ব প্রকার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি কর্তৃত্বাভিমান বর্জ্জিত হইয়া কর্ম্ম করিলে বন্ধন গ্রস্ত হন না।*

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মণি, সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্র মিবাম্ভসা ॥ ১০ ॥
যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্। ১২ ॥

গীতা—৫। ১০। ১২।

যিনি কর্ম্ম ফলের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া ঐ কর্ম্মফল ব্রহ্মে অর্পণ করেন, তিনি বন্ধনের হেতু পাপপুণ্যাত্মক কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না পদ্ম পত্রে যেরূপ জল লিপ্ত হয় না সেইরূপ। ভগবানের প্রতি নির্ভর করিয়া ফল কামনা পরিহার পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে পরম শান্তি (মোক্ষ) লাভ হয়।

ভগবদ্ভক্ত হইতে হইলে ভগবানের সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। তৎপর ভগবদ্রূপ ধ্যান করা আবশ্যক। ইহার পরে ভগবানে কর্ম্মফল ত্যাগ করিলে শান্তি লাভ করা যায়। সেইজন্য ভগবান্ উপদেশ করিয়াছেন ;—

সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্। ১১।
শ্রেয়োহি জ্ঞান মভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্ম ফল ত্যাগ স্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্। ১২ ॥
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ সমে প্রিয়ঃ। ১৬ ॥
শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ। ১৭ ॥

গীতা—১২—১১। ১২। ১৬। ১৭।

সংযত চিত্ত হইয়া সমস্ত কর্ম্মফল আমাকে অর্পণ কর।” অভ্যাস হইতে

* ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলা সঙ্গং নিত্য তৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম ॥

গীতা ৪—২০। ২১।

জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান হইতে কর্ম্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ; কারণ ত্যাগ হইতেই শান্তি লাভ হয়।

সর্ব্ববিধ কাম্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি বর্জ্জিত মদীয় ভক্ত আমার প্রিয়।

যিনি শুভ অশুভ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেইভক্ত আমার প্রিয়।

গুণাতীত ব্যক্তিও সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী হয়।

সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে।

গীতা—১৪।২৫

জীবন্মুক্ত ব্যক্তি গুণাতীত। তিনি সর্ব্ববিধ কর্ম্মফল ত্যাগী।

দানও ত্যাগধর্ম্মের অন্তর্গত। সেই দানই শ্রেষ্ঠদান, যে দানে দাতার কোনরূপ ফল কামনা নাই এবং যিনি দান গ্রহণ করিবেন তাহা হইতে দাতা কোন প্রকার উপকার পাওয়া আশা করেন না, এইরূপ সৎপাত্রে দান করাকে ভগবান্ **সাত্ত্বিক দান** বলিয়াছেন।

রাজসিক দান ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য নহে; সুতরাং তাহাতে ত্যাগের ফল পাওয়া যায় না।

তামসিক দান অবজ্ঞার সহিত অপাত্রে দেওয়া হয়। উহা ত্যাগ মধ্যেই গণ্য নহে। শ্রীভগবান্ গীতায় ১৭ অধ্যায়ে ইহার উপদেশ দিয়াছেন।

আত্মোন্নতি সাধনা সাপেক্ষ। সাধনা কর্ম্ম বিশেষ; কর্ম্মের কর্ত্তা আমি, এইরূপ অহঙ্কার বুদ্ধিকেই আসক্তি বলা হয়। কর্ম্ম করিলেই তাহার একটা ফল লাভ হয়। সুতরাং পুণ্যকর্ম্ম করিলে শুভ বা পুণ্যফল লাভ হয়। অশুভ বা পাপকর্ম্ম করিলে অশুভ বা পাপ ফল লাভ হয়। আমি কর্ম্মের কর্ত্তা এই অভিমান বা আসক্তি লইয়া কর্ম্ম করিলে, তাহার ফলে কর্ম্ম কর্ত্তার হয় সুখ হইবে, নয় দুঃখ হইবে।

পাপ পুণ্য সুখ ও দুঃখজনক কর্ম্মই জীবের বন্ধনের হেতু। নিরহঙ্কার হইয়া অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম না করিলে জীব সুখ দুঃখের অতীত হইতে পারে না। সুখ

দুঃখের অতীত না হইলে জীবের মুক্তি হয় না। কর্ম্ম করিলেই তাহাতে আসক্তি থাকে। অর্থাৎ কর্ম্ম আমি করিলাম, এরূপ অভিমান থাকে, ইহাকেই আসক্তি বলে। কর্ম্মই বন্ধনের হেতু ; তখন সকল প্রকার কর্ম্মত্যাগ করাই কোন কোন মনীষীদিগের মত। তাঁহাদের মতে সকল কর্ম্মই দোষযুক্ত।

সৎকর্ম্ম দ্বারাই চিত্ত সংযত হইয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। চিত্ত শুদ্ধ না হইলে ইন্দ্রিয় বশীভূত হয় না। জিতেন্দ্রিয় এবং শুদ্ধ চিত্ত না হইলে বিষয় বৈরাগ্য মনে স্থান পায় না ; বিষয় বৈরাগ্য না হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। তত্ত্ব-জ্ঞান না হইলে মুক্তি হয় না। যজ্ঞ, দান, তপস্যা এ সমস্তই সৎকর্ম্ম। অতএব চিত্তশুদ্ধি জন্য যজ্ঞ, দান তপস্যারূপ কর্ম্ম করিবে, উহা কখনই ত্যাগ করিবে না। অপর ঋষিগণের এইমত।

শ্রীভগবান্ কর্ম্ম সন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগ উভয়েরই উপদেশ দিয়াছেন। কাম্য কর্ম্মফল ত্যাগই কর্ম্ম সন্ন্যাস এবং কর্ম্মে আসক্তি অর্থাৎ এই কর্ম্ম আমি করিতেছি, এইরূপ অহঙ্কার বুদ্ধি মনে লইয়া কর্ম্ম করিলে এবং কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া কর্ম্ম করিলে যে কর্ম্ম বন্ধন হয়, সন্দেহ নাই। ফল কামনা না করিয়া এবং আসক্তি শূণ্য হইয়া কর্ম্ম করাকেই কর্ম্ম সন্ন্যাস বলে।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।

কাম্য কর্ম্ম ত্যাগকেই সূক্ষ্মদর্শীরা সন্ন্যাস বলিয়া থাকেন।

কর্ম্ম-যোগী না হইলে কর্ম্ম-সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। যিনি অনাসক্তভাবে ভগবানে কর্ম্মফল অর্পণ করেন, তিনিই কর্ম্ম-যোগী। অনাসক্ত ভাবে ভগবানে কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া কর্ম্ম করাই কর্ম্মের কৌশল। ইহাই কর্ম্মযোগ। যিনি কর্ম্ম-যোগ অবলম্বনে সকাম নিষ্কাম সমস্ত কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করেন, তিনিই ত্যাগী। এইরূপ সকাম নিষ্কাম সমস্ত কর্ম্ম-ফল-ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ।

সর্ব্ব কর্ম্ম ফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ।

গীতা ১৮—২

সমস্ত ফল ত্যাগকেই বিচক্ষণগণ ত্যাগ কহিয়া থাকেন।

এইজন্য নিষ্কাম হইয়া অনাসক্ত ভাবে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ইত্যাদি কর্ম্ম করাই শ্রীভগবানের নিশ্চয় মত।

হে পার্থ! কর্ত্তৃত্বাভিমান ও স্বর্গাদি ফল কামনা ত্যাগ করিয়া ভগবানের আরাধনা রূপ যজ্ঞাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্য—ইহা আমার প্রকৃষ্ট স্থির মত। * সকল মনুষ্যই কি এইরূপ ত্যাগ করিতে পারেন? স্বভাবের অধীন হইয়াই লোক কর্ম্ম করিয়া থাকে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের যে কোন গুণ যখন মনুষ্য দেহে প্রবল হইয়া উঠে, মনুষ্য অবশ হইয়া সেই গুণের প্রেরণায় কার্য্য করিয়া থাকে। গুণানুসারে ত্যাগও ত্রিবিধ হইয়া থাকে।

হে পুরুষ ব্যাঘ্র! ত্যাগ ত্রিবিধ কথিত আছে।

নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে, মোহবশতঃ নিত্যকর্ম্ম-ত্যাগ করিলে সেই ত্যাগ তামস নামে নির্দ্দিষ্ট।

কর্ম্মানুষ্ঠান কৃচ্ছ্রসাধ্য ইহা মনে করিয়া কায়িক ক্লেশের ভয়ে যে নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করা হয়, তাহা রাজস ত্যাগ। রাজস ত্যাগ দ্বারা প্রকৃত ত্যাগের ফল লাভ হয় না।

হে অর্জ্জুন! কর্ত্তব্যবোধে নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, কর্ম্মে আসক্তি ও কর্ম্ম-ফল-কামনা পরিত্যাগ করিবে, এই ত্যাগের নামই সাত্ত্বিক ত্যাগ। †

---

*এতান্যাপিতু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানিচ।
কর্ত্তব্যানীতিমে পার্থ নিশ্চিতং মত মুত্তমম্॥
গীতা = ১৮—৬

†ত্যাগোহি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃসংপ্রকীর্ত্তিতঃ। ৪॥
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ৭॥
দুঃখ মিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায় ক্লেশ ভয়াৎ ত্যজেৎ।
সকৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগ ফলং লভেৎ॥ ৮॥
কার্য্য মিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥ ৯॥
গীতা = ১৮ = ৪।৭।৮।৯

কর্ম্মফলে আসক্তি বা কর্তৃত্বাভিমান থাকিলেই কর্ম্মফল লাভের ইচ্ছা হয়। এইরূপ আসক্তি ত্যাগ করিয়া কৃতকর্ম্মের ফলত্যাগ করিলেই সাত্ত্বিক ত্যাগ হয়। সাত্ত্বিক ত্যাগের ফলে পরম পুরুষার্থ লাভ হয়। ত্রিসন্ধ্যোপাসনা, পূজা, ইষ্টমন্ত্র জপ প্রভৃতি শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত নিত্যকর্ম্মের আশু ফল দৃষ্ট হয়না,—উহাতে ফলাকাঙ্ক্ষাও হয় না। অথচ বিষয়াসক্ত ব্যক্তি বহির্ম্মুখ মনকে ফিরাইয়া উক্ত সন্ধ্যা, পূজা ও জপে মনোনিবেশ করিতে ক্লেশ বোধ করে। যজ্ঞে অগ্নির তাপ সহ্য করিতে ক্লেশানুভব করে, ইত্যাদি ক্লেশকর কর্ম্মানুষ্ঠানে অল্প বিস্তর ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। এইরূপ ক্লেশের ভয়ে নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করাই রাজসিক ত্যাগ, এইরূপ ত্যাগের ফল পাওয়া যায় না।

অজ্ঞানতা হেতু বিষয় ভোগে এবং বিষয় চিন্তায় মন মজাইয়া রাখিয়া অনেক ব্যক্তি নিত্যকর্ম্ম না করিয়া উহা ত্যাগ করে। অজ্ঞানতা ও মোহ বশতঃ এইরূপ নিত্যকর্ম্মের ত্যাগ—তামসিক ত্যাগ। ইহাতেও ত্যাগ ফল পাওয়া যায় না।

যাহারা অত্যন্ত বিষয়াসক্ত ও অজ্ঞান তাহারা বৈষয়িক কাজে এবং বৃথা আমোদ প্রমোদে দিন রাত্রি ব্যস্ত থাকে—সন্ধ্যাপূজা ইত্যাদি করিতে সময়ই পায় না, এইরূপ বিষয়াসক্ত মুগ্ধ ব্যক্তিই তামস ত্যাগী।

যাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী তাঁহারা গুরুকুলে পাঠ্যাবস্থায় বিষয় বিরক্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে গৃহস্থাশ্রম প্রবেশ না করিয়াই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। সেই আশ্রমেই ব্রহ্মচর্য্য সাধনা করেন।

যাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহাদের বর্ণ এবং আশ্রমোচিত সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকাম কি নিষ্কামভাবে করিলে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা হয়।

ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়া থাকাই বিধবার একমাত্র কর্ত্তব্য। স্ত্রী জাতির স্বাতন্ত্র্য নাই, অভিভাবকের অধীনে থাকাই হিন্দু শাস্ত্রের শাসন। বিধবা গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রম কিম্বা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিতে পারেন না, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের এইরূপ ব্যবস্থা। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া, আসক্তি শূন্য হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম

করিয়া যাওয়াই বিধবার ব্রহ্মচর্য্য পালনের প্রশস্ত উপায়। সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম করিয়াও ত্যাগী হওয়া যায়। আসক্তি ত্যাগ এবং কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করিয়া সাংসারিক সমস্ত কর্ম্ম নির্লিপ্ত ভাবে ভাবিলেই ব্রহ্মচর্য্যের শ্রেষ্ঠ ফল পরম শান্তি লাভ হয়।

নাটোরের রাণী ভবানী, পুঁঠিয়ার রাণী শরৎ সুন্দরী প্রভৃতি অনেক প্রাতঃস্মরণীয়া বিধবা রমণী রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন করিয়াও ব্রহ্মচারিণী ছিলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য জগতের অমর লেখক, প্রথিত যশা, ৺বঙ্কিমবাবু তাঁহার "দেবীচৌধুরাণী" পুস্তকে সংসারে থাকিয়া কিরূপে অনাসক্ত ভাবে কাজ করা যায়, অনাসক্তের লক্ষণ কি ; সংসার ধর্ম্ম পালন করা যে স্ত্রী জাতির শ্রেষ্ঠধর্ম্ম, তাহা অতি সুন্দর ও স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছেন। এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

দেবীচৌধুরাণী দ্বিতীয় খণ্ড—দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ;—"যে সংসারে গিন্নি, গিন্নিপনা জানে সে সংসারে কারও মনঃপীড়া থাকে না। মাঝিতে হাল ধরিতে জানিলে নৌকার ভয় কি ?"

"এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম, রাজত্ব স্ত্রী জাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্ম, এই সংসার ধর্ম্ম। ইহা অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়। দেখ কতকগুলি নিরক্ষর স্বার্থপর অনভিজ্ঞ লোক লইয়া আমাদের নিত্য ব্যবহার করিতে হয়। উহাদের কাহারও কোন কষ্ট না হয়, সকলে সুখী হয়, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার চেয়ে কোন্ সন্ন্যাস কঠিন ? ইহার চেয়ে কোন্ পুণ্য বড় পুণ্য ? আমি এই সন্ন্যাস করিব।"

"কামনা অর্থে আপনার সুখ খোঁজা—কাজ অর্থে পরেরসুখ খোঁজা। প্রফুল্ল নিষ্কাম অথচ কর্ম্ম পরায়ণা, তাই প্রফুল্ল যথার্থ সন্ন্যাসিনী।

"গৃহ ধর্ম্মে বিদ্যা প্রকাশের প্রয়োজন নাই, গৃহধর্ম্ম বিদ্বানেই সুসম্পন্ন করিতে পারে বটে, কিন্তু বিদ্যা প্রকাশের স্থান নয়। যেখানে বিদ্যা প্রকাশের স্থান নাই, সেখানে যাহার বিদ্যা প্রকাশ পায়, সে মূর্খ। যাহার বিদ্যা প্রকাশ পায় না সেই যথার্থ পণ্ডিত।"

দেবীচৌধুরাণী দ্বিতীয় খণ্ড—ষোড়শ অধ্যায় :—

"ভবানী ঠাকুর—"তুমি এখন কোন্ পথ অবলম্বন করিবে?"

প্রফুল্ল বলিল—"কর্ম্ম করিব। জ্ঞান আমার মত অশিক্ষিতের জন্য নহে

ভবানী ঠাকুর—"ভাল, ভাল, শুনিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু কর্ম্ম অনাসক্ত হইয়া করিতে হইবে।"

" তস্মাৎ অসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥ "

এখন অনাসক্তি কি? তাহা জান। ইহার প্রথম লক্ষণ ইন্দ্রিয় সংযম।

দ্বিতীয় লক্ষণ—নিরহঙ্কার ব্যতীত ধর্ম্মাচরণ নাই।

"ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যে সকল কর্ম্মকৃত তাহা আমি করিলাম, এই জ্ঞান অহঙ্কার।"*

"তৃতীয় লক্ষণ এই;—সর্ব্বকর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিবে।"

কোন বস্তু গ্রহণ না করিলে কি কোন বস্তু আহার না করিলে, সেই বস্তু ত্যাগ করা হইল মনে করা হয়। কিন্তু যে পর্য্যন্ত—সেই বস্তুর প্রতি অনুরাগ মনে মনে রহিয়া যায় সেই অবস্থায় প্রকৃত প্রস্তাবে সেই বস্তুর সম্পূর্ণ ত্যাগ হইল না। অনুরাগ বা আসক্তিতেই বন্ধন। অনাসক্তি বা বাসনা ত্যাগে, মুক্তি। অনেককেই গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসের চিহ্ন গ্রহণ করতঃ দণ্ড ধারণ, মস্তক মুণ্ডন কিম্বা জটা রক্ষা এবং কাষায় বস্ত্র পরিধান ও ভিক্ষালব্ধ অন্নে দেহ ধারণ করিতে দেখা যায়। কেহ কেহ বা যজ্ঞোপবীত পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া, যজ্ঞ, পূজা প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া থাকেন। ইহারাই সাধারণের নিকট দণ্ডী সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচিত।

এই সন্ন্যাসী বেশধারীর মধ্যে সকলেই কি প্রকৃত ত্যাগী?—সকলের মন হইতেই কি বিষয়াসক্তি সমূলে নষ্ট হইয়াছে? পৃথীপতি রাজার ছত্র দণ্ড এবং রাজত্বে

* প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

আসক্তি থাকাও যা, সন্ন্যাসীর চিহ্নধারীদিগের মলিন কন্থা এবং দণ্ড কমণ্ডলুতে আসক্তি থাকাও তা। রাজার রাজত্ব নষ্ট হইলে যেরূপ দুঃখ হয়, অনেক সন্ন্যাসীও দণ্ড কমণ্ডলু হারাইলে সেইরূপ দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন হন। এরূপ অবস্থায় সন্ন্যাস বেশ-ধারীর সর্ব্বত্যাগ হইল কৈ?

রাজর্ষি জনক জীবন্মুক্ত থাকিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন, পুরাণে বর্ণিত আছে। তিনি নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিতে পারিয়াছিলেন;—

"মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং নমে লাভো, নমে ক্ষতিঃ।"

মিথিলা নগরী জ্বলিয়া ভস্মীভূত হইলেও আমার লাভও নাই, ক্ষতিও নাই।

শ্রীভগবান্ গীতায় কেবল সন্ন্যাসচিহ্নধারী নিরগ্নি এবং অক্রিয়সন্ন্যাসীদিগকে কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন;—

যে পুরুষ কর্ম্ম ফলে আসক্ত না হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম আচরণ করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী অগ্নি হোত্রাদি বৈধ ক্রিয়া এবং গমনাদি সামান্য ক্রিয়া ত্যাগ করিলেই যে সন্ন্যাসী বা যোগী হওয়া যায় তাহা নহে।*

সাধু গৃহস্থদিগের কর্ম্মের গণ্ডী নির্দ্দিষ্ট স্থান ব্যাপিয়া, তিনি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক লোকের হিতাহিত চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন। যিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী তাঁহার নিজের জন্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিছুই নাই। অথচ তাঁহার কর্ম্মের গণ্ডী বিশ্বব্যাপী। তাঁহার কর্ম্মের প্রবৃত্তি অনন্ত বিশ্বের প্রাণীর উপকারার্থ।

যিনি ত্যাগী, তিনি জগৎ পূজ্য; ত্যাগেই শান্তি লাভ হয়।

তুমি ত্যাগী হইতে আজীবন চেষ্টা করিবে।

আমরা জন্ম হইতে যে সমস্ত বিষয় ভাল বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, এবং যে সমস্ত বিষয় মন্দ বলিয়া উহা হইতে দূরে থাকিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, ঐ

---

* অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগীচ ন নিরগ্নি ন চাক্রিয়ঃ॥
গীতা—

সমস্ত অভ্যস্ত ভাল মন্দ বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া উহা ত্যাগ করা বড়ই কঠিন। দৃঢ়তার সহিত সংযম শিক্ষা না করিলে অভ্যস্ত বিষয় ত্যাগ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। আত্মোন্নতি সাধন জন্য নিষ্ঠার সহিত সংযম শিক্ষা করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যের বিঘ্নকারী—আত্মোন্নতির বিরোধী অভ্যস্ত বিষয় সমস্ত ক্রমে ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলে ত্যাগী হওয়া যায়।

ব্রহ্মচর্য্য সাধনার সহজ পন্থা।

সংসারে সকল শ্রেণীর মনুষ্যের, পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, জ্ঞানদাতা গুরু এবং জন্মভূমিকে পূজনীয় দেবতা জ্ঞান করা শাস্ত্রের উপদেশ।

সকাম কর্ম্মিগণ, ইষ্টাপূর্ত্ত যাগ এবং তপস্যা দ্বারা স্বর্গভোগ কামনা করিয়া থাকেন। কিন্তু ঃ—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ।

মাতা সকলেরই শ্রেষ্ঠ সুহৃদ্ এবং পরম পূজনীয়া ; পতিই নারীর পরম দেবতা।

যাঁহারা আরাধ্য দেবতা জ্ঞানে, জন্মভূমির সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারা ধন্য ও পবিত্র। তাঁহারা সংযমী এবং ত্যাগী। তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা হইতেছে। তাঁহারা সেই সাধনার বলে, জননায়ক হইয়া থাকেন। তাঁহাদের অন্তঃকরণে, দেশাত্মবুদ্ধি ফুটিয়া উঠে। তখন তাঁহারা জন্মভূমির কল্যাণের জন্য, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে সমর্থ হন। তাঁহাদের পরার্থপরতা জীবনের ব্রত হইয়া থাকে। নির্দ্দোষ সম ব্রহ্মভাব তাঁহাদের অন্তঃকরণে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দেবপ্রাণ মহাত্মগণ, যে, ক্রমে পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারেন, তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই।

ভগবান্ বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে সকাম কর্ম্ম করিলে চিত্তশুদ্ধি হয়। তৎপরে ক্রমে ভগবদ্ ভক্তি লাভ করতঃ জীব কৃতার্থ হইয়া যায়।

জননী মূর্ত্তিমতী পরব্রহ্ম স্বরূপা। মনে এইরূপ দৃঢ় ধারণা করিয়া সেই পরমারাধ্যা জননীর প্রীত্যর্থে সকল কাজ করিলে, ব্রহ্মচর্য্যের উৎকৃষ্ট সাধনা হয়। এই গুরুতর বিষয়টী একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি।

যাহাতে জননী প্রীতা, তৃপ্তা ও পরিতুষ্টা হন, পুত্রের সেইরূপ কাজ করা কর্ত্তব্য। যে কাজ করিলে মাতার অপ্রীতি ও দুঃখ জন্মে, কোন পুত্রেরই সেইরূপ কাজ করা কর্ত্তব্য নহে। মাতৃভক্ত হওয়া পুত্র মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রের উপদেশ ঃ—"পিতৃদেবো ভব," 'মাতৃদেবো ভবো' "পিতা তোমার দেবতা হউন" "মাতা তোমার দেবতা হউন।"

মাতাকে সর্ব্বদা প্রীতা ও সন্তুষ্টা রাখিতে হইলে, পুত্রের সকল প্রকার অবৈধ কাজ করার প্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া যায়। :—

(১) পুত্র যদি মিথ্যাবাদী হয়, মা, "পুত্র মিথ্যাবাদী" এই কথা লোকের নিকট শুনিলে, কিংবা পুত্রের মিথ্যা ব্যবহার নিজে বুঝিতে পারিলে অবশ্যই তিনি নিতান্ত অপ্রীতা ও দুঃখিতা হইবেন। সুতরাং মাতাকে প্রীতা ও সুখী রাখিতে হইলে, পুত্রের মিথ্যা ব্যবহার করা রহিত হইয়া যায়।

(২) পুত্র যদি চুরি করে, এবং সেই কথা ক্রমে প্রচার হইয়া, মার কর্ণ-গোচর হয়, মা অত্যন্ত ক্লিষ্টা ও দুঃখিতা হইবেন। মাকে সুখী ও প্রসন্না রাখিতে হইলে, পুত্রের চুরি করার পথ বন্ধ হইয়া যায়।

(৩) পুত্র যদি পরহিংসা পরনিন্দা এবং পরপীড়া পরায়ণ হয়, মা, এই সংবাদ শুনিয়া বড়ই দুঃখিতা ও অনুতপ্তা হইবেন। মাকে সন্তুষ্টা রাখিতে হইলে পুত্রের কখনই এই সকল গর্হিত কাজ করার ইচ্ছা থাকিবে না।

(৪) পুত্র যদি কাম ক্রোধ ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া শিশ্নোদর পরায়ণ লম্পট হইয়া পড়ে, মার দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। মাতাকে প্রীতা ও সন্তুষ্টা রাখিতে হইলে, পুত্রকে মনের এই সমস্ত কুপ্রবৃত্তি দমন করিয়া শিষ্ট ও সাধু হইতে হইবে।

(৫) পুত্র যদি দয়ালু, পরহিতৈষী, বিদ্বান্, বিনয়ী, সরল, এবং দেব দ্বিজ গুরু ও প্রাজ্ঞ লোকের সম্মানকারী, সাধুসঙ্গসেবী, গুণবান্ এবং চরিত্রবান্ হয়, মাতার আনন্দের পরিসীমা থাকিবে না।

সেইরূপ, পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সাক্ষাৎ দেবতা ভাবিয়া তাঁহাদের প্রীতির জন্য সমস্ত কাজ করিলে, শাস্ত্রোপদিষ্ট ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা যন্ত্রচালিতের ন্যায় হইয়া থাকে।

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ।"

পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই পরম তপস্যা, পিতা প্রীত হইলে, সমস্ত দেবতা প্রীত হন। মাতৃ দেবীও এই বচনের বিষয়ীভূতা।

এইরূপ উপাসনাকে প্রতীক উপাসনা বলে। ব্রহ্মজ্ঞানে দেবতা মূর্ত্তি পূজা করিলেও ব্রহ্মোপাসনা হয়। ব্রহ্মচর্য্যের ইহাই সহজ সাধনা। স্ত্রীজাতির পতি-সেবাই ব্রহ্মচর্য্য।
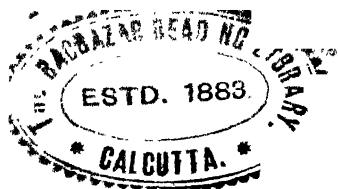
ব্রহ্মচর্য্যের শেষ বাঞ্ছনীয় ফল ভগবদ্‌ভক্তি।

[যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি।]

ভক্তি।

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।"

শাণ্ডিল্য-সূত্র।

ভগবানে পরম অনুরক্ত হওয়া বা মনে প্রাণে ভগবান্‌কে ভালবাসাই ভক্তি। আমরা ধন, মান, প্রভুত্ব, বিষয় ভোগ ভালবাসি। প্রাণ ভরিয়া ভগবান্‌কে ভালবাসি কৈ? মনের কিরূপ অবস্থা বা ভাব হইলে ভগবান্‌কে ভালবাসা যায়? যাহারা বিষয় ভালবাসে, তাহারা ভগবান্‌কে ভাল বাসিতে পারে কি? বিষয়াসক্ত জীব ভগবান্‌কে ভালবাসার কথা দূরে থাকুক তাঁহাকে জানিতেও চায় না; পারেও না। ভগবান্‌কে জানিতে হইলে মনের আসক্তি ও ভালবাসা ভগবান্‌কেই দিতে হইবে। আর মনে করিতে হইবে—ভগবান্‌ই আমার এবং জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা, পিতামহ; ভগবান্‌ই আমার এবং জগতের শেষ গতি; ভগবান্‌ই আমার এবং জগতের প্রভু, প্রতিপালক, শুভাশুভ দ্রষ্টা, জগতের আশ্রয়, রক্ষক এবং পরম সুহৃৎ। তিনিই সংহর্ত্তা এবং তিনিই লয়ের স্থান। ভগবান্ ভিন্ন আমার আর অন্য আশ্রয় কিছুই নাই

আমি যে পরিমাণে আমার মনের অনুরাগ বা আসক্তি ভগবানের প্রতি ন্যস্ত করিব, ভগবান্ সেই পরিমাণে আমার হইয়া দাঁড়াইবেন। আমি যে ভাবে এবং যে পরিমাণে ভগবানের শরণাপন্ন হইব, ভগবান্ সেই ভাবে, সেই পরিমাণে আমাকে তাঁহার পদাশ্রয় দিবেন।

ভক্তি উপাসনা মূলক। ঈশ্বর বা ইষ্টদেবের পূজা, ধ্যান, সেবা এবং তাঁহার নাম ও লীলা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও তাঁহার নাম জপ এবং গুণগান প্রভৃতি দ্বারা ভজনা

করিতে করিতে, মনে তৎপ্রতি ভালবাসা অঙ্কুরিত হয়। নিরন্তর এইরূপ ভজনার অনুশীলনে মনে ক্রমে ভগবদ্বিষয়িণী শ্রদ্ধা, ও তাঁহার নামে রুচি উৎপন্ন হইয়া ভগবানের প্রতি গাঢ় ভালবাসা বা অনুরাগ জন্মে। এরূপাবস্থায় ভগবানে সমস্ত কর্ম্মফল অর্পণ এবং আত্ম-নিবেদন করিতে পারিলে মনে অহৈতুকী ভক্তির উদয় হয়। ভক্তির ইহাই সাধারণতঃ সার তত্ত্ব।

ভক্তি সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন মনে উদয় হয়। (১) ভক্তি জ্ঞান সাপেক্ষ কি না? (২) জ্ঞান ভক্তি সাপেক্ষ কি না? অর্থাৎ বিনাজ্ঞানে যোলআনা ভক্তি হইতে পারে কি না? আবার ভক্তি ভিন্ন জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হয় কিনা? ভক্তি ছাড়িয়া দিলে কেবল জ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ হয় কিনা? আবার জ্ঞান ছাড়িয়া দিয়া কেবল ভক্তিদ্বারা মুক্তি লাভ হয় কি না?

এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিবার পূর্ব্বে মুক্তির স্বরূপ কি ইহা সংক্ষেপতঃ বুঝা প্রয়োজন। সেইজন্য মুক্তির স্বরূপ অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

মুক্তির স্বরূর কি?—দুঃখেব অত্যন্ত নিবৃত্তি জীবের পরম পুরুষার্থ। দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি কিসে হয়?—সংসাব বন্ধন মুক্ত হইলেই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। জন্ম, মৃত্যুর হাত এড়াইতে না পাবিলে সংসার বন্ধন যায় না—দুঃখও দূর হয় না। জন্ম মৃত্যু রহিত হইতে পারিলে, সংসার বন্ধন চলিয়া যায়—দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। ইহাই মুক্তি!

মুক্তির উপায় কি? "জ্ঞানান্ মুক্তিঃ।" জ্ঞান লাভ হইলেই মুক্তি লাভ হয়। ইহা সর্ব্ব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। মুক্তি বা দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির উপায় বা প্রধান সাধন—জ্ঞান। সকল শাস্ত্রেই বলে।

ষড় দর্শনে মুক্তি তত্ত্বের আলোচনা এবং মীমাংসা হইয়াছে। ষড় দর্শনে ঈশ্বর উপাসনার বা ভক্তিব উল্লেখ আছে কি না?

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মতে, পদার্থের জ্ঞান হইলেই মুক্তি—দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। ভগবানের প্রতি বিশেষ ভাবে ভক্তির কোন কথা ন্যায় কি বৈশেষিক দর্শনে নাই।

সাংখ্য দর্শনের মতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের পৃথক্ রূপে জ্ঞান হইলেই মুক্তি। সাংখ্যদর্শন, ঈশ্বর-নিরপেক্ষ। ভক্তির কথাই হইতে পারে না।

মীমাংসা দর্শনে কর্ম্মই প্রধান যজ্ঞদ্বারা অক্ষয় স্বর্গলাভই পরম পুরুষার্থ। এই স্বর্গ-সুখে দুঃখ নাই; দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি।

"যন্নদুঃখেন সম্ভিন্নং নচ গ্রস্তমনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎসুখম্ স্বঃপদাস্পদম্॥"

মীমাংসা দর্শন।

সেই স্বর্গ-সুখে দুঃখের মিশ্রণ নাই; সেই সুখ দুঃখে পরিণত হয় না; ইচ্ছামত সুখ পাওয়া যায়। দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। ইহাই মুক্তি। কর্ম্মের জ্ঞান, কর্ম্মে নিষ্ঠা হইলেই, সেই কর্ম্ম দ্বারা অক্ষয় স্বর্গ সুখ লাভ হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব কর্ম্মাধীন; অতএব — "নমস্তৎ কর্ম্মভ্যঃ" সেই কর্ম্মকেই নমস্কার। মীমাংসা দর্শনে ভগবানে ভক্তির কোন কথা বিশেষ ভাবে নাই।

পাতঞ্জল দর্শনে ঈশ্বরোপাসনা স্বীকৃত হইয়াছে। এইদর্শনে যোগ সাধন সম্বন্ধে বিস্তৃত উপদেশ আছে। পাতঞ্জল দর্শন যোগশাস্ত্র। সাংখ্য দর্শনের সমস্ত তত্ত্ব স্বীকার করিয়া, তাহার জ্ঞান লাভের জন্য যোগ সাধনা করাই পাতঞ্জল দর্শনের উপদেশ। যোগ সিদ্ধ হইলে, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় — মুক্তি লাভ হয়। যোগ সিদ্ধ হইবার যত প্রকার উপায়, ক্রম বা বিধি পাতঞ্জল দর্শনে আছে, তন্মধ্যে "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা"— ঈশ্বর প্রণিধান ও একটী উপায়। ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কোন কথার উল্লেখ নাই।

বেদান্তদর্শনে, পরমাত্মা এবং সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম বিষয়ে অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বের আলোচনা এবং মীমাংসা হইয়াছে। উপনিষদের প্রকৃত অর্থের বিচার ও সিদ্ধান্ত হইয়াছে। সগুণ ও নির্গুণ উপাসনার কথাও আলোচিত হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে কোন কথা স্বতন্ত্রভাবে থাকা স্পষ্টতঃ বুঝা যায় না। যাঁহারা বৈদান্তিক পণ্ডিত তাঁহারা এসম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন। আমার মত মূর্খ লোকের এসম্বন্ধে

সনির্ব্বন্ধ কোন কথা বলা সঙ্গত নহে। ব্রহ্ম প্রাপ্তির ফল—ক্রম মুক্তির কথাও বেদান্তে আলোচিত হইয়াছে।

সমস্ত দর্শন শাস্ত্রেই যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে প্রতিপাদ্য তত্ত্ব কথার আলোচনাও সিদ্ধান্ত হইয়াছে। এইজন্য সমস্ত দর্শনশাস্ত্রকেই পণ্ডিতগণ তর্কশাস্ত্র বলিয়াথাকেন। তজ্জন্যইবোধ হয় বৈষ্ণব ভক্তগণ বলিয়াছেন;—ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর" বৈষ্ণবভক্তদিগের এই উক্তি দ্বারা দর্শনশাস্ত্রের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে।

বেদান্ত মোক্ষ শাস্ত্র ; শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাও মোক্ষ শাস্ত্র—বেদান্ত দর্শনেও তদ্ভাষ্যে প্রমাণ স্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কর্ম্ম যোগ, ভক্তি যোগ এবং জ্ঞান যোগের উপদেশ আছে। জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেশ কি ?— সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি ; -- ভগবদ্গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে , ভগবদ্ভাব প্রাপ্তিই মুক্তি। ইহাতেই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। ভক্তি ও জ্ঞান উভয়ই ব্রহ্ম বা ভগবদ্ভাব-প্রাপ্তির উপায়। ভগবদ্ভাব প্রাপ্তি জীবের পরম পুরুষার্থ বা মুক্তি। ইহাই গীতার সিদ্ধান্ত।

ভগবদ্ভাব কি ? — ভগবানের সগুণ ও নির্গুণ ভাব, ক্ষরভাব, অক্ষর ভাব এবং অব্যক্ত হইতে ও অব্যক্ত সনাতন ভাব। ভাব = সত্তা, বিভূতি, স্বরূপ স্বভাব এবং সাধর্ম্ম্য। সৎ, চিৎ, আনন্দ ভগবানের স্বরূপ। জীব এইভাব প্রাপ্ত হইলে মুক্তি লাভ করে।

বহু জ্ঞান রূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্র হইলে জীবগণ আমার ভাব প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানযোগী ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হয়।*

যোগ যুক্ত মুনি অচিরাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। যোগসাধনা দ্বারা সিদ্ধ যোগী ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হয়।†

* বহবো জ্ঞান তপসা পূতা মদ্ভাব মাগতাঃ ॥
৪-১০

† " যোগ যুক্তো মুনির্ব্রহ্মনচিরেণাধিগচ্ছতি ! "
গীতা = ৫—৬

আমার ভক্ত এই রূপ জ্ঞান (ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান) লাভ করিয়া আমার ভাব প্রাপ্ত হয়।*

যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান দ্বারা ভগবদ্ভাব প্রাপ্তি এবং তাহার ফলে সংসার বন্ধন —জন্ম মৃত্যুর হাত এড়াইয়া দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি—মুক্তি লাভ হয়। এই উপদেশ গীতার নানা স্থানে আছে।

ভগবদ্ভাব প্রাপ্তি না হইলে বা ভগবান্‌কে না পাইলে সংসার বন্ধন যায় না, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না,—মুক্তি হয় না।

শ্রীভগবান্ গীতায় যে যে স্থলে "আমি" "আমার" এবং "আমাকে"—"অহং মাং, মম," এই বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন সেই সেই স্থলের কোনস্থানে ভগবানের সগুণভাব বা বিভূতি ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন ঈশ্বরভাব এবং কোনস্থলে "নির্গুণ নিরুপাধিক নিত্য-নিরঞ্জন অব্যক্ত সনাতন ভাব, শ্লোকার্থানুসারে বুঝিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মতের বিশেষভাবে, কোন উল্লেখ নাই। সাংখ্য পাতঞ্জল ও মীমাংসা দর্শনের মতের উল্লেখ আছে।

মীমাংসকাচার্য্যগণ বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও যজ্ঞ প্রভৃতি সকাম কর্ম্মের পক্ষপাতী, সকাম কর্ম্ম ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় নহে। সকাম কর্ম্মে মুক্তিলাভ হয়না। বেদের কর্ম্মকাণ্ড সংসার প্রতিপাদক ত্রিগুণাত্মক ; কর্ম্মকাণ্ড ত্রয়ীধর্ম্মানুমোদিত। ভগবান্ বলিয়াছেন ;—"যাহারা অ-পণ্ডিত, বেদের অর্থ-বাদে রত, যাহারা কামাত্মা, জন্ম-কর্ম্ম-ফল-প্রদ ভোগৈশ্বর্য্য লাভ করাই যাহাদের উদ্দেশ্য, তাহা ভিন্ন অন্য কিছু লাভ যোগ্য শ্রেয়ঃ আছে বলিয়া মনে করে না, তাহাদের সেই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বা জ্ঞান সমাধির অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপযোগী নহে।" †

---

* "মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপ পদ্যতে ॥"
গীতা ॥ ১৩—১৮ ॥

† যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্য বিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্ম কর্ম্ম ফল প্রদাম্।
ক্রিয়া বিশেষ বহুলাং ভোগৈশ্বর্য্য গতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥

বিচারহীন পুরুষগণ যে অর্থবাদের কথা বলিয়া থাকেন, তাহা আপাততঃ রমণীয় বলিয়া বোধ হয়। যাহারা বৈদিক ফল শ্রুতির প্রশংসা বাক্যের অনুগামী, বিবিধ ফল প্রকাশক শ্রুতি বাক্যাবলি যাহাদের আনন্দের কারণ, তাহারা স্বর্গাদি ফল জনক কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই অঙ্গীকার করেনা। যাহারা কামনাযুক্ত, স্বর্গলাভই যাহাদের বিবেচনায় পরম পুরুষার্থ,তাহারা জন্ম,কর্ম্ম ও ফলপ্রদ বেদবাক্য এবং ভোগ ঐশ্বর্য্য লাভের উপায় ভূত বৈদিক ক্রিয়া কলাপের প্রশংসা সূচক বাণী ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। ভোগৈশ্বর্য্যানুরক্ত এবং প্রলোভন কর রমণীয় বাক্যে আকৃষ্ট-চিত্ত মনুষ্যদিগের পরমেশ্বরে আদৌ একাগ্র নিষ্ঠারূপ সমাধি অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অভ্যুদয় হয় না।

ভগবান্ বলিয়াছেন, "বেদত্রয়োক্ত কর্ম্মাসক্ত উপাসকগণ (ইন্দ্রাদিরূপে) যজ্ঞে আমাকেই পূজা করিয়া সোমপান করতঃ নিষ্পাপ হয় এবং স্বর্গ-প্রার্থনা করাতে পুণ্যফল স্বরূপ দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় উত্তম দেবভোজ্য বস্তু সকল ভোগ করে। তাহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্ত্যলোকে পুনঃ পুনঃ নিপতিত হয়। এইরূপে যাহারা কামনাসক্ত হইয়া দেবধর্ম্মের অনুগত হয় তাহারা সংসারে গমনাগমন করিয়া থাকে।" *

ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক (ব্রহ্মলোক) এই সাতটী ক্রমোচ্চ লোক। ভূলোক বা পৃথিবী কর্ম্মভূমি। আর

ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াঽপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

গীতা = ২—৪২।৪৩,৪৪

ত্রৈবিদ্যামাং সোমপাঃ পূত পাপাঃ যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তেপুণ্যমাসাদ্য:সুরেন্দ্রলোক-মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবিদেব ভোগান্ ॥ ২০ ॥
তেতং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্ম মনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১ ॥

গীতা = ৯—২০।২১

সমস্তই ভোগ ভূমি। দেখা যাইতেছে সকাম কর্ম্মীরা স্বর্লোক বা স্বর্গলোক প্রার্থনা করেন বলিয়া সেই লোক পর্য্যন্ত উঠিতে পারেন। ইহার উর্দ্ধে যাইতে অধিকার পান না। স্বর্গলোক হইতে পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্তালোকে ফিরিয়া অসিতে হয়। সগুণ ব্রহ্মোপাসক সত্য বা ব্রহ্মলোকে যাইতে পারেন। তথায় তত্ত্ব জ্ঞান লাভ বা ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হইলে পুনরাবর্ত্তন হয় না। ভগবদ্ভাব প্রাপ্তি না হইলে সেই সত্য লোক বা ব্রহ্মলোক হইতেও ফিরিয়া আসিতে হয়। সকাম কর্ম্মী দিগের পিতৃযান বা কৃষ্ণা গতি লাভ হয়। ব্রহ্মোপাসক দিগের দেবযান বা শুক্লাগতি লাভ হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন ;—হে অর্জ্জুন ! ব্রহ্মলোক হইতেও (যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই) জীবগণ পুনরায় ভূলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু হে কৌন্তেয় ! আমাকে জানিলে লোকের পুনর্জ্জন্ম হয় না।*

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—রজঃ প্রধান হইয়াই মনুষ্য জন্ম লাভ হয়। কর্ম্ম করাই সেইজন্য মনুষ্যের স্বভাব। কর্ম্মফলের আসক্তিতেই বন্ধন বা সংসার। কৌশল করিয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম ফলের বন্ধন হয় না—গতা গতি হয় না।

কর্ম্মের কৌশল কি ?—ভগবদ্ভক্ত হইয়া সমস্ত কর্ম্ম ফল ভগবানে অর্পণ করা। অনাসক্ত ও নিষ্কাম হইয়া কর্ত্তব্যবোধে যজ্ঞার্থ কর্ম্মকরিয়া যাওয়া। ইহাই কর্ম্মের কৌশল বা কর্ম্মযোগ। কর্ম্ম—কর্ম্মযোগে পরিণত করিলে, কর্ম্মবন্ধন হয় না। কর্ম্ম জন্য ভোগ অনিত্য। নিষিদ্ধ কর্ম্মেরন্যায় সকাম কর্ম্মও পরিত্যাগ করিবে।

পাতঞ্জল দর্শনে যোগের যে সমস্ত উপদেশ আছে, শ্রীভগবান্ গীতায় তৎসমস্ত অবলম্বন করিয়া ষষ্ঠাধ্যায়ে ধ্যান যোগ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেইজন্য এই অধ্যায়ের নাম ধ্যানযোগ।

* "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

গীতা = ৮—১৬।

চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া কেবল কর্ম্মসন্ন্যাস করিলে মুক্তিলাভ হয় না। ধ্যান যোগে ধ্যেয় বস্তুর ধারণা করিতে না পারিলে ভগবদ্ভাব প্রাপ্তি হয় না—মুক্তি হয় না। সেই ধ্যেয়বস্তু ভগবান্ বা পর-ব্রহ্ম। শ্রীভগবান্ ধ্যানযোগের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন।

যোগী, তপস্বী, জ্ঞানী এবং কর্ম্মী হইতে শ্রেষ্ঠ; অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি যোগযুক্ত হইবে।*

যোগীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

যে যোগী শ্রদ্ধা সহকারে আমাতে অর্পিত-চিত্ত হইয়া আমাকে ভজনা করেন, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী। ইহাই আমার মত।+

শ্রীভগবান্ সাংখ্য দর্শনের মতের খুবই আদর করিয়াছেন। সাংখ্যজ্ঞান শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্য জ্ঞানের উপদেশ করিয়া অর্জ্জুনকে ব্রহ্ম বিদ্যায় প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন।

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।

গীতা, ৪—৩

জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র বস্তু আর নাই। জ্ঞান = সাংখ্যজ্ঞান।

তিনি আরও বলিয়াছেন;—সাংখ্যজ্ঞানে যে স্থান লাভ করা যায় কর্ম্মযোগেও সেই স্থান লাভকরা যায়। অতএব সাংখ্য যোগ এবং কর্ম্মযোগ যিনি এক দেখেন, তিনিই পণ্ডিত। তিনি উভয়েরই ফল যে এক তাহা লাভ করেন।

---

* তপস্বিভ্যোঽধিকোযোগী জ্ঞানিভ্যোঽপিমতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকোযোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥

গীতা = ৬—৪৬

+ যোগিনামপিসর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যোমাং সমেযুক্ততমোমতঃ॥

গীতা — ৪৭

সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি-পুরুষের পৃথক্ জ্ঞান মুক্তির হেতু বলা হইয়াছে. শ্রীভগবান্ গীতায় ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের বিবেক জ্ঞান, তাঁহার অনুমোদিত এরূপ বলিয়াছেন।

গীতা মোক্ষশাস্ত্র। ভগবদ্ভক্তি বা ভগবদ্ভাবপ্রাপ্তি মুক্তির উপায় বলা হইয়াছে। ভক্তির ও জ্ঞানের সমুচ্চয়ে মুক্তিলাভই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়: জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হয় না—ভক্তিভিন্ন পূর্ণজ্ঞান হয় না। ইহা গীতার মত। অতএব মুক্তি সম্বন্ধে ভক্তি ও জ্ঞান উভয়ই কারণ।

মুক্তির কারণ—ভক্তি ও জ্ঞান এতদুভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? এসম্বন্ধে ভাষ্যকারদিগের মধ্যে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে।

জ্ঞানী ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলেন, জ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ। ভক্তি—পরম্পরা সাধন মাত্র।

ভক্ত ভাষ্যকার শ্রীধর স্বামী বলেন;—ভক্তিই মুক্তির কারণ। জ্ঞান ভক্তির অবান্তর ব্যাপার মাত্র।

জ্ঞানী ভাষ্যকারদিগের গীতা ব্যাখ্যা একরূপ, ভক্ত ভাষ্যকারদিগের ব্যাখ্যা অন্যরূপ। এসম্বন্ধে আমার ন্যায় ভক্তি ও জ্ঞানহীনের আলোচনা ধৃষ্টতা মাত্র।

জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই মুক্তিলাভের উপায় হইলেও শ্রীভগবান্ মুক্তি লাভের উপায় সম্বন্ধে কর্ম্মযোগ সাংখ্যযোগ এবং ধ্যান যোগের আবশ্যকতার উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন;—কেহবা ধ্যানযোগে এই দেহেই মনের দ্বারা আত্মাকে দেখেন, কেহ বা সাংখ্যে অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের পার্থক্য আলোচনা দ্বারা, কেহ বা অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা, কেহ বা নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ দ্বারা, আত্মাকে দেখেন। *

---

* ধ্যানে নাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্ম যোগেন চাপরে॥

গীতা = ১৩—২৪

শ্রীভগবান্ আরও বলিয়াছেন ;—অনেকে আবার এই প্রকার আত্ম-দর্শনের কৌশল না জানাতে অন্যের নিকট শ্রবণ করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারাও শ্রদ্ধা সহকারে উপদেশ শ্রবণ পরায়ণ হইয়া (ক্রমে) সংসার উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়। *

এ স্থলে উপাসনা অর্থে ভগবানেরই উপাসনা বুঝিতে হইবে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ধ্যানযোগ, জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ দ্বারা ভগবানেরই উপাসনার কথা বলাহইয়াছে। ভক্তিভিন্ন উপাসনা হয় না। ভক্তি দ্বারা যে কোন উপায়ে ভগবানের উপাসনা করাই গীতার অভিপ্রায়।

যে বস্তু জানিলে সকল বস্তু জানা হয়, সেই বস্তুই ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্। ব্রহ্মই জ্ঞেয়—জানিবার বস্তু। তিনি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন। সাধারণ চক্ষুতে তাঁহাকে দেখা যায় না। দিব্যচক্ষুর আবশ্যক। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা তিনি জ্ঞেয়।

ব্রহ্মই পরমাত্মা রূপে ধ্যেয়। ধ্যান ধারণায় তাঁহাকে জানা যায়। যাঁহারা বিষয়ের ধ্যান করেন, তাঁহাদের বিষয় গোচর জ্ঞান হয় ; ব্রহ্মের জ্ঞান হয় না। পরমাত্মা পরব্রহ্মই ধ্যেয় ; ধ্যান ও ধারণা দ্বারা তাঁহার জ্ঞান হয়।

অনিত্য বিষয়লাভে লোকের ভোগ পিপাসা দূর হয় না। বিষয় লাভে মনের তৃপ্তি হয় না। যাঁহাকে লাভ করিলে মনে অন্য কোন লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে না, উহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভ মনে হয়। ভগবান্ পরমাত্মা বা পর ব্রহ্ম সেই শ্রেষ্ঠ লাভ। ভগবান্‌ই লাভ করার বস্তু—তিনিই লভ্য। কেবল ভক্তি দ্বারাই ভগবান্‌কে লাভ করা যায়। ভক্তি না হইলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না।

ভগবদ্ভাব প্রাপ্তিতেই জীব মুক্ত হয়। গীতার এই উপদেশ।

জ্ঞান দুই প্রকার। বৈষয়িক জ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞান। ভক্তি ও সেই রূপ দুই প্রকার। সকাম ভক্তি এবং নিষ্কাম ভক্তি বা অহৈতুকী ভক্তি।

---

* অন্যেত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতি পরায়ণাঃ ॥
গীতা — ১৩—২৫

সাধারণ জ্ঞান বা কাঁচা জ্ঞান না থাকিলে ভক্তির অনুশীলন আরম্ভ হয় না। তত্ত্বজ্ঞান বা পাকা জ্ঞান না হইলে নিষ্কাম বা পাকা ভক্তি হয় না। পাকা ভক্তি ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান বা আত্ম-দর্শন হয় না। পাকা জ্ঞান ভিন্ন ভগবদ্ভাব প্রাপ্তি হয় না—মুক্তি হয় না।

ভগবানে অনুরক্ত হইতে হইলে বা ভগবদ্ভক্ত হইতে হইলে সাধারণ বা সম্যক্ রূপে ভগবান্‌কে জানা চাই। যে বিষয়েব জ্ঞান আমাদের নাই, সেই বিষয়ে উদাসীন থাকাই স্বাভাবিক। যাঁহাকে আমি মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া ভাল বাসিব, তাঁহাকে অন্ততঃ আমার ইষ্ট বা অনুকূল ভাবে জানা চাই। তিনি আমার সুহৃদ্ তিনি আমার প্রাণের প্রাণ তিনি আমার ইহকাল পরকালের সহায়, এইরূপ ভাবে জানা চাই। যাঁহার পূজা ভজনা উপাসনা করিব তাঁহার সম্বন্ধে কোনই জ্ঞান না থাকা অনুমানে আসে না। যাঁহার প্রতি আমাদের মনের টান নাই, মনের আসক্তি বা ভাল বাসা নাই, তাঁহাকে জানিবার জন্য কোনই চেষ্টা হয় না।

বস্তু বিষয়ে পাকা জ্ঞান না হইলে সেই বস্তুর মহিমা সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। বস্তুর জ্ঞান না থাকিলে মূল্যবান্ বস্তুকেও যৎসামান্য বস্তু বলিয়া বোধ হয়। যাঁহার বহুমূল্য মণির জ্ঞান নাই, তাঁহার ঐ মণি লাভ হইলে তাহার তেমন আদব কবিতে তিনি সমর্থ হন না। ১০০০০দশ হাজার টাকা মূল্যের মণি ৫, পাঁচ-টাকায় বিক্রয় করেন। যাঁহার মণি জ্ঞান আছে, তাঁহার হাতে ঐ মণি পড়িলে তিনি তাহার মূল্য বুঝিয়া ১০০০০দশ হাজার টাকা মূল্যেই বিক্রয় করিতে পাবেন।

জ্ঞান ভিন্ন ভক্তি হয় কিনা ?

জ্ঞান ভিন্ন ভক্তি হয় না। গীতায় ইহার উপদেশ পাওয়া যায়। যে বিষয়ের অনুশীলন করিতে হইবে, সেই বিষয়ের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। শ্রীভগবান্ গীতাব তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্ম যোগের উপদেশ দিয়াছেন। কর্ম্মের জ্ঞান থাকা আবশ্যক বোধে চতুর্থ অধ্যায়ে কর্ম্ম যোগে জ্ঞান বিষয়ক আলোচনা করিয়াছেন। সেই জন্য উক্ত অধ্যায় জ্ঞানযোগ নামে অভিহিত। সেই জ্ঞান কর্ম্মেরই জ্ঞান।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন।—

"কর্ম্মণোহ্যপিবোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চবিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণোগতিঃ॥"

গীতা = ৪—১৭।

বিহিত কর্ম্ম নিষিদ্ধ কর্ম্ম, ও কর্ম্ম না করা, এতৎ ত্রয়ের তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। কেননা এসকলের তত্ত্ব অতীব দুর্জ্ঞেয়।

কর্ম্মের গতি দুর্জ্ঞেয় বলিয়া তাহার স্বরূপ জানিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কোন্ কর্ম্ম শুভ এবং কোন্ কর্ম্ম অশুভ না জানিলে, বাছিয়া শুভ কর্ম্ম করা কঠিন হইয়া পড়ে। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী দিগের নিকট যাইয়া, তাঁহাদের সেবা তাহা-দিগকে প্রণিপাত ও প্রশ্ন করিয়া কর্ম্মের জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। ভগবানের এইরূপ উপদেশ।

কেবল অভ্যাসদ্বারা ভক্তি সাধনা হইতে পারিলেও ভক্তির কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। গীতার সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত ভক্তিই প্রতিপাদ্য। ভক্তির অনুশীলনে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সেইজন্য গীতার সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন ;—

জ্ঞানংতেঽহং সবিজ্ঞান মিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্ জ্ঞাত্বানেহভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতমবশিষ্যতে॥

গীতা ৭—২॥

বিজ্ঞানসহ অর্থাৎ প্রত্যক্ষজ্ঞানসহ সেইজ্ঞান তোমাকে বিশেষ ভাবে বলিতেছি, যাহা জানিতে পারিলে আর কিছুই জানিবার বাকী থাকে না।

যাঁহাকে ভজনা করিবে, যাঁহাকে ভক্তি করিবে, প্রথমতঃ তৎসম্বন্ধে কিছুনা কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ভজনীয় আবাধ্য বস্তুর জ্ঞান না থাকিলে, ভজন বা আরাধনা সম্যক্‌রূপে বিশুদ্ধ ভাবে হয় না। সেইজন্য ভজনীয় ঈশ্বরের ভাব সম্বন্ধে জ্ঞান বিজ্ঞান সহিত বিস্তারিত উপদেশ সপ্তম হইতে একাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত দিয়া দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রতিপাদ্য ভক্তির উপসংহার করা হইয়াছে।

অর্জ্জুন ভগবদ্ভাব বা বিভূতি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পরোক্ষভাবে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। তিনি ভগবানের ব্রহ্ম-ভাব অধ্যাত্মভাব, কর্ম্মভাব, অধিভূতভাব, অধিযজ্ঞভাব এবং মরণকালে 'ভগবান্' কিভাবে চিন্তনীয় ইত্যাদি সাতটী প্রশ্ন ভগবান্‌কে করিয়াছিলেন। ভগবান্ অষ্টম অধ্যায়ের প্রথমে তাঁহার সপ্ত প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে ভগবদ্ভাবগুলির তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন।

অর্জ্জুন প্রশ্নোত্তরে ভগবদ্বস্তুকে পরোক্ষভাবে জানিয়া, মনের তৃপ্তি না হওয়ায় সেই ভাব গুলির স্বরূপ অর্থাৎ বিজ্ঞান বা প্রত্যক্ষদর্শন দ্বারা জানিতে চাহিয়াছিলেন। ভগবান্ অর্জ্জুনকে দিব্য চক্ষুঃ দিয়া ভগবদ্ভাব বা বিভূতি (বিশ্বরূপ) দেখাইয়া ছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—"তুমি দিব্য চক্ষুঃ দ্বারা যাহা দেখিলে, উহা আমার সমগ্র বিভূতি নহে। একদেশ বা একাংশমাত্র।"

সগুণ ব্রহ্মের তত্ত্ব পরোক্ষভাবে জানার পর এবং প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষাৎ দেখার পর, অর্জ্জুনের অন্তঃকরণে ভক্তির বিকাশ হইয়াছিল—মোহ দূর হইয়াছিল। তিনি তখন বিস্ময়ে পুলকিত-চিত্ত হইয়া গদ গদ স্বরে কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবানের স্তব করিয়াছিলেন।

সম্পূর্ণ জ্ঞান না হইলে যে সম্পূর্ণ ভক্তি হয় না,—অসম্পূর্ণ জ্ঞানে ভক্তি অসম্পূর্ণ থাকে, অর্জ্জুনের স্তবে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

"আখ্যাহি মে কোভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তু মাদ্যং
নহি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্॥"

গীতা = ১১—৩১।

এই উগ্ররূপধারী তুমি কে? আমাকে বল। হে দেব শ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি; তুমি প্রসন্ন হও। সর্ব্বকারণ স্বরূপ তোমাকে জানিবার জন্য আমার ইচ্ছা হইতেছে, কেন না তোমার প্রবৃত্তি আমি অবগত নহি।

তৎপর ভগবান্ তাঁহার স্বীয় বিভূতি সম্বন্ধে আরও বিশেষ করিয়া বলার পর অর্জ্জুন ভগবদ্বিভূতির আরও জ্ঞান লাভ করিয়া বলিয়াছিলেন ;—

তোমার এই অপূর্ব্ব মহিমা না জানা হেতুই, আমি অজ্ঞানতা বশতঃ মিত্রভাবে তোমাকে "হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা," এইরূপ কত অনুপযুক্ত সম্বোধন করিয়াছি। *

বিশ্বরূপ দর্শনের পর অর্জ্জুন জানিতে পারিয়াছিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর, চরাচর বিশ্বপিতা, তিনি পূজ্য এবং গুরুরও গুরু। তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জগতে আর কেহই নাই।

অর্জ্জুনের এই জ্ঞানলাভের পর, তাহার ভক্তির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। ভগবানের পরমভাব—নির্গুণ সনাতনভাব, জানিতে পারিলে ভক্তি আরও উজ্জ্বলতর হইয়া পড়ে—পরাভক্তি লাভ হয়।

ভক্তি উপাসনামূলক। উপাসনা কর্ম্মবিশেষ। কর্ম্ম আরম্ভ না করিলে সেই কর্ম্মের ফল লাভ ও তৎপর সেই কর্ম্মের ফল-ত্যাগ করিয়া কর্ম্মে সিদ্ধি বা নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ হয় না।

আরম্ভ বা কর্ম্মাভ্যাসের প্রথমাবস্থায় কর্ম্ম এবং কর্ম্মের জ্ঞান খুব অস্পষ্ট ও দোষযুক্ত থাকে। প্রথম অগ্নি জ্বালিলে, ঐ অগ্নি প্রথমে ধূমযুক্ত, অনুজ্জ্বল ও ক্ষীণ থাকে; তৎপর ধূম দূর হইয়া নির্ম্মল ও উজ্জ্বল প্রভাযুক্ত হয়। সেইরূপ ভক্তির আরম্ভ বা প্রথমাভ্যাস সময়ে ভক্তিও দোষযুক্ত অস্পষ্ট ও ক্ষীণ থাকে। ক্রমে ভক্তি যে পরিমাণে জ্ঞান-মিশ্র হইবে, সেই পরিমাণে ভক্তি হইতে নিষ্কাম ভক্তির উদয় হইয়া অহৈতুকী বা পরাভক্তি রূপে পরিণত হইবে।

> "সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
> হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
> অজানতা মহিমানং তবেদং
> ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥'
>
> গীতা=১১।৪১।

শ্রীভগবান্ দ্বাদশাধ্যায়ে ভক্তির উপসংহার প্রসঙ্গে উপদেশ করিয়াছেন;—

"শ্রেয়োহি জ্ঞান মভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তি রনন্তরম্" ॥

গীতা—১২।১২ ॥

অজ্ঞান পূর্ব্বক অভ্যাস যোগ হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ; জ্ঞান হইতে জ্ঞানপূর্ব্বক ধ্যান শ্রেষ্ঠ; ধ্যান হইতে জ্ঞান পূর্ব্বক কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ; কেননা এইরূপ কর্ম্মফল ত্যাগের পর শান্তিলাভ হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ মাত্রেই গায়ত্রী উপাসক। তাঁহারা ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রী জপ করেন। অর্থ না বুঝিয়া গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিলে অল্প ফল লাভ হয়। অর্থ বুঝিয়া গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিলে ফল তদপেক্ষা অধিক। এবং গায়ত্রী প্রতিপাদ্য দেবতার মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া গায়ত্রী জপকরিলে ফল আরও উৎকৃষ্ট হয়। তৎপর সেই উপাস্য দেবতাকে নিজের সমস্ত কর্ম্মফল অর্পণ করিলে সিদ্ধিলাভ হয়।

যাঁহাদের ভগবান্‌কে ভজনা করিবার বা ভগবদ্ভক্ত হইবার সৌভাগ্য হয়, তাঁহাদের সিদ্ধিলাভের জন্য কোন চিন্তার কারণ নাই। এইরূপ ভজন-শীল ব্যক্তি অজ্ঞান হইলে ও ভগবান্ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার অজ্ঞানতা দূর করিয়া তাঁহাকে ভগবদ্বিষয়ক বুদ্ধিযোগ বা জ্ঞানদান করেন।

এইরূপ একাগ্র-চিত্তে প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনে নিরত সেই সব ব্যক্তিকে আমি তাদৃশ জ্ঞানযোগ প্রদান করি। তদ্দারা তাঁহারা আমাকে অনায়াসে লাভ করেন। সেই ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আমি তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে স্থিত হইয়া জ্ঞানরূপ দীপদ্বারা অজ্ঞান-সম্ভূত সংসাররূপ অন্ধকার দূর করিয়া থাকি।*

* তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥
তেষামেবানু কম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্ম ভাবস্থো জ্ঞান দীপেন ভাস্বতা ॥
গীতা =

গীতা পাঠে বুঝিলাম জ্ঞান ভিন্ন ভক্তির পূর্ণতা হয়না, ষোল আনা ভক্তি জ্ঞান ভিন্ন হয় না।

ভক্তি ভিন্ন জ্ঞানের পূর্ণতা হয় কি না ?

ভক্তি ভিন্ন ষোল আনা জ্ঞান হয় কি না ?

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মা স্তুতি করিয়া ছিলেন; সেই স্তবে এইরূপ আছে;—

শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তি মুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

হে বিভো! শ্রেয়ঃ প্রসূতি ভক্তি ছাড়িয়া দিয়া যিনি কেবল বোধ-রূপ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার জন্য ক্লেশ করেন তাহার ক্লেশ মাত্রই সার হয়। আর কিছুই লাভ হয় না।

ধান হইতে চাউল ছাড়াইয়া লইলে তৎপর তুষকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিলে আর কিছুই পাওয়া যায় না। সেইরূপ ভক্তি ছাড়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। ভক্তি থাকিলেই উপনিষদ্ বা তত্ত্ব জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। শাস্ত্রেও ইহার প্রমাণ আছে;—

দেবতা ও গুরুতে যাঁহার পরা ভক্তি আছে সেই মহাত্মা সম্বন্ধেই উপনিষদের অর্থ প্রকাশ পায়। অর্থাৎ সেই ভক্ত জ্ঞানীই উপনিষদের প্রকৃত অর্থ জানিতে পারেন।*

*যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ

এতৎ সম্বন্ধে গীতার উপদেশ এই ;—

"তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞান নির্ধূত কল্মষাঃ ॥"

গীতা = ৫—১৭ ॥

এই শ্লোকে ঈশ্বরোপাসক দিগের ফল লাভের কথা বলা হইতেছে। "তৎ"—সগুণ বা নির্গুণ-ব্রহ্ম। তাঁহাতেই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিবিশিষ্ট, তদ্বিষয়ে যত্নবান্, তাঁহাতেই যাঁহাদের একাগ্রতা, তিনি যাঁহাদের পরম গতি এবং জ্ঞান কর্তৃক যাঁহাদের পাপক্ষয় হইয়াছে, তাদৃশ ঈশ্বরোপাসক মুক্তি লাভ করেন।

তন্মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ; কেন না জ্ঞানী সতত মদীয় যোগরত এবং একমাত্র আমারই ভক্ত ; আমি জ্ঞানীর অতি প্রিয় এবং জ্ঞানীও আমার অতি প্রিয়। *

হে পার্থ! ভূতগণ যাঁহার অন্তরে অবস্থিত, যিনি সর্ব্বব্যাপী, সেই মৎস্বরূপ পরম পুরুষকে তদ্গত ভক্তিযোগে লাভ করিতে হয়। †

হে পরন্তপ অর্জ্জুন! অসাধারণ ভক্তিদ্বারাই আমাকে এইরূপে দেখা যায়, আমাকে যথার্থরূপে জানিতে পারা যায় ; এবং আমাতে লীন হওয়া যায়। অন্য কোনরূপেই বিশ্বরূপ দর্শন লাভ হয় না। ‡

শ্রীভগবান আরও স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন ;—

*" তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একা ভক্তি র্বিশিষ্যতে ।
প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থ মহং স চ মমপ্রিয়ঃ ।।"

গীতা = ৭—১৭ ।।

" † পুরুষঃ সপরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্য স্ত্বনন্যয়া ।
যস্যান্তঃ স্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ।।"

গীতা = ৮—২২ ।।

"‡ ভক্ত্যাত্বনন্যয়াশক্যো অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন ।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চপরন্তপ ।।"

তুমি আমার যে রূপ দর্শন করিলে, বেদাধ্যয়ন, দান, তপস্যা অথবা অগ্নি-হোত্রাদি যজ্ঞ করিয়া কেহ আমাকে সেইরূপে দেখিতে পায় না ॥ *

আমাতে অর্থাৎ ভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তি জ্ঞানের প্রধান সাধন। †

যিনি আমাকে অনন্য ভক্তিযোগ সহকারে সেবা করেন, আমার সেই ভক্ত গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম-স্বরূপতা লাভে সমর্থ হন। ‡

ভক্তিদ্বারা আমি যাদৃশ (সর্ব্বব্যাপী) যেরূপ (ঘনীভূত সচ্চিদানন্দ) তাহা তত্ত্বতঃ অর্থাৎ স্বরূপতঃ জ্ঞাত হওয়া যায়। তদনন্তর এইজ্ঞান পাকা হইলে আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া আমাতেই প্রবেশ করেন। অর্থাৎ সেই ভক্ত স্বয়ং পরমানন্দ ব্রহ্ম—স্বরূপ হন।

সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যিনি আমার শরণাগত হন, তিনি আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। §

ভক্তি ভিন্ন পরজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না। ব্রহ্ম প্রাপ্তিই মুক্তি।

---

* নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবম্বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥
গীতা = ১১—৫৩ ॥

† ময়ি চানন্য যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
গীতা = ১৩—১০

‡ মাঞ্চ যেঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥
গীতা = ১৪—২৬।

§ ভক্ত্যামামভিজানাতি যাবান্‌যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥
সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎ প্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥
গীতা = ১৮—৫৫।৫৬

কে পরমেশ্বরের—পরমাত্মার ভজনা বা উপাসনা করে না? (কে তাঁহাকে ভজনা বা উপাসনা করে?)

বর্ত্তমান কলিযুগে ধর্ম্ম একপাদ—এক ভাগ। অধর্ম্ম ত্রিপাদ—তিন ভাগ। কলিকালে অধিক সংখ্যক মনুষ্যই অধার্ম্মিক হইবার কথা। পোনেরআনা লোকই বোধ হয় ভগবানের নাম কীর্ত্তন, পূজা বা উপাসনা করে না।

কেন করেনা?—বলা হইয়াছে সৃষ্ট জগৎ ত্রিগুণ মিশ্রিত। প্রত্যেক বস্তুই সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে। মনুষ্য ও ত্রিগুণের অধীন। (সত্ত্বগুণ প্রকাশক, রজঃ প্রবর্ত্তক এবং তমোগুণ আবরক। রজোমিশ্রিত তমোগুণ হইতে অধর্ম্মের উৎপত্তি। এই তিন গুণের মিশ্রণে ভাগের পরিমাণ এক রূপ নহে। সাধারণতঃ মনুষ্য রজোগুণ ও তমোগুণ প্রধান। বহুজন্মের সুকৃত কর্ম্মের সংস্কার অনুসারে কোন কোন মনুষ্য সত্ত্বগুণ প্রধান হইয়া জন্মে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই রজঃ ও তমোগুণ প্রধান। যাহারা রজঃ ও তমোগুণ প্রধান, তাহাদের অধিকাংশই সাধারণতঃ অধার্ম্মিক ও আসুর প্রকৃতি যুক্ত হয়। তাহারা নরাধম। আসুর ভাবাপন্ন নরাধমগণ ভগবানের ভজনা করেনা এবং আত্ম বা পর দেহে ভগবান্‌কে দ্বেষ করিয়া থাকে।

গ্রামে প্রচলিত কথা আছে;—"ঠক্ বাছ্‌তে গাঁ উজাড়" সাধু ও ঈশ্বর পরায়ণ লোকের সংখ্যা খুব কম। অধার্ম্মিক লোকের সংখ্যাই অধিক। সুতরাং অধিকাংশ মনুষ্যই ভগবানের ভজনা করে না।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন;—

নিত্য পাপযুক্ত বিবেক হীন আসুর ভাবাপন্ন মূঢ় মানবেরা মায়া প্রভাবে জ্ঞান-শূন্য হইয়া আমাকে প্রতিপাদন করিয়া আমার শরণাপন্ন হয় না। *

---

*নমাং দুষ্কৃতিনোমূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥

গীতা—৭—১৫॥

তবে কে ভগবানের ভজনা করে? কে ভগবদ্ভক্ত? শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন;—হে ভরতকুল শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, ধনাদিকাম এবং জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ সুকৃতিগণ আমার ভজনা করেন। †

আর্ত্ত—দুঃখ ক্লিষ্ট, পীড়িত। জিজ্ঞাসু = ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান পাইবার ইচ্ছুক। অর্থার্থী—ধন, ঐশ্বর্য্য, স্বর্গভোগ প্রভৃতি অর্থকাম। জ্ঞানী = তত্ত্ববিৎ, নিষ্কাম, প্রেমভক্ত। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী এই তিন শ্রেণীর মনুষ্য সকাম ভক্ত। অর্থের প্রকার ভেদে সেই অর্থার্থী ভক্তের প্রকার ভেদ লইয়া তাঁহারা উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট হইয়া থাকেন।

আর্ত্ত ভক্তদের মধ্যে যাঁহারা আর্ত্তি বা দুঃখ দূর হইয়া গেলে, আর ভগবানের ভজনা করেন না, তাহারা নিকৃষ্ট। যাঁহারা আর্ত্তি দূর হইলেও ভগবান হইতে মনোভীষ্ট লাভের আশায় ভগবান্কে স্মরণ করেন এবং তাঁহার প্রসন্নতা লাভের জন্য ভজনায় রত থাকেন তাঁহারা উৎকৃষ্ট।

জিজ্ঞাসু ভক্ত অর্থার্থী ও আর্ত্তভক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ। কারণ তাঁহাদের মনে বিষয় বাসনা থাকিলেও তাঁহারা ভগবত্তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার শরণাগত ও তাঁহার তত্ত্ব জ্ঞান লাভের জন্য যত্নবান্ হন। বিষয়কাম হইলেও বিষয় লাভের জন্য ততটা ব্যস্ত হন না!

অর্থার্থী ভক্ত সকাম। তাঁহারা ধনৈশ্বর্য্য, পরকালের স্বর্গভোগের জন্য ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার ভজনা করেন। প্রার্থিতব্য অর্থের তারতম্যানুসারে অর্থার্থী ভক্ত অপকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট হইয়া থাকেন।

জ্ঞানী ভক্ত অপর তিন শ্রেণীর ভক্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানী ভক্ত মধ্যে যাঁহারা নিত্যযুক্ত, একভক্তি তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের চিত্তের বিক্ষেপ হইয়া পরমাত্মরূপ ভগবচ্চিন্তার বিরাম হয় না। তাঁহাদের মনে কোন কামনা নাই।

†চতুর্ব্বিধাভজন্তে মাং জনাঃসুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥
গীতা—৭—১৬।

জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহাদের সকল পাপ দূর হইয়াছে। তাঁহারা নিষ্কাম ভাবে ভগবানের প্রেমিক হন। তাঁহাদের ভক্তি অহৈতুকী—তাঁহারা মুক্ত পুরুষ।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন ;—জ্ঞানী ভক্ত আমার আত্মা ; আমি জ্ঞানীভক্তের অত্যন্ত প্রিয়। সেই জন্য জ্ঞানী ভক্তও আমার অত্যন্ত প্রিয়। শ্রীভগবান্ আরও বলিয়াছেন ;—

হে পার্থ ! দৈব প্রকৃতি সম্পন্ন মহাত্মগণ আমাকে নিত্য ও জগৎ কারণ অবগত হইয়া (গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশ জানিয়া) অনন্যচিত্তে ভজনা করেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ ভক্তি সহকারে নামাদি কীর্ত্তন, কেহ কেহ ভক্তি সহকারে মদীয় কর্ম্মে প্রযত্ন, কেহ কেহ ভক্তি সহকারে বিবিধ নিয়মাবলম্বন এবং কেহ কেহ ভক্তি সহকারে প্রণাম দ্বারা আমাকে ভজনা করেন। অপর কেহ কেহ সেই সকল কর্ম্মের ফল স্বরূপ যে নিত্যযোগ তদ্দ্বারা এবং নিত্যযোগ-মূলক জ্ঞান-যজ্ঞ দ্বারা আমাকে উপাসনা করেন। এই সকল উপাসনা অভেদ ভাবে, সেব্য-সেবক রূপ ভেদ ভাবে এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি নানা দেব ভাবে হইয়া থাকে। §

যে সকল পুণ্যকর্ম্মা জনগণের পাপ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহারাই দ্বন্দ্ব মোহ বিবর্জ্জিত হইয়া দৃঢ়-ব্রত ও একাগ্রচিত্ত হইয়া আমাকে ভজনা করেন। *

§ মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতি মাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদি মব্যয়ম্ ॥
সততং কীর্ত্তয়ন্তোমাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাংভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥
জ্ঞান যজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥

গীতা = ৯—১৩। ১৪। ১৫ ॥

*যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তেদ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

গীতা ৭—২৮ ॥

উপবিউক্ত জ্ঞানীভক্তগণ যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহার সন্দেহ নাই। সেই হুই এই জ্ঞানীভক্ত ভগবানেরই আত্মা। জ্ঞানীভক্ত সাকার ও নিরাকার উভয় ভাবের যে কোন ভাবে ভগবানের ভজনা করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে এই চারিশ্রেণীর ভক্তের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে ;—

বালক বেশধারী পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপ গোপীদিগকে ইন্দ্রযাগ করিতে নিষেধ করেন। অন্য দেবতার ভজনকরা শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত ছিল না। ইন্দ্র পূজা না পাইয়া, অত্যন্ত ক্রোধ করিয়া ব্রজে ৭ দিন পর্য্যন্ত প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি দ্বারা ব্রজবাসী দিগকে অত্যন্ত দুঃখ পীড়িত করেন। ব্রজগোপ গোপীগণ অত্যন্ত আর্ত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে ভগবান্ তাহাদিগকে অনুগ্রহ করেন। তিনি স্বহস্তে গোবর্দ্ধন উঠাইয়া ধরিয়া তাহার নীচে ব্রজবাসিগণকে আশ্রয় দিয়া ঝড় ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

মহাভারতে দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করিতে উদ্যত হন, তখন দ্রৌপদী আর কাহারও সহায়তা না পাইয়া অত্যন্ত আর্ত্ত হইয়া শ্রীভগবান্‌কে ডাকেন এবং তাঁহার শরণাপন্ন হন, ভগবান্ বস্ত্ররূপ হইয়া দ্রৌপদীর লজ্জা রক্ষা করেন।

শিশু-ধ্রুব পিতা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া পিতৃ-রাজ্যাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট রাজ্য লাভের প্রার্থী হইয়া তপস্যা করেন এবং একাগ্র মনে ভগবানের শরণাপন্ন হন। ভগবান ভক্ত ধ্রুবের মনোভীষ্ট পূর্ণ করিয়া ছিলেন।

যদুবংশের ধ্বংস হইলে, জিজ্ঞাসু উদ্ধব ভগবত্তত্ত্ব লাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন ; শ্রীভগবান্ তাহাকে তত্ত্ব জ্ঞান দিয়াছিলেন।

নারদ, শুকদেব এবং প্রহ্লাদ জ্ঞানীভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম ভক্ত প্রহ্লাদকে সর্ব্বপ্রকার বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী ইহারা সকলেই **উদার**। উদার=উৎকৃষ্ট। যাঁহারা ভগবদ্ ভজনা করেন, তাঁহারা সকলেই, ভজনহীন পাষণ্ড মূঢ় লোক হইতে উদার বা উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। এই চারি শ্রেণীর ভক্তগণ ভগবদ্ভজনা বলে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া শেষে মুক্তি বা ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হইতে পারেন।

দুঃখার্ত্ত ব্যক্তিরা রোগাদিদ্বারা পীড়িত হইয়া পড়িলে, যাঁহারা রোগ প্রভৃতি মুক্তির জন্য ভগবানের ভজনা করেন, তাঁহারা উৎকৃষ্ট। কেবল ডাক্তার, কবিরাজের ভবসায় যাঁহারা থাকেন তাঁহারা নিকৃষ্ট।

যাহারা অর্থ-লাভের জন্য অন্য দেবতা বা ধনীলোকের সেবা করেন, তাঁহারা নিকৃষ্ট; যাঁহারা ধন, মান প্রভৃতি অভিলষিত কাম্যবস্তু লাভের জন্য ভগবানের ভজনা করিয়া তাঁহারই অনুগ্রহে উহা লাভ করিতে যত্নবান হন, তাঁহারা তদপেক্ষা উদার বা শ্রেষ্ঠ।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীভক্ত আর্ত্ত ও অর্থার্থী ভক্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

আমরা এমনই মোহান্ধ যে যখন আমাদের ধন, ঐশ্বর্য্য, বৃদ্ধি হইতে থাকে, বিষয়ভোগে সুখী মনে করি, এই সমস্ত ভোগৈশ্বর্য্য আমার নিজের পুরুষকার দ্বারা লাভ করিয়াছি, অভিমান করিয়া ভগবান্‌কে একবার ডাকাও প্রয়োজন বোধ করিনা। কিন্তু যখন নানারূপ বিপদ্ আসিয়া আমাদিগকে দুঃখ দিতে থাক, তখন সমস্ত দোষ ভগবানের উপর চাপাই। নিজের কর্ম্মদোষে দুঃখ পাইতেছি; ভগবান্ সমদর্শী ইহা মনে হয় না। অবিদ্যার প্রভাব এতই অধিক!

ভগবদ্ভক্তি লাভের অধিকারী কে?

কোন্ শ্রেণীর মনুষ্য ভগবানের ভজনা করিতে পারে?— ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম—পরমাত্মা। মহাভারতে ভীষ্ম, দ্রোণ, বেদব্যাস, নারদ, বিদুর, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ধার্ম্মিক এবং তত্ত্বজ্ঞানিগণ শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়াই জানিতেন, এবং ভক্তি করিতেন।

পূর্ণ-ব্রহ্ম, সর্ব্ব-শক্তিমান্ মহাযোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা, সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যের পরম কল্যাণের জন্য অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া যোগস্থ হইয়া সকল উপনিষদ্ দোহন করিয়া গীতামৃতরূপ দুগ্ধ তাঁহাকে পান করাইয়াছিলেন। গীতোক্ত ধর্ম্ম, সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম।

সর্ব্বপ্রকার জীবেই ভগবানের ভজনা ও উপাসনা করিতে পারেন। পশু পক্ষীও তাহাদের নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ঈশ্বরের গুণ গান করে। তাহারা তাহাদের

স্বভাব নির্দ্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন করেনা; স্বধর্ম্ম পালন করিয়া ভগবানের ভজনা করে।

মনুষ্য মধ্যে জাতি কুল নির্ব্বিশেষে ধনী, নির্ধন, সুখী, দুঃখী, সাধু, অসাধু, জ্ঞানী, অজ্ঞান, রাজা, প্রজা, পাপী তাপী, অন্ধ, খঞ্জ, মূক, বধির প্রভৃতি সকলেই ভগবানের ভজনা করিতে অধিকারী। ভগবান্ কোন জীবকেই তাঁহার ভজনার অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন নাই। ভগবানের ভজনা করিয়া সকল শ্রেণীর মনুষ্যই অসাধু সাধু হইয়া, অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক হইয়া শাশ্বত শান্তি লাভ করিতে পারেন।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন ;—

অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্য পরায়ণ হইয়া আমাকে ভজনা করে, তাহাকে সাধু বলিয়াই বিবেচনা করিবে। কেননা সে ব্যক্তি উত্তম অধ্যবসায় করিয়াছে। সেই দুরাচার ব্যক্তিও আমার ভজনা প্রভাবে শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হইয়া থাকে। শাশ্বত শান্তি লাভ করে। হে কুন্তীনন্দন! তুমি প্রতিজ্ঞা করিতে পার যে ভগবদ্ভক্ত প্রণষ্ট হয় না। হে পৃথানন্দন! আমাকে আশ্রয় করিলে স্ত্রী, শূদ্র, বৈশ্য এবং অন্ত্যজ জাতিরাও পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পবিত্র ব্রাহ্মণগণ এবং রাজর্ষিগণ আমার ভক্ত হইলে যে পরমগতি প্রাপ্ত হইবেন ইহা আর বক্তব্য কি ?*

উপরিউক্ত ভগবদুক্তি দ্বারা বুঝা গেল, কেবল পুণ্যবান ব্রাহ্মণ এবং রাজর্ষিগণই যে ভগবানের ভজনায় অধিকারী তাহা নহে; জাতি কুল নির্ব্বিশেষে ভাল মন্দ

* "অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব সমন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতোহি সঃ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥
মাংহি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপিস্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যা স্তথা শূদ্রা স্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥
কিংপুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয় স্তথা ॥
গীতা ৯—৩০—৩৩.

সকল শ্রেণীর লোকই ভগবানের ভজনা করিয়া পরম গতি লাভ করিতে পারে। নিম্নাধিকারী স্ত্রী, বৈশ্য শূদ্রদিগকে উপলক্ষ করিয়া নিম্নস্তরের অপর সকল শ্রেণীর মনুষ্যকেই ভগবানের ভজনার অধিকারী করিয়াছেন।

ভক্তির অধিকারী সকল শ্রেণীর লোকই কি ভগবানের ভজনা করে? মনুষ্যের মধ্যে দুষ্কৃত কর্ম্মেরফলে অনেকেই অধিকার থাকা সত্ত্বেও ভগবানের ভজনা করেনা। যাঁহারা সুকৃতিশালী, তাঁহারাই ভগবানে প্রপন্ন হন এবং ভগবদ্ভজনা করেন। এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম; পূর্ব্বেই বলাহইয়াছে।

মনুষ্যের স্বাভাবিক শক্তি অনুসারে অধিকারের ভেদ হয়। অধিকারী ভেদে সাকার ও নিরাকার এবং সকাম ও নিষ্কাম উপাসনার ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে।

শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন ;—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

গীতা—৪।১১।

হে পার্থ! যাহারা যে ভাবেই আমাকে উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। মনুষ্যগণ বিভিন্ন দেবতার পূজা করিলেও তাহারা সর্ব্বপ্রকারে একমাত্র আমারই পূজা করিয়া থাকে। (কেননা সমস্ত দেবতা আমারই স্বরূপ।)

পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে স্বরূপতঃ না জানিয়া বা জানিয়া যিনি যেভাবে তাঁহার উপাসনা করেন তিনি তাঁহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করেন। তিনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু। তিনি কর্ম্মীদিগকে কর্ম্মের যোগ্যতানুসারে কর্ম্মফল, যাজ্ঞিকদিগকে যজ্ঞফল এবং জ্ঞানীদিগকে জ্ঞানফল দান করেন। নিম্ন অধিকারীদিগকে অল্পফল এবং পূর্ণাধিকারীদিগকে পূর্ণফল প্রদান করেন।

স্বরূপতঃ ভগবান্‌কে জানিয়া ভজনকরা আপাততঃ খুব কঠিন। বহু তপস্যা দ্বারা আসক্তি, ভয় এবং ক্রোধ পরিশূন্য হইয়া পবিত্র হইলে ভগবদ্ বিষয়ক জ্ঞান লাভ হয়। তখন তাঁহার মনের বৃত্তি ভগবদ্বিষয়ক হইয়া সম্পূর্ণরূপে ভগবানের

শরণাপন্ন হন। তৎপর ভজনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হন। উচ্চাধিকারীরাই এইরূপে ভজনা করিতে পারেন।

নিম্নাধিকারী প্রাকৃত মনুষ্যদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর নানামূর্ত্তিতে প্রকট হন।

পরব্রহ্ম চিন্ময়, অদ্বিতীয়, নিরংশ এবং অশরীর হইলেও উপাসকদিগের হিতার্থে, তাহাদের কার্য্যের জন্য নানা রূপের সৃষ্টি করিয়া থাকেন।*

"ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা"র অর্থ এই যে "ব্রহ্মণঃ" এখানে কর্ত্তৃকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে।

ভক্তগণ ভজনীয় ব্রহ্মেরূপ নিজে কল্পনা করেন না। পরব্রহ্মই ভক্তসাধকের হিতার্থ নিজের রূপ নিজেই কল্পনা বা সৃষ্টি করেন।

নিরূপাধিক, নিরঞ্জন, নির্ব্বিকার, নিরাকার ব্রহ্মের উপলব্ধি, জ্ঞানযোগভিন্ন হয় না। সেইজন্য ভগবান্ দেহাভিমানী প্রাকৃত সাধকদিগের ভজনা সহজ ও সুগম করিবার জন্য তিনি নানারূপ গ্রহণ করিয়া, নানা ভাবে ভক্তদিগকে অনুগ্রহ করেন।

মনুষ্যগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবানের ভজনা করিয়া ফলস্বরূপ ভগবানকেই প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে। তবে ব্রহ্মরূপী ভগবানের স্বরূপ না জানিয়া পৃথক্ ভাবে ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, সূর্য্য প্রভৃতি অন্য দেবতার ভজনা বা উপাসনা করে কেন? শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন;—

"কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং য জন্ত ইহদেবতা।
ক্ষিপ্রংহি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥"

গীতা = ৪ - ১২॥

*"চিন্ময়াস্যা দ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যা শরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন উদ্ধৃত একাদশী তত্ত্ব ধৃত যমদগ্নি বচন।

ইহলোক = মনুষ্যলোক-কর্ম্মভূমি। সেইজন্য মনুষ্য স্বভাবতঃ কোন বিষয়ের কামনা করিয়া সেই কাম্যবস্তু লাভের জন্যই কর্ম্ম করিয়া থাকে। কর্ম্মের সিদ্ধি লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া তত্তৎ কর্ম্মফল দাতা ইন্দ্রাদি দেবতা দিগের ভজনা করে। যেহেতু কর্ম্মফল শীঘ্রই লাভ হয়। জ্ঞানফল মুক্তি দুষ্প্রাপ্য বলিয়া প্রাকৃত মনুষ্য তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য স্বয়ং ভগবানের ভজনা করেনা। রজোগুণ প্রধান ব্যক্তিরা স্বভাবতঃ কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী হয়। এরূপ নিম্নাধিকারীর জন্য পৃথক পৃথক দেবতা হইতে পৃথক্ পৃথক্ ফল লাভের বিধান শাস্ত্রে আছে।

যাহারা আরোগ্যকাম, তাহারা সূর্য্যের উপাসনা করিবে। যাহারা ধনকাম তাহারা অগ্নির উপাসনা করিবে। যাহারা জ্ঞানার্থী তাহারা শঙ্করের উপাসনা করিবে এবং যাহারা মুক্তিকাম তাহারা জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিবে। *

সত্ত্বপ্রধান মনুষ্যের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত খুব কম। সেইজন্য স্বরূপতঃ ভগবান্‌কে জানিয়া ভজনা করা আপাততঃ খুবই কঠিন। বহুতপস্যাদ্বারা রজঃ ও তমোগুণ অভি-ভূত করিয়া সত্ত্ব প্রধান হইলে মনুষ্য বিষয় তৃষ্ণা,আসক্তি,ভয় ও ক্রোধ পরিশূন্য হইয়া পবিত্র হইয়া যায়। তৎপর ভগবদ্ বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়। তাহার মনের বৃত্তি তখন ভগবদ্বিষয়ক হয়। তৎপর সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হয়। সত্ত্ব প্রধান তপঃ সিদ্ধ উচ্চাধিকারীরাই এরূপ ভজনা করিতে পারেন।

রজোগুণ ও তমোগুণ প্রধানলোকই অধিকাংশ। তাহারা কাম্য ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া সেই কাম্য বস্তু লাভের জন্য কাম্যফল দাতা দেবতান্তরের ভজনা করিয়া থাকে। শ্রীভগবান্ তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য সেই সেই উপাস্য দেবতার প্রতি তাহাদের অচলা শ্রদ্ধা ও মনের একাগ্রতা দান করেন।

* "আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ ধনমিচ্ছেদ্ধুতাশনাৎ।
জ্ঞানঞ্চশঙ্করাদিচ্ছেৎ মুক্তিমিচ্ছেজ্জনার্দ্দনাৎ ॥"

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন ;—যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে যে যে দেবমূর্ত্তি অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছুক হয়, আমি তাহাদিগের সেই সেই দেবমূর্ত্তি বিষয়ে অবিচলিত শ্রদ্ধা বিধান করিয়া থাকি। *

প্রত্যেক মনুষ্যের শ্রদ্ধা ও রুচি অনুসারে কর্ম্মের প্রবৃত্তি হয়। প্রত্যেক মনুষ্যের শ্রদ্ধা ও রুচি একরূপ নহে। গুণের ক্রিয়া দ্বারাই এরূপ শ্রদ্ধা ও রুচির বৈষম্য হয়।

মনুষ্যের শ্রদ্ধা ও রুচি অনুসারেই ভক্তি বা উপাসনার প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। তজ্জন্য ঋষিগণ অধিকারী ভেদে উপাসনার প্রকার ভেদ ব্যবস্থা করিয়াছেন। যথাশাস্ত্র উপাসনা অবলম্বিত হইলে, ক্রমে সিদ্ধিলাভ হইবে। যে ভাবের উপাসনাই হউক, শাস্ত্রানুমোদিত হওয়া আবশ্যক। খাম্ খেয়ালী মতে করিলে কোনটাতেই সিদ্ধিলাভ হইবে না।

সাত্ত্বিক প্রকৃতি মনুষ্য দেবতামূর্ত্তির ভজনা বা পূজা করেন। রাজসিক প্রকৃতি মনুষ্য যক্ষ ও রাক্ষসের মূর্ত্তি পূজাকরেন। তামসিক প্রকৃতি মনুষ্য ভূত ও প্রেতের পূজা করেন। শ্রদ্ধারূপী ভগবান্ ভক্তের রুচি অনুসারে শ্রদ্ধার বিধান করেন। সেই শ্রদ্ধা অচলা হইলে ক্রমে আরাধ্য দেবতাব প্রতি ভক্তগণ অনুরক্ত হইয়া পড়েন। ক্রমে তাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ ও পবিত্র হইলে, নির্ম্মলা ভক্তিলাভ করিয়া সর্ব্বতোভাবে ভগবদনুগ্রহেই তাঁহারা পরম কল্যাণ লাভ করেন। যে উদ্দেশ্যে ভজনা করা হয়, ভগবৎ কৃপায় সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া ভজনার ফল প্রাপ্ত হয়।

ভগবদ্ভক্ত কখনই দুর্গতি লাভ করেন না। ভগবান্ প্রত্যেকের হৃদয়ে অন্তর্যামী রূপে আছেন। তিনিই কর্ম্মের প্রেরণা করেন। এবং তিনিই একমাত্র কর্ম্ম ফল দাতা। মনুষ্যগণ যন্ত্রী কর্ত্তৃক চালিত যন্ত্রের ন্যায় কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়।

* "যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতু মিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥"

গীতা — ৭—২১

রুচি, শ্রদ্ধা এবং শক্তি অনুসারে যিনি যে দেবতার পূজা করেন, তিনি সেই দেবতা হইতে সেই দেবতার শক্তি ও অধিকার অনুযায়ী ফললাভ করেন। দেবতান্তর হইতে যে ফল লাভ হয়, উহা ক্ষুদ্র ও বিনাশী; কিন্তু সমস্ত দেবতাই পরমেশ্বরের মূর্ত্তি। স্বয়ং ভগবান্ পরব্রহ্ম ভিন্ন কর্ম্মফলদাতা আর কেহ নাই। তত্ত্বতঃ এই বিষয় না জানিয়া অন্য দেবতা ভজনাকারী অল্প ফল লাভ করেন। এইরূপ নিম্নাধিকারী অল্প মেধাবী ব্যক্তি স্বরূপতঃ ভগবান্‌কে না জানিয়া সংসারচক্রে ঘুরিতে থাকে। যিনি ভগবান্‌কে স্বরূপতঃ জানিয়া, তাঁহার ভজনা করেন, ভগবান্ তাঁহাকে পূর্ণফল দান করেন। জ্ঞানী নিষ্কামভক্ত ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হন। তাঁহার আর সংসারে আসিতে হয় না।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ ভেদে শ্রদ্ধা ও ভক্তি সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক হয়। প্রহ্লাদের ভক্তি সাত্ত্বিক। কারণ প্রহ্লাদ জ্ঞানী ভক্ত। তাঁহার দেহাভিমান ছিলনা। তাঁহার অন্তরে বাহিরে পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হইত।

সমাধিনামক বৈশ্যও সাত্ত্বিক ভক্ত ছিলেন।

সুরথরাজা এবং লঙ্কাধিপতি রাবণ রাজা রাজসিক ভক্ত ছিলেন। সুরথরাজা হৃত রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তি এবং সেইরাজ্য অবিভ্রংশী থাকার কামনায় আদ্যাশক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন। লঙ্কাধিপতি অমর হইয়া ত্রিভুবন বিজয়ের জন্য ব্রহ্মার আরাধনা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা রাবণের রাক্ষস প্রকৃতি জানিয়া তাঁহাকে অমর বর দিতে অসম্মত হন। রাবণের ঐকান্তিক আগ্রহে ও উগ্রতপস্যায় ব্রহ্মা এই বর দিলেন যে ;—"দেব, যক্ষ, রাক্ষস, দানব কাহারও দ্বারা রাবণের মৃত্যু হইবে না, নর ও বানর হইতে তাঁহার মৃত্যুর আশঙ্কা থাকিবে।" রাবণ বঞ্চিত হইয়া সেই বরই গ্রহণ করেন।

দ্রুপদ রাজা ও কাশীরাজ কন্যা অম্বা তামসিক ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দ্রুপদ রাজা দ্রোণের বধের জন্য যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে ধৃষ্টদ্যুম্ন যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হন এবং তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দ্রোণকে বধ করেন।

কাশীরাজ কন্যা অম্বা ভীষ্মবধের জন্য কঠোর তপস্যা করেন। তাহার ফলে তিনি শিখণ্ডীরূপে দ্রূপদরাজার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন এবং কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে ভীষ্মের বধ সম্পাদন করেন।

যে যে ভাবে ভগবানকে ভজনা করে, ভগবান সেই ভাবেই ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। সকাম ভক্তদিগকে কাম্যফল দান করেন এবং নিষ্কাম ঈশ্বর প্রেমিক ভক্তকে ভগবান তাঁহার শাশ্বতপদ বা পরম ধাম প্রদান করেন। সকাম ভক্ত কাম্যফল পান, ভগবানকে পান না। নিষ্কাম ভক্ত ভগবদ্‌গতি লাভ করিয়া মুক্ত হইয়া যান। সুতরাং সকাম উপাসনা হইতে নিষ্কাম উপাসনা শ্রেষ্ঠ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

গীতা পাঠে বুঝা যায় ভক্তি যেমন সকাম ও নিষ্কাম উভয়ই হয়, সেইরূপ ভক্তি সগুণ ও নিগুর্ণ ব্রহ্মে—উভয় প্রকারেই হয়।

ভগবান্ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া শেষে বলিয়াছিলেন ;—

মৎ কর্ম্মকৃন্মৎ পরমোমদ্ভবঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডবঃ॥
গীতা—১১।৫৫॥

হে পাণ্ডব! যাঁহার সমস্ত কর্ম্ম আমারই জন্য, যাঁহার আমি একমাত্র আশ্রয়, যে বিষয়াসক্তি বর্জ্জিত হইয়া আমারই ভক্ত হয়, এবং যে সকল ভূতে নির্ব্বৈর হয়, সে আমাকেই পায়। এবং ইহাও বলিয়াছিলেন বিশ্বরূপী আমাকে জানিতে হইলে —আমার দর্শনলাভ করিতে হইলে এবং আমাতে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে অনন্য-ভক্তি দ্বারাই এ সমস্ত সিদ্ধ হইবে।

শ্রীভগবান্ সগুণ বিশ্বরূপী ভগবান্‌কে ভজনা করিতে অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন বুঝা যায়।

ভগবানের ভাব অনন্ত। গীতার সপ্তম অধ্যায় হইতে একাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত ভগবানের অনন্ত ভাব বা বিভূতির বর্ণনা আছে। বিভূতিগুলি তাঁহার ব্যক্ত সগুণ ভাব। ইহা অপেক্ষা ভগবানের শ্রেষ্ঠ বা পরম ভাব আছে। যাহা অব্যক্ত

হইতেও অব্যক্ত, তাহার সেই পরভাব ইন্দ্রিয়ের অগোচর ; সেই জন্যই অব্যক্ত। যোগবলে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইলে এই পরভাব বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং অনুভবসাধ্য জ্ঞান-গম্য। সেই পরভাব "অক্ষরংব্রহ্মপরমং"=নিরবচ্ছিন্ন নির্গুণ, নিরুপাধিক সনাতন এবং অদ্বিতীয়। "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম" ; কেবল জ্ঞানী সাধকগণ যোগ-বলে ভক্তি-যুক্ত হইয়া সেই অক্ষয় পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণা করিতে পারেন। এইরূপ জ্ঞানীভক্ত সিদ্ধপুরুষ মৃত্যুকালে যোগ ধারণায় স্থিত হইয়া "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম" উচ্চারণ করিতে করিতে সেই পরব্রহ্মের অনুস্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করিতে পারেন। তাহার ফলে ভগবানের পরমধাম লাভ হয় তাঁহার পরমভাব প্রাপ্তি হয়।

ভগবান আরও বলিয়াছেন;—ভক্তদের মধ্যে, নিত্যযুক্ত একভক্তি জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। *

জ্ঞানরূপ নৌকারোহণ করিলে সর্ব্বপ্রকার পাপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়। †

উপরিউক্ত উপদেশ দ্বারা জ্ঞানী ভক্তের নির্গুণ উপাসনার কথাই বলা হইয়াছে। বুঝা যায়, নির্গুণব্রহ্মের উপাসনাকরা, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করা উভয়ই শ্রীভগবানের অভিপ্রেত, আরও বুঝা যায়, বিশ্বরূপী সগুণব্রহ্মের উপাসনাতে পরমপদ লাভ হয়। এবং অব্যক্ত অক্ষর পরব্রহ্মের উপাসনাতেও সেই একই ফল, অর্থাৎ পরমপদ লাভ হয়। গন্তব্যস্থান একই। কিন্তু অধিকারী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন পথ।

এই উভয় ভাবের উপাসনা মধ্যে অর্থাৎ সগুণ উপাসনা এবং নির্গুণ উপাসনা মধ্যে কোন ভাবের উপাসনা শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন জানিবার ইচ্ছুক হইয়া ভগবানকে

---

* " তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে
প্রিয়োহি জ্ঞানীনোঽত্যর্থ মহং স চ মমপ্রিয়ঃ।।
গীতা = ৭—১৭ ।।

† সর্ব্বংজ্ঞান প্লবে নৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ।। †

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন * যে সকল ভক্ত উক্তরূপ (শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, এবং পদসেবন প্রভৃতি) ভক্তি সহকারে সর্ব্বদা তদীয় যোগযুক্ত হইয়া তোমাকে উপাসনা করেন, এবং যে সকল ভক্ত নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেন, এই দ্বিবিধ ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী কাহারা? *

যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন এবং যাঁহারা নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, এই উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী ভক্ত কে?

উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন;—

যে বিশ্বরূপ আমাতে মন সমাহিত করিয়া এবং আমাতে সতত যুক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট (সাত্ত্বিকী) শ্রদ্ধাদ্বারা আমার অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের আরাধনা বা চিন্তা করে, সেই যোগী শ্রেষ্ঠ—যুক্ততম। †

যাঁহারা অব্যক্ত অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মভাব লাভ করেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই গতিলাভ করা বড়ই কঠিন এবং অত্যন্ত ক্লেশকর। দেহাভিমান থাকা পর্য্যন্ত সেইরূপ উপাসনা করা এবং তাহার ফল পরমব্রহ্মপদ লাভকরা অসম্ভব।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন;—যাঁহারা ইন্দ্রিয়সংযম, সর্ব্বভূতহিতানুষ্ঠান করিয়া এবং সর্ব্বত্র সমদর্শন হইয়া অনির্দ্দেশ্য, রূপাদিহীন, সর্ব্বব্যাপী, অচিন্তনীয় বিশ্ব প্রপঞ্চের অধিষ্ঠাতা, নিষ্ক্রিয় এবং নির্ব্বিকার ব্রহ্মস্বরূপ আমাকে উপাসনা করেন, তাঁহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাদৃশ ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত যোগীগণের অধিকতর ক্লেশ; যেহেতু দেহাভিমানী পুরুষের ব্রহ্মনিষ্ঠা দুর্ঘট।

---

§ এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যেচাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥
গীতা = ১২—১।

‡ ময্যাবেশ্যমনোযেমাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়াপরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমামতাঃ॥
গীতা = ১২—২।

অব্যক্তের—তাঁহার বাচক ওঁকারের উপাসনা করিতে হইলে তাঁহাকে সেইরূপ অধিকারী হইতে হইবে। ‡

তত্ত্বজ্ঞানী না হইলে দেহাভিমান দূর হয় না। দেহাভিমান দূর না হইলে অব্যক্তের উপাসনা হয় না। সেইজন্য এইপথ অতি দুর্গম, এবং উপাসনা অতিশয় কষ্টসাধ্য। বহুজন্মের সাধনায় জ্ঞান পরিপাক হইলে পরব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি হয় বা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়।

কিরূপ অবস্থায় পৌঁছিলে অব্যক্তের উপাসনার অধিকারী হইতে পারে?

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন ;—

(১) যাঁহারা সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে সংযত ও প্রত্যাহৃত করিয়া উহাদিগকে নিজের বশীভূত করিতে পারিয়াছেন।

(২) যাঁহারা সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি অর্থাৎ ইষ্ট অনিষ্ট লাভে এবং শত্রু মিত্রে সমান জ্ঞান করিতে পারিয়াছেন।

(৩) যাঁহারা সর্ব্বভূতের হিতকারী হইতে পারিয়াছেন।

দেখা যাইতেছে তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া দেহাভিমান দূর না হইলে কেহই উক্ত তিনরূপ অবস্থাপন্ন হইতে পারেন না। এইরূপ হওয়া কঠোর সাধনা সাধ্য।

সগুণ উপাসক দিগের গন্তব্য পথ সুগম। উপাসনাও অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। অধিকারী বিবেচনায় সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা সকলের অবলম্বনীয়। অর্জ্জুনকে সেইরূপ অধিকারী মনে করিয়া শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের পক্ষে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা

‡ " যেত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
সং নিয়ম্যেন্দ্রিয় গ্রামং সর্ব্বত্রসমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূত হিতে রতাঃ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তা সক্ত চেতসাম্।
অব্যক্তাহি গতির্দ্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

গীতা— ১২—৩। ৪। ৫॥

শ্রেষ্ঠ বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন ; এবং এই উপলক্ষে সমস্ত মনুষ্যকে সগুণ ব্রহ্মের ভক্ত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। জ্ঞানী ভক্ত হওয়া বড়ই কঠিন। সাংখ্য জ্ঞানী লোকের সংখ্যা খুব কম।

যখন দুই পথ দিয়া একই গন্তব্যস্থানে যাওয়া যায়, তখন যে পথ সরল, সুগম এবং অল্পায়াস-গম্য, সেইপথই শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। ক্লেশ-গম্য দুর্গমপথ শ্রেষ্ঠ হইলেও সাধারণেরপক্ষে উহা অবলম্বনীয় নহে। উহা যোগ-সিদ্ধ জ্ঞানী সাধকদিগের গম্য।

ভক্তিযোগে প্রথমতঃ ভগবানের স্থূল বিভূতির ভজনা আরম্ভ করিয়া চিত্ত একাগ্র ও পবিত্র করিতে পারিলে ক্রমে সূক্ষ্মতর বিভূতি বা ভাবের ভজনার মধ্য দিয়া শেষে ভগবানের পরমভাবের ভজনায় পৌঁছিতে পারা যায়।

নিম্ন উচ্চ অধিকারী ভেদে যে যে ভাবে ভগবানের ভজনা করেন, ভগবান্ সেইভাবে তাঁহার ভক্তকে ফলদান করেন।

বর্ণ এবং আশ্রমধর্ম্ম পালনকরা সকলেরই কর্ত্তব্য। শ্রীভগবান্ গীতায় এই উপদেশ দৃঢ়ভাবে দিয়াছেন। এইজন্য অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতেই উপদেশ দিয়াছেন। যথাযথরূপে বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম করিলেই ভগবানের ভজনা করা হয়। তাহাতেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন ;—

"স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।"

গীতা = ১৮—৪৫ ॥

স্বকর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি সংসিদ্ধি (তত্ত্ব-জ্ঞান) লাভ করেন।

প্রারব্ধকর্ম্ম সংস্কার (অদৃষ্ট) অনুসারে দেহধারণ হয়। অন্তর্যামীরূপে ভগবান্ সকলের হৃদয়ে থাকিয়া কর্ম্মে-প্রেরণা করেন। এই ভাবনা করিয়া অহঙ্কার-বুদ্ধি ত্যাগ করতঃ ঈশ্বর-প্রীত্যর্থে সমস্ত কর্ত্তব্য-কর্ম্ম করিলেই ভগবানের সম্যক ভজনা হয়। ইহাই জ্ঞান-যজ্ঞ। তাহাতেই পরম শ্রেয়ঃ বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়।

জ্ঞানেই সকল কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয়। সকল কর্ম্মই পরে জ্ঞানে পরিণত হয়। §

শ্রুতিতেও ইহার প্রমাণ আছে ;—

"সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চিৎ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি।"

প্রজাগণ যাহা কিছু সৎকর্ম্ম করিয়া থাকে তৎসমস্তই জ্ঞানালোকে পঁহুছিয়া থাকে। অর্থাৎ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়। জ্ঞানলাভই মুক্তি।

ভগবানের ভজনা করিতে কোন ক্লেশ নাই। ইন্দ্রিয়সংযম করিতেই যত কিছু বেগ পাইতে হয়। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মানুযায়ী কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে করিতেই চিত্তশুদ্ধ হয় এবং ইন্দ্রিয় বশীভূত হয়।

ইষ্টাপূর্ত্ত করিতে, বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে, বহু অর্থের প্রয়োজন হয়। ভগবানের ভজনায় কি সেইরূপ অর্থের প্রয়োজন?

শ্রীভগবান্ পরম দয়ালু, তিনি বলিয়াছেন ;—যে শুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তি ভক্তি-সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল বা জল প্রদান করে সেই ভক্তির উপহার আমি স্বয়ং গ্রহণ করিয়া থাকি। *

যাঁহার প্রচুর ধন-সম্পত্তি আছে, তিনি বিত্তশাঠ্য করিয়া কাজ করিলে তাহার ফল না পাইবারই কথা। কিন্তু সকল মনুষ্যই অবস্থানুসারে, যে যাহা করে, যাহা খায়; যাহা দ্বারা যজ্ঞ করে, তাহা ভগবানের প্রীত্যর্থে করিলাম এবং "ফল ভগবান্‌কে দিলাম," এই ভাবনা করিলেই ভগবানের উৎকৃষ্ট ভজনা হয়। তাহা হইলে তাঁহার শুভাশুভ কর্ম্ম-বন্ধন হয় না ; তত্ত্ব-জ্ঞান লাভে মুক্তিপদ প্রাপ্তি হয়। ভগবানের ভজনায় অর্থের প্রয়োজন হয় না। তিনি চান, হৃদয়ের ভালবাসা এবং অকপট শ্রদ্ধা ও ভক্তি।

---

§ "সর্ব্বংকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।"

গীতা—৪—৩৩॥

* "পত্রংপুষ্পংফলংতোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামিপ্রযতাত্মনঃ॥

গীতা—৯—২৬॥

ধনেশ্বর কুবের তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য-সম্ভার দ্বারা আদ্যাশক্তির পূজা করিয়া তাঁহার যেরূপ প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলেন, সংযম-ধন ব্রহ্মচারী ভিক্ষুক সাধক ভক্তিসহকারে মহামায়ার শ্রীপদে রক্তজবা এবং বিল্বদল অর্পণ করিয়া আদ্যাশক্তি মহামায়াকে সেইরূপই প্রসন্না করিয়াছিলেন।

ভগবানের ভজনায় বাহ্য বস্তুর অপেক্ষা করে না। ভাবনা-মূলক উপাদানেতেই ভগবানের আরাধনা হয়। অকপটে ভগবানকে ভালবাসা চাই এবং কামনাশূন্য হইয়া নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সমস্তই ভগবানের অভয়পদে অর্পণ করিতে হয়।

ভক্তি সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা লিখিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পব সম্পূর্ণ-সংশ্লিষ্ট, জ্ঞানছাড়া ভক্তির এবং ভক্তি ছাড়া জ্ঞানের পূর্ণতা হয় না। কাঁচা-জ্ঞান কাঁচা-ভক্তি, পাকাজ্ঞান পাকাভক্তি। পরাভক্তি মিশ্রজ্ঞানই পরমজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান। পরজ্ঞান-মিশ্র ভক্তি পরাভক্তি, জ্ঞানের তারতম্যানুসারে ভক্তিরও তারতম্য হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে জ্ঞানের ন্যূনাধিক্য অনুসারে ভক্তিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা-হইয়াছে। যথা—যিনি সর্ব্বভূতেই আত্মার ভগবদ্ভাবকে প্রত্যক্ষ করেন এবং আত্মাতেই সর্ব্বভূতকে প্রতিষ্ঠিত দেখেন, তিনিই উত্তম ভক্ত। কারণ তিনি তত্ত্বজ্ঞানী। †

যিনি ভগবানে প্রেম, ভগবদ্ভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞানের প্রতি কৃপা, এবং শত্রুর প্রতি উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যমভক্ত। কারণ এই ভক্তের ভেদজ্ঞান দূর হয় নাই। ‡

---

† "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

‡ "ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষুদ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥"

যে ভক্ত তাঁহার আরাধ্য দেবতাকে শ্রদ্ধার সহিত ভজনা করেন, ভগবদ্ভক্ত বা অন্যের প্রতি সেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হন না তিনি অধম ভক্ত। কারণ এই ভক্তের মনের তমোভাব যায় নাই। §

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞ জ্ঞানীর, সিদ্ধযোগীর এবং ভগবদ্ভক্তের যে সমস্ত লক্ষণ বর্ণিত আছে, পরস্পর তুলনা করিলে বুঝা যায়, জ্ঞানী, যোগী এবং ভক্ত একই লক্ষণাক্রান্ত। যিনি জ্ঞানী, তিনিই যোগী এবং তিনিই ভক্ত।

গীতোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ জ্ঞানীর লক্ষণ এই ;—

পুরুষ যখন চিত্ত-নিহিত সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করেন, আত্মাতেই স্বয়ং তুষ্ট হইয়া অবস্থিতি করেন, সেই সময়ই তিনি "স্থিতপ্রজ্ঞ" নামে উক্ত হন। যাঁহার চিত্ত দুঃখে উদ্বিগ্ন হয়না, বিষয়সুখে নিস্পৃহ এবং যাঁহার প্রীতি, ভয় ও ক্রোধ নিবৃত্তি হইয়াছে, সেই "স্থিতপ্রজ্ঞ নামে" কথিত। যাঁহার দেহাদি পদার্থে আদৌ স্নেহ নাই, প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্তিতে যিনি প্রশংসা বা নিন্দা করেন না, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে অর্থাৎ তিনিই "স্থিতপ্রজ্ঞ।" কূর্ম্ম যেমন নিজ শিরঃ পদাদি অঙ্গ অনায়াসে সঙ্কোচ করিয়া লয় সেইরূপ যিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে ইচ্ছামত প্রত্যাহার করিতে পারেন, তিনিই "স্থিত প্রজ্ঞ" ॥ *

---

§ "অর্চ্চয়া মেব হরয়ে পূজাং য শ্রদ্ধয়েহহতে।
নতদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥"

* প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগ ভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি নদ্বেষ্টি তস্যপ্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

গীতা—২—৫৫।৫৬।৫৭।

সেই জ্ঞানে প্রবিষ্টবুদ্ধি, জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানাভিনিবেশ এবং জ্ঞানপরায়ণ ব্যক্তিগণ জ্ঞানপ্রভাবে পাপপুণ্য বর্জ্জিত হইয়া কৈবল্য প্রাপ্ত হন। তাদৃশ জ্ঞানীগণ বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর এবং শপচ নামক অতি নীচ জাতিতেও সমদর্শী হইয়া থাকেন; সর্ব্ব পদার্থেই অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ দর্শন করেন। †

গীতোক্ত সিদ্ধ যোগীর লক্ষণ এই :—

মরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যিনি কাম ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে ইহজীবনে সমর্থ তিনি জ্ঞানী এবং সুখী। যাঁহার আত্মাতেই সুখ, আত্মাতেই ক্রীড়া অর্থাৎ যিনি আত্মারাম, আত্মাতেই যাঁহার দৃষ্টি সেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মেই লয় প্রাপ্ত হন। সর্ব্বভূত-হিতপরায়ণ, সংযতচিত্ত, সংশয়হীন পাপাদিদোষশূন্য যোগিগণ ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন। যিনি ইন্দ্রিয়, মন, এবং বুদ্ধিকে সংযত করিয়াছেন, ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ শূন্য, মুক্তি পরায়ণ যোগী, তিনি জীবন্মুক্তি ও কৈবল্য মুক্তি প্রাপ্তহন"।*

---

† "তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠা তৎ পরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূত কল্মষাঃ॥
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণেগবিহস্তিনি।
শুনিচৈবশ্বপাকেচ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

গীতা ৫—১৭।১৮

* শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌শরীর বিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং সযুক্তঃ স সুখী নরঃ॥
যোঽন্তঃ সুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগীব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধাযতাত্মনাঃ সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ॥
যতেন্দ্রিয় মনো বুদ্ধি র্মুনির্মোক্ষ পরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥

গীতা—৫—২৩।২৪।২৫।২৮

শীতোষ্ণ, সুখ, দুঃখ এবং মান, অপমানে নির্ব্বিকার জিতেন্দ্রিয় পুরুষেরই আত্মা সমাধিযুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিতৃপ্তচেতা, নির্ব্বিকার, জিতেন্দ্রিয় এবং লোষ্ট্র, পাষাণও কাঞ্চনে সমদর্শী যোগীকে যুক্ত সমাহিত বা সমাধিযুক্ত বলা যায়। ৮॥ সুহৃদ্, মিত্র, শত্রু, উদাসীন মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, স্বজন, সাধু এবং পাপিষ্ঠ এই সকল ব্যক্তিতে সমদর্শী যে পুরুষ তিনি বিশিষ্ট যোগী। সর্ব্বত্র সমদর্শী আত্মযোগী আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করেন *

গীতোক্ত ভগবানের প্রিয় ভক্তের লক্ষণ এই ঃ—

সর্ব্বভূত বিদ্বেষশূন্য, মৈত্রীও করুণা-বিশিষ্ট নির্ম্মল, নিরহঙ্কার সুখ দুঃখে ক্ষমাশীল সতত সন্তুষ্ট প্রমাদহীন, সংযতস্বভাব দৃঢ় নিশ্চয়, আমাতে অর্পিত চিত্ত এবং আমাতেই স্থাপিত বুদ্ধি মদীয় ভক্ত আমার প্রিয়।

যাহা হইতে লোক উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, লোক হইতেও যিনি উদ্বেগপ্রাপ্ত হন না এবং হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ যাঁহার নাই সেই ভক্ত আমার প্রিয়।

---

† জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সম লোষ্টাশ্ম কাঞ্চনঃ॥
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন মধ্যস্থ দ্বেষ্য বন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্ব্বিশিষ্যতে॥
সর্ব্ব ভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ "গীতা—৬—৭।৮।৯।২৯

§ অদ্বেষ্টা সর্ব্ব ভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এবচ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখ সুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ॥
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্যোমেভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নো দ্বিজতে লোকো লোকান্নো দ্বিজতে চয়ঃ।
হর্ষামর্ষ ভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দ্দক্ষঃ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যোনহৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান যঃ স মে প্রিয়ঃ॥

নিস্পৃহ, শুচি, আলস্যরহিত, পক্ষপাতহীন মন ব্যথাশূন্য এবং সর্ব্বপ্রকার কাম্যকর্ম্মে প্রবৃত্তি বর্জ্জিত মদীয় ভক্ত আমার প্রিয়।

যাঁহার হর্ষ দ্বেষ নাই, শোক, আকাঙ্ক্ষা নাই, এবং যিনি শুভ অশুভ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই ভক্ত আমার প্রিয়।

শত্রু, মিত্র, মান, অপমান, শীত, উষ্ণ ও স্তব নিন্দা যাঁহার সমান্, যিনি সঙ্গ-বর্জ্জিত মৌনী ও স্থির বুদ্ধি এবং যিনি একস্থানে অধিক দিন অবস্থান করেন না এবং অযাচিত যৎকিঞ্চিৎ লাভেই সন্তুষ্ট সেই ভক্ত আমার প্রিয়।

যে সকল ভক্ত উক্ত প্রকার মুক্তি সাধন ধর্ম্ম এবং মৎপরায়ণ হইয়া শ্রদ্ধা সহকারে উপাসনা করেন তাহারা আমার অত্যন্ত প্রিয় *

স্থিত প্রজ্ঞ জ্ঞানী, জ্ঞানসাধনা দ্বারা, সিদ্ধযোগী যোগসাধনা দ্বারা এবং পরমভক্ত ভক্তিসাধনা দ্বারা প্রত্যেকেই নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি লাভ করিয়া ফলস্বরূপ ব্রহ্মভূত হইয়া যান। গীতায় তাহার বর্ণনা আছে :—

আত্মাতেই যাহার ভালবাসা, অধ্যাত্ম সাধনেই যাহার তৃপ্তি, আত্মজ্ঞানে যাহার তুষ্টি, এরূপ জ্ঞানীর অবশ্য করিতে হইবে এমন করণীয় কোন কর্ম্ম নাই।*

সর্ব্বত্র অনাসক্ত বুদ্ধি, জিতাত্মা ও স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি সন্ন্যাস দ্বারা পরম নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।

সমঃ শত্রৌচ মিত্রেচ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু সমঃ সঙ্গ বিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্য নিন্দা স্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতি র্ভক্তি মান্মে প্রিয়ো নরঃ॥
যেতু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্ধমানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীবমে প্রিয়াঃ॥
গীতা—১২—১৩ ১৪।১৫।১৬।১৭।১৮।১৯।২০॥

* "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্ট স্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥
গীতা — ৩—১৭॥

হে কৌন্তেয় ! এইরূপ সিদ্ধব্যক্তি যেরূপে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁহার পরম জ্ঞাননিষ্ঠা যাহাতে হয় আমি সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত ধৈর্য্যদ্বারা সংযতবুদ্ধি, শব্দাদি বিষয়ও রাগদ্বেষ পরিত্যাগী, নির্জ্জনস্থান বাসী, বাক্য মন এবং শরীর সংযমী, নিত্যধ্যানযোগ-পরায়ণ, বৈরাগ্যবান, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহপরিত্যাগী, নির্ম্মল ও বিক্ষোভ-শূন্য মনুষ্য ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কারের উপযুক্ত।

ব্রহ্মেস্থিত অর্থাৎ ব্রহ্মভাবাপন্ন প্রসন্নচিত্ত, শোকে অনুদ্বিগ্ন, অনাকাঙ্ক্ষী, সর্ব্বভূতে সমদর্শী ব্যক্তি আমার সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেন।

তৎপর এই জ্ঞান প্রভাবেই পরমভক্তি দ্বারা আমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপবিদিত হইয়া সাধক আমাতেই প্রবেশ করেন। *

এইরূপে ঈশ্বর পরায়ণ জ্ঞানী, যোগী এবং ভক্ত প্রত্যেকে একই গতিলাভ করেন অর্থাৎ মুক্তি লাভ কবেন।

‡ অসক্ত বুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥
সিদ্ধিং প্রাপ্তোযথাব্রহ্মতথাপ্নোতি নিবোধমে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্যচ ;
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগ দ্বেষৌব্যুদস্যচ ॥
বিবিক্তসেবীলঘ্বাশী যত বাক্কায় মানসঃ।
ধ্যানযোগ পরো নিত্যং বৈরাগ্য সমুপাশ্রিতঃ ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

গীতা—১৮—৪৯।৫০।৫১।৫২।৫৩।৫৪।৫৫ ।

বহু জন্মের তপস্যার ফলে প্রারব্ধ সাংখ্য জ্ঞানের সংস্কার লইয়া সত্ত্বগুণ-প্রধান হইয়া যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আত্মজ্ঞান সাধনায় তাঁহারাই অধিকারী। এই সাধনা অত্যন্ত কঠিন।

যোগসাধনায় ও প্রণায়াম, যম নিয়ম ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া এবং ঈশ্বর প্রণিধান করিয়া যোগসিদ্ধ হওয়াও অত্যন্ত কঠিন। এইরূপ অধিকারী হওয়া চাই।

কিন্তু ভক্তিযোগের সাধনা উক্ত দুই সাধনা হইতে অপেক্ষাকৃত সুগম—ইহাতে আপামর সাধারণ সকলেরই অধিকার আছে। সেইজন্য পরম দয়ালু শ্রীভগবান্ সকলকেই দৃঢ়ভাব সহিত পুনঃপুনঃ ভক্ত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন তিনি ভক্তদিগকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিবেন এবং তাঁহার ভক্ত কখনই নষ্ট হইবে না।

শ্রীভগবান্ বহুবার ভক্ত হইতে উপদেশ দিয়াছেন।

যাহা কর, যাহা খাও, যে যজ্ঞ কর, তৎসমস্তই আমাকে দেও।

যখন দুঃখময় অনিত্য সংসার লাভ করিয়াছ, তখন আমাকেই ভজনা কর।

আমাতেই মন রাখ, আমার ভক্ত হও, আমার পূজক হও, আমাকে নমস্কার কর।

আমাতে মন স্থির কর, আমাতেই বুদ্ধি অভিনিবেশ কর। অভ্যাস করিতে করিতে, অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর।

---

† "যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং।
অনিত্যমসুখংলোকমিমং প্রাপ্যভজস্বমাম্।
মন্মনাভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
গীতা—৯—২৭—৩৩—৩৪।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়িবুদ্ধিং নিবেশয়।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়।

আমার প্রীত্যর্থে কর্ম্মানুষ্ঠান কর।

সংযত হইয়া সকল কর্ম্মের ফল আমাব উদ্দেশ্যে ত্যাগ কর।

অন্তঃকরণের সহিত সকল কর্ম্ম আমাকে অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হও।

ঈশ্বর তোমার হৃদয়ে স্থিত, সর্ব্বপ্রকারে সেই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও।

মদেকচিত্ত হও, মদ্‌ভক্ত হও, আমাব পূজক হও, এবং আমাকে নমস্কার কর।

ধর্ম্মাধর্ম্ম সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অমার শরণাপন্ন হও; আমি তোমাকে সকল প্রকারে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিব। শোক করিও না। †

প্রহ্লাদ পাকাজ্ঞানী ও পাকা ভক্ত ছিলেন। তিনি অনুক্ষণ, পরব্রহ্ম হরির ধ্যানপরায়ণ ছিলেন। তাঁহাব অন্তবে বাহিরে সমস্ত বস্তুই হরিময় দেখিতেন। প্রহ্লাদ ধ্যানমগ্ন হইয়া ভগবানের স্তব করিতে করিতে পরব্রহ্ম হরির সহিত মিলিয়া তন্ময় হইয়া যাইতেন। তখন তাঁহার নিজেব জীবভাব, দেহাভিমান, এবং নামরূপ সমস্তই লোপ হইয়া যাইত। তিনিই ব্রহ্ম, এইরূপ অনুভব করিতেন।

"ভক্তগণ ভক্তিদ্বারা তত্ত্বতঃ আমাকে জানিয়া আমাতেই প্রবেশ লাভ করে;" গীতায় ভগবানেব এই উপদেশ, "যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান।" শ্রুতিরও এই উপদেশ।

মৎ কর্ম্মপরমো ভব।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্।
গীতা—১২—৮।৯।১০।১১।

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব।
তমেবশরণংগচ্ছ, সর্ব্বভাবেন ভারত।
মন্মনাভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাংনমস্কুরু।
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িস্যামি মাশুচ।

গীতা—১৮—৫৭।৬২।৬৫।৬৬।

আমরা বিষ্ণুপুরাণে, প্রহ্লাদের চরিত্র পাঠকরিয়া এই উপদেশের সার্থকতা বুঝিতে পারি।

প্রহ্লাদ তাহার পিতা হিরণ্যকশিপু কর্তৃক সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। সমুদ্রজলে প্রহ্লাদের উপর শতযোজন পথ পর্ব্বত চাপা দেওয়া হইয়াছিল। পরম ভক্ত মহামতি প্রহ্লাদ সেই অবস্থায় ভগবানের ধ্যানরত হইয়া স্তব করিয়াছিলেন ;

এই জগৎ যাহা হইতে অভিন্ন, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার করি ! সেই জগৎ কারণ ধ্যেয়, অব্যয় আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

অক্ষয় অব্যয় এই বিশ্ব যাহাতে ওতপ্রোত ভাবে আছে, সকলের আধারভূত সেই হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

যাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন সেই বিষ্ণুকে নমস্কার। যিনি সর্ব্ব তাঁহাকে নমস্কার, যাঁহাতে সমস্ত লীন হয়, তাঁহাকে নমস্কার।

অনন্তের সর্ব্বব্যাপিত্ব জন্য তিনিই আমি ; আমা হইতে সমস্ত উৎপন্ন ; আমিও সর্ব্বরূপে বর্ত্তমান এবং সনাতন রূপ আমাতেই সমস্ত লয় প্রাপ্ত হইবে।

আমিই সৃষ্টির পূর্ব্বে অক্ষর, নিত্য ও আত্ম সংশ্রয় ব্রহ্ম নামক পরমাত্মা এবং আমিই শেষে পরম পুরুষ। ‡

---

‡ নমোঽস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ যস্যাভিন্ন মিদং জগৎ।
ধ্যেয়ং স জগতামাদ্যঃ প্রসীদতু সমাব্যয়ঃ॥ ৮২॥
যত্রোতমেতৎ প্রোতঞ্চ বিশ্বমক্ষরমব্যয়ম্।
আধার ভূতঃ সর্ব্বস্য স প্রসীদতু মে হরিঃ॥ ৮৩॥
নমোঽস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ নমস্তস্মৈ পুনঃ পুনঃ।
যত্র সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃসর্ব্বং সর্ব্বসংশ্রয়ঃ॥ ৮৪॥
সর্ব্ব গত্বাদনন্তস্য স এবামবস্থিতঃ।
মত্তঃ সর্ব্বমহংসর্ব্বংময়ি সর্ব্বং সনাতনে॥ ৮৫॥
অহমেবাক্ষয়ো নিত্যঃ পরমাত্মাত্মসংশ্রয়।
ব্রহ্মসংজ্ঞোঽহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃ পুমান্॥ ৮৬॥"
বিষ্ণু পুরাণ—প্রথমাংশ = ১৯—৮২।৮৩।৮৪।৮৫।৮৬॥

বিষ্ণু অনন্ত—সর্ব্বব্যাপী। তিনি ছাড়া কোন বস্তু নাই। অতএব আমিই বিষ্ণু, আমা হইতে সমস্ত উৎপন্ন এবং আমি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান। আমি সনাতন— আমাতেই সমস্ত লয় পাইবে। সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম, পরেও আমিই থাকিব। ভক্ত প্রহ্লাদের এরূপ অর্থাৎ তিনি এবং পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ একই; এই জ্ঞান দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। ভক্ত প্রহ্লাদের ইহাই শেষ পরিণতি! ভক্তের মহিমা অতীব বিস্ময়কর!! ভগবদ্ভক্ত হওয়া জীবের পরম পুরুষার্থ—বা মুক্তি!!!

ভক্তি বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবৎ অতি উৎকৃষ্ট—উপাদেয় গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা আছে, তাহার তুলনা নাই। ভক্ত ভিন্ন সেই ভক্তিরস আস্বাদন করা অন্যের সাধ্য নাই।

ভক্তিতত্ত্ব প্রচারের জন্য নদীয়ায় শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব। বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া মানেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তভাব আচরণ করিয়া জীবকে ভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন এবং প্রমাণ স্বরূপ—শ্রীমদ্ভাগবতের বহু শ্লোক বহু স্থানে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা করিয়া মধুময় পরম পবিত্র ভক্তি তত্ত্বের মাধুর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে ভাগবতের;—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্য হৈতুকীং ভক্তি মিত্থম্ভূত গুণো হরিঃ॥"

ভাগবৎ ১—৭।১০

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা অষ্টাদশ প্রকারে করিয়া অহৈতুকী ভক্তিই জীবের পরম পুরুষার্থ বলিয়া সার্ব্বভৌমকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। বেদান্তে তাঁহার অসীম অধিকারছিল। সার্ব্বভৌমের বেদান্তের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারদিগের মত বেদান্ত সূত্রের অনুরূপ নহে, বেদান্ত দর্শনে ভক্তি তত্ত্বের বিশেষ ব্যাখ্যা নাই, মহাপ্রভু এইরূপ বলিয়া, বৈদান্তিক পণ্ডিতদিগকে মায়াবাদী বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে ভক্তিতত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তিতত্ত্ব বুঝিতে হইলে পরব্রহ্ম সম্বন্ধে মহাপ্রভুর মত কি ? তাহা বুঝিতে হয়। কোন কোন বৈষ্ণবদিগের মতে মহাপ্রভু দ্বৈতবাদী, তাঁহার মতে জীব ব্রহ্মে নিত্যভেদ। কাহারও মতে তিনি অচিন্ত ভেদাভেদ বাদী, শ্রীকৃষ্ণই পরম তত্ত্ব ;—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিতানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং ॥

ব্রহ্মসংহিতা—৫।১

শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা—নির্গুণ বা নির্ব্বিশেষ নহেন। তিনি সাকার এবং সগুণ। কিন্তু তিনি প্রাকৃত গুণবিশিষ্ট নহেন।

"ষড় বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তি বিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান—পরম সাহস ॥
মায়াধীশ মায়াবশ—ঈশ্বর জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সনে করহ অভেদ্ ?
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তিকরি মানে।
হেন জীবে অভেদ কর ঈশ্বরের সনে ?"

চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।"

অর্থাৎ পরম তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ এবং জীবের মধ্যে সেব্য-সেবক সম্বন্ধ নিত্যই থাকিবে।

জীব দুই প্রকার ;—

(১) নিত্যযুক্ত নিত্য কৃষ্ণ চরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণ পারিষদ্ নামে ভুঞ্জে সেবা-সুখ ॥

(২) নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হইতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্যসংসারী ভুঞ্জে নরকাদি দুখ্ ॥

মুক্তিকামী ও নিত্যবদ্ধ। অবিদ্যা মায়া পিশাচীর হাত এড়াইতে পারে না।

সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।
কাম ক্রোধের দাস হইয়া তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায়॥
তার উপদেশ মাত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায়॥

বৈষ্ণবদিগের মতে কৃষ্ণের নিকট যাইয়া নিত্য কৃষ্ণসেবা করাই পরম পুরুষার্থ।

"কৃষ্ণ প্রাপ্য—সম্বন্ধ ভক্তি—প্রাপ্যের সাধন।"—ভক্তিদ্বারাই কৃষ্ণ লভ্য হন।

"কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনাজ্ঞানে॥

মহাপ্রভুর মতে জ্ঞান বিনা কেবল ভক্তি দ্বারাও মুক্তি লাভ হইতে পারে; কিন্তু ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্তি লাভ হইতে পারে না।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মতে অহৈতুকী ভক্তি কি?

হেতুশূন্য ভক্তিই অহৈতুকী ভক্তি। হেতু কি?

"হেতু শব্দে কহে ভুক্তি আদি বাঞ্ছান্তরে।
ভুক্তি, সিদ্ধি, মুক্তি—মুখ্য এ তিন প্রকারে॥"

সাধারণতঃ তিন প্রয়োজনে মনুষ্য ভগবানের ভজনা করে। ভোগৈশ্বর্য্যের জন্য, সিদ্ধিলাভের জন্য এবং মুক্তিলাভের জন্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মুক্তি কামনাও কামনার মধ্যে গণ্য করিয়া উক্ত তিনপ্রকার হেতু ত্যাগ করতঃ কেবল নিত্য ভগবদ্ভজনা করাই জীবের পুরুষার্থ এই উপদেশ দিয়াছেন। ইহাই তাঁহার মতে মুক্তি।

অহৈতুকী ভক্তি সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে মহামুনি গর্গ কৃত শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রে

এইরূপ উক্তি আছে ;—

হেকৃষ্ণ জগতাং নাথ ভক্তানাং ভয়ভঞ্জন।
প্রসন্নো ভবমামীশ দেহি দাস্যং পদাম্বুজে ॥ ১ ॥
ত্বৎপিত্রা মে ধনং দত্তং তেন কিং মে প্রয়োজনং।
দেহি মে নিশ্চলাং ভক্তিং ভক্তানামভয়প্রদাং ॥ ২ ॥
অনিমাদিষু সিদ্ধেষু যোগেষ্ মুক্তিষু প্রভো।
জ্ঞান তত্ত্বেঽতত্ত্বে বা কিঞ্চিন্নাস্তি স্পৃহাম্ ॥ ৩ ॥
ইন্দ্রত্বে বা মনুত্বে বা স্বর্গভোগফলংচিরম্।
নাস্তি মে মনোসো বাঞ্ছাত্বৎপাদসেবনংবিনা ॥ ৪ ॥
সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য স্বারূপ্যৈকত্বমিপ্সিতম্।
নাহং গৃহ্ণামিতে ব্রহ্মন্ ত্বৎপাদসেবনংবিনা ॥ ৫ ॥
গোলোকে বাপি পাতালে বাসে তুল্যং মনোরথম্।
কিন্তু তে চরণাম্বুজে সততঃ স্মৃতিরস্তমে ॥ ৬ ॥

হে জগতের নাথ। হে ভক্তদিগের ভয় ভঞ্জনকারি! হে শ্রীকৃষ্ণ! হে ঈশ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তোমার পদাম্বুজে দাস হইবার অধিকার দান কর।

তোমার পিতা আমাকে বহুধন দান করিয়াছেন; তাহাতে আমার প্রয়োজন কি? ভক্তদিগের অভয়-প্রদ নিশ্চলা ভক্তি আমাকে দান কর।

হে প্রভো! অনিমাদি সিদ্ধিতে, যোগে, মুক্তিতে, জ্ঞানতত্ত্বে বা অতত্ত্বে কিছু-তেই আমার স্পৃহা নাই।

হে প্রভো! তোমার পদসেবা ভিন্ন ইন্দ্রত্বে, মনুত্বে, বা চিরকাল স্বর্গ ভোগে আমার মনে কিঞ্চিন্মাত্রও স্পৃহা নাই।

হে ব্রহ্মণ! তোমার পদসেবা ভিন্ন সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য স্বারূপ্য বা ইপ্সিত একত্ব ইহার কোনটাই আমি গ্রহণ করিতে চাহি না

হে ব্রহ্ম! তোমার পদাম্বুজে সতত আমার স্মৃতি থাকুক। এই অবস্থায় আমি গোলোকে বা পাতালে বাস করা তুল্য মনে করি।

যাঁহারা এইরূপ নিষ্কাম ভক্ত, তাঁহারা ভগবানের পদসেবা করাই পরম পুরুষার্থ মনে করেন। তাঁহারা আর কিছুই চাহেন না। বৈষ্ণবগণ প্রায় সকলেই দ্বৈতবাদী। মহাবৈষ্ণব জ্ঞানী ভক্ত প্রহ্লাদ দ্বৈতমত ছাড়াইরা, সোহং ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে ইহার উল্লেখ হইয়াছে।

মহা প্রভুরমতে নিম্নলিখিত গুণগুলি বৈষ্ণব লক্ষণ, যথা ;—

"কৃপালু অকৃতদ্রোহ সত্য সারসম।
নির্দোষ বদান্য মৃদু শুচি অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক শান্ত কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম অনিহ স্থির বিজিত ষড়্গুণ॥
মিতভুক্‌অপ্রমত্ত মানদ অমানী।
গম্ভীর করুণ মৈত্র শুচি, দক্ষ মৌনি॥
এইসব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ।
সব কহা নাহি যায় করি দিক্ দর্শন॥"

চৈতন্য চরিতামৃত—মধ্যলীলা।

কিরূপে ভক্তিসাধনা করিতে হয়, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উহার বিস্তৃত উপদেশ আছে। বাহুল্য ভয়ে এই প্রবন্ধে লিখা হইল না।

তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

তৃণাপেক্ষাও নীচ হইয়া, বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া, নিজে অভিমান শূন্য হইয়া এবং অন্যকে সম্মান করিয়া সদা হরির আরাধনা করিবে।

ভক্তির সাধনা যে যে ভাবে হইতে পারে, তাহার উপদেশ শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য, এবং আত্ম-নিবেদন প্রভৃতির ভাবে এমনকি শত্রু ভাবেও ভগবদ্ভজনা হয়।

শিবগীতাতে ইহার প্রমাণ আছে ;—

নিয়মিত ভাবে ভগবানকে ভক্তি বা দ্রোহ—যাহা করা যায়, তাহাতেই ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া ভক্ত বা দ্রোহকারীকে বাঞ্ছাতীত ফল প্রদান করেন।*

যিনি যে ভাবে ভগবানকে ডাকিবেন. ভগবান সেই ভাবেই তাঁহার ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

হিরণ্যকশিপু, রাবণ, বক্রদণ্ড, শিশুপাল ও কংস, পূতনা ও বকাসুর প্রভৃতিকে শত্রু ভাবেই উদ্ধার করিয়া ছিলেন।

ভক্তগণ ভগবচ্চিন্তায় এবং তাঁহার নামকীর্ত্তনে যখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া তন্ময় হইয়া যান, তখন স্বেদ, কম্প, অশ্রু পুলক প্রভৃতি সাত্বিক ভাব বিকার গুলি ভক্ত শরীরে প্রকাশ পায়। শ্রীমদ্ভাগবতে ও চৈতন্যচরিতামৃতে ইহার বর্ণনা আছে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মপালন করিলে বিষ্ণুভক্তি লাভ হয় ; ইহাও বৈষ্ণবদিগের মত।

বর্ণাশ্রমাচাররতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থানান্যং তত্তোষকারণং॥"

বিষ্ণু পুরাণ ৩।৮।৯

"প্রভু কহে—পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে—স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥"

কৃষ্ণভক্তি পরমপুরুষার্থ বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃ। মহাপ্রভুর প্রশ্নে এবং রায় রামানন্দের উত্তরে ভক্তির প্রশংসা করিয়া তাহার প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

"প্রভু কহে কোন বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার ?
রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর।
কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন বড় কীর্ত্তি ?

---

* "নিয়মাদ্ যস্তু কুর্ব্বীত ভক্তিংবা দ্রোহমেব বা।
তস্যাপিচেৎ প্রসন্নোহসো ফলং যচ্ছতি বাঞ্ছিতম্॥"

কৃষ্ণপ্রেম ভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি।
সম্পত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি গণি ?
রাধাকৃষ্ণ প্রেম যার সেই বড় ধনী।
দুঃখ মধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুতর ?
কৃষ্ণভক্ত বিরহ বিনু দুঃখ নাহি আর।
মুক্ত মধ্যে কোন জীব মুক্ত করি মানি ?
কৃষ্ণপ্রেম যার সেই মুক্ত শিরোমণি।
গানমধ্যে কোন গান জীবের নিজ ধর্ম্ম ?
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যোগীতের মর্ম্ম।
শ্রেয়ঃ মধ্যে কোন শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার ?
কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর।
কাহার শরণ জীব করে অনুক্ষণ ?
কৃষ্ণনাম গুণ লীলা প্রধান শরণ।
ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য ধ্যান কোন্ ?
রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজ ধ্যানের প্রধান।
সর্ব্বত্যাগি জীবের কর্ত্তব্য কাহা বাস ?
ব্রজ-ভূমি বৃন্দাবন—যাহা লীলা রাস।
শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন শ্রেষ্ঠ শ্রবণ ?
রাধাকৃষ্ণ প্রেম কেলী কর্ণ রসায়ণ।
উপাস্যের মধ্যে কোম উপাস্য প্রধান ?
শ্রেষ্ঠ-উপাস্য—যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম।
মুক্তি ভুক্তি বাঞ্ছে যেই—কাহা দোহার গতি ?
স্থাবর দেহে দেবদেহে যৈছে অবস্থিতি।"

ভোগকামী দিগের পরকালে দেবদেহে বাঞ্ছনীয় ভোগ লাভ হইতে পারে ইহা বুঝিলাম। কিন্তু মুক্তি ইচ্ছা করিলে স্থাবর দেহ কেন লাভ হইবে গেল না।

এইমাত্র বুঝা যায়, বৈষ্ণবদিগের মতে ঈশ্বরের নিত্য দাস হওয়াই পরম পুরুষার্থ। তাঁহাদিগের মতে মুক্তি পদার্থ হেয়। ভক্তি পরম শ্রেষ্ঠ পদার্থ।

বৈষ্ণবদিগের স্বতন্ত্রমত এই যে, জ্ঞান অবান্তর পদার্থ—ভক্তি হইতে হীন।

"অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফল।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র মুকুল॥
অভাগীয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণ প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান॥

ভক্তিই শ্রেষ্ঠ ঃ—

"ভগবানে ভক্তি পরম পুরুষার্থ হয়।"
"আত্মারাম পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর ভজন।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগান॥"

যিনি মহাভাগবৎ অর্থাৎ পরম ভক্ত তাঁহার শেষাবস্থা বা পরিণতি এইরূপ হয় যথা ;—

"মহা ভাগবৎ দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাহা তাহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তাঁর মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্ট দেব স্ফূর্ত্তি॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রাধাকৃষ্ণের স্বরূপ এবং ভক্তির অবস্থা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামের বর্ণনা আছে? নিম্নে সংক্ষেপতঃ কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল ;—

"সচ্চিদানন্দ তনু ব্রজের নন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরস-পূর্ণ॥
কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম॥

অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সবার উপরে॥
সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ॥
আনন্দাংশেহ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিত—যারে জ্ঞান করি মানি॥
কৃষ্ণকে আহ্লাদে—তাতে নাম হ্লাদিনী।
সেই শক্তি দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সারাংশ তাঁর প্রেমানাম।
আনন্দ চিন্ময় রস—প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা—রাধাঠাকুরাণী॥
প্রেমের স্বরূপ—দেহ প্রেম-বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য যার॥
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তার কায় ব্যূহ রূপ॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা।
রামানন্দ সঙ্গোৎসব।

ক্রমে ক্রমে ভক্তির উৎকর্ষ সাধিত হইলে, ভক্তি যথাক্রমে প্রেম ও মহাভাব আখ্যা সুখপ্রাপ্ত হয়। শ্রীশ্রীরাধা ভক্তিরূপিনী, তিনিই প্রেমময়ী এবং মহা- । সুখস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে সুখাস্বাদন করানই শ্রীমতীর প্রধান কার্য্য।

কলির মানুষ অল্প শক্তিমান, অল্পায়ু এবং দুর্মেধ ; সেইজন্য উগ্রতপস্যা দ্বারা যোগাভ্যাস দ্বারা এবং স্বাধ্যায় জ্ঞানযোগদ্বারা সিদ্ধিলাভ করা বড়ই কঠিন। জীবের মঙ্গলার্থী তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ সেইজন্য নানা শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন, কলিযুগে **হরিনাম কীর্ত্তন, হরিনাম শ্রবণ, হরিগুণগান** এবং **হরিনাম জপ, হরিধ্যান** ও পূজাই প্রধান সাধন। কলিতে অন্যগতি নাই।

"হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরণ্যথা॥"

বৃহন্নারদীয় পুরাণ =৩৮।১২৬

ঈশ্বরভক্তির মহিমা বুঝিয়া এবং উহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া গুরুদেবে এবং ইষ্টদেবে ভক্তিমান হইবে।

ছাড়রে ভ্রান্ত বিষয় বাসনা, কেন মজে মন বিষয় খেলায়।
থাকিতে সময় কর হরিনাম, বিফলে জীবন ব'য়ে যে যায়॥

ব্রহ্মচর্য্যহীন পুরুষ আত্মঘাতী কেন?

ব্রহ্ম সৎ, চিৎ, আনন্দ স্বরূপ। ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়। ব্রহ্ম অবিনাশী। প্রত্যক্ষভাবে এই জ্ঞান হইলে, ব্রহ্মকে স্বরূপতঃ জানা যায়। ব্রহ্মের স্বরূপ জানিলে অহংকার মূলক দেহাত্মবুদ্ধি—দেহাভিমান দূব হয়। দেহাভিমান দূর হইলেই সংসারবন্ধন দূর হইয়া পরাগতি লাভ হয়।

শিশ্নোদর পরায়ণ অহঙ্কারী নরনারী ইন্দ্রিয় সেবায় রত থাকিয়া ভগবৎবিমুখ হইয়া পড়ে। ভগবদ্‌বৈমুখ্যই জীবকে সংসার দুঃখে জড়িত করে। দেহস্থিত পরমপুরুষ—পরমাত্মাকে স্বরূপতঃ জানিতে দেয় না।

ব্রহ্মানুশীলন বা ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন, ব্রহ্মকে স্বরূপতঃ জানিবার উপায় নাই। দেহস্থিত আত্মাকে স্বরূপতঃ না জানিয়া দেহই আত্মা এই মিথ্যাজ্ঞানে জীবকে সংসারী করে, দেহ আত্মা নয়, এই প্রতীতি দৃঢ় না হইলে, দেহের নাশে আত্মারও নাশ হয়। এই মিথ্যা ধারণা, বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় আত্মা অবিনাশী নয়, ইহাই অনুভূত হয়। অহঙ্কারোৎপন্ন মোহ বশতঃ অবিনশ্বর আত্মাকে, দেহ মনে করিয়া, দেহের নাশে আত্মার নাশ হয়, এই ধারণাদ্বারা জীব শোক ও ভয়ের অধীন হয়; ও পরম শ্রেয়ঃ লাভে বঞ্চিত হয়। যে জীব দেহের সহিত দেহস্থিত আত্মাকেও বিনশ্বর মনে করে, সেই জীব আত্মঘাতী, আত্মঘাতী জীবের নরকে গতি হয়।

* "অসূর্য্যা নামতে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রত্যাহতি গচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ॥

ঈশোপনিষৎ।

* দম্ভ দর্পাদি আসুরিক বৃত্তিশীল ব্যক্তিগণ, অন্ধতমসাবৃত নরকে গমন করে যাহারা দেহাদি অনিত্য পদার্থে আত্মবুদ্ধি করে, তাহারা আত্মঘাতী।

এস্থলে ভগবদ্গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের—২৮।২৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

বর্ত্তমান সময়ে

ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হইতে চলিতেছে কেন ?

হিন্দু রাজার অধিকারে হিন্দুধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ ছিল। হিন্দুরাজা, আশ্রমধর্ম্ম এবং বর্ণধর্ম্ম রক্ষাকরিয়া প্রজাপুঞ্জ পালন করিতেন। তখন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সতেজ থাকায়, শাস্ত্র শাসনে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইত। হিন্দুশাস্ত্র শাসনে, সকল সময়ে, সকল অবস্থায়, ব্রহ্মচিন্তা, ব্রহ্ম ভাবনা এবং ব্রহ্মে প্রীতি উদ্দেশ্য করিয়া প্রত্যেক ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান ছিল। প্রত্যেক মনুষ্য আশৈশব ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিত। সেই জন্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্বতন্ত্র আশ্রম বলিয়া গণ্য হইত। শিশুকাল হইতে সকলেই গুরুর আশ্রমে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিত। এবং ব্রহ্মচর্য্যের ভাব প্রত্যেক মনুষ্যের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ লাভ করিত।

কালের প্রভাব দুরতিক্রমণীয়। জগতের যত কিছু পরিবর্ত্তন, কাল প্রভাবেই হইয়া থাকে। কালপ্রভাবেই হিন্দুর রাজত্ব নাই। কালপ্রভাবেই মুসলমান-রাজত্ব গিয়াছে। কালপ্রভাবেই এখন ইংরাজ জাতি আমাদের রাজা। ভিন্নধর্ম্মী বৈদেশিক রাজার শাসনে থাকিয়া হিন্দুব হিন্দুত্ব দিন দিন, তিল তিল করিয়া নষ্ট হইতেছে। যখন যাহার রাজত্ব হিন্দু জাতির ভাগ্য নিয়ামক হইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর আচার নিয়ম কিছু-না কিছু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য রাজভাষা শিখিতে বাধ্য হইতেছে। রাজভাষার শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার এবং নিজের মাতৃভাষার পূর্ণ আলোচনার পথ অপ্রশস্ত হইয়া যাইতেছে। অর্থোপার্জ্জনের জন্য রাজসেবা করিতে বাধ্য হইতেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে রাজ জাতির আচার, নিয়ম, হাবভাব অনুকরণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছি মনে করিতেছে।

যে প্রকারের সাঁচ, ঢালাই মূর্ত্তি ও সেই প্রকারই হইয়া থাকে। হিন্দুর নিজস্ব শিক্ষা পদ্ধতি উঠিয়া যাইতেছে, রাজ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে রাজ নির্দ্দিষ্ট শিক্ষা লাভ করিয়া আমাদের চিন্তা ও কার্য্যের স্রোত নূতন পথে প্রবাহিত হইতেছে। আমাদের

দেহ মন নূতন সাঁচে প্রস্তুত হইতেছে। সুতরাং এখন হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত শিক্ষার সংকোচ হইতেছে। এখন আর হিন্দুধর্ম্মের সারভূত বর্ণধর্ম্মের ও আশ্রমধর্ম্মের প্রতি নব্যশিক্ষিত কৃতী এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের সেরূপ আস্থা নাই। কাজেই হিন্দুধর্ম্মোক্ত ব্রহ্মচর্য্য এবং তদুপযোগী কার্যানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা তাহাদের উপলব্ধি হইতেছে না। সেইজন্য জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম এবং আশ্রমধর্ম্ম মলিন হইয়া যাইতেছে। জাতীয় জীবন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া নিস্তেজ ও হীনবল হইয়া পড়িতেছে।

জাতীয় দেহ, জাতীয় মন এবং জাতীয় জীবন রক্ষা ও পুষ্ট করিতে হইলে, জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন। জাতীয় আচার, জাতীয় নিয়ম, শ্রদ্ধা সহকারে পালন করা প্রয়োজন। জাতীয় শিক্ষাই এই সকলের মূল।

অজ্ঞান জ্ঞানকে আবৃত করিয়া বসে। বর্ষাকাল-প্রভাবে মেঘ জালে, দিনে সূর্য্য সমাচ্ছন্ন থাকে। রাত্রিতেও চন্দ্র তারকা প্রভৃতির আলো—জ্যোতিঃ প্রতিভাত হয় না। গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি সমস্তই মেঘে ঢাকা থাকে। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুশাস্ত্র-শাসনে অনাস্থার ফলে, বহির্মুখ প্রচেষ্টায় অজ্ঞানতা বিস্তৃতি লাভ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের সারভূত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, সদাচার, সংযম, বৈরাগ্য এবং ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি আত্মোন্নতি সাধন সমস্তই মহান্ধকারে আবৃত আছে।

আমরা এখন পাশ্চাত্য ইংরাজি শিক্ষার গর্ব্ব করি। সাংসারিক উন্নতির হেতুভূত অর্থ লাভের লালসায়, প্রায় সকলেই ইংরাজি বিদ্যায় শিক্ষিত হইতেছেন। সন্তান দিগকে ইংরাজি শিক্ষা দিতেছেন! বৈষয়িক উন্নতি যথেষ্টই হইতেছে, মনে করিতেছেন। ইংরাজী বিদ্যালয়ে জাতীয় ধর্ম্ম শিক্ষা হয় না। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য এবং ব্রহ্ম-বিদ্যালাভের পথ দিন দিনই রুদ্ধ হইতেছে। বর্ষাকালের মেঘজাল দূর হইতেছে না। মহা জ্যোতিষ্মাণ্ সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ নক্ষত্ররূপ, বেদ, স্মৃতি, পুরাণ এবং দর্শন প্রভৃতি, ব্রহ্মবিদ্যা লাভ ও আত্মোন্নতি সাধনের শাস্ত্র সমস্তই মেঘাবৃত অমানিশার ঘোরান্ধকারে আবৃত হইয়া আছে। ইংরাজি শিক্ষায় জড়বিজ্ঞানে কথঞ্চিত, পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া, জোনাকি পোকার আলো পাইয়া আমরা বড়ই আলোকিত হইয়াছি মনে করিতেছি। নিজের ঘরের অমূল্যরত্ন হীরা মুক্তা প্রভৃতি

তুচ্ছ করিয়া চাকচিক্যশালী কাচের পক্ষপাতী হইয়াছি। ইংবাজি শিক্ষাব দোষ কীর্ত্তন কবা আমার উদ্দেশ্য নহে। ইংরাজি রাজভাষা, ইংরাজি সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। উহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে অর্থাগম হইবে না। তাই বলিয়া নিজস্ব সম্পত্তি সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিয়া হিন্দুশাস্ত্রের পূর্ণ অধ্যয়নে বিরত থাকিতে হইবে না। নিজেব সম্পত্তি ও নিজের ঘব সুবক্ষিত বাখিয়া উহার পুষ্টিব জন্য অন্যেব ঘর খুঁজিতে হইবে। ইংরাজি শিক্ষার গর্ব্ব করিয়া নিজ সম্পত্তি হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি অনাস্থা ও অনাদব প্রদর্শন করা বড়ই পরিতাপের বিষয়!!

আমরা এখন হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করি না বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িতেছে। সেইজন্য আমাদের সংযম নাই, বিষয় বৈবাগ্য নাই, ব্রহ্মভাব মনে স্থান পায় না। কাজেই ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে। তাহাব ফলে আর্য্য সেবিত বর্ণাশ্রম বিহিত পৃথক পৃথক কর্ম্মের ভেদ উঠিয়া যাইতেছে। এখন সকলেই সকল কাজ করিতেছে। ব্রাহ্মণ, জন্মগত সংস্কারের বিরুদ্ধে দাসত্ব করিতেছে,—অন্য বর্ণেব কাজ করিতেছে। সেইরূপ অপর বর্ণের মনুষ্যও নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে। অথচ কেহই স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিয়া সুখী হইতে পারিতেছে না, কাহারও অভাব দূব হইতেছে না। বিষয় ভোগেব আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যাইতেছে। ইচ্ছানুরূপ ভোগ্যবস্তু না পাইয়া কষ্টানুভব করিতেছে এবং নানাদিকে ছুটাছুটী কবিতেছে।

বিষয় ভোগে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য হইলে, এবং উহাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনে করিলে, শেষে দুঃখ ভোগ অনিবার্য্য। বিষয় ভোগের দিকে মনের ঝোক পড়িয়াছে বলিয়াই এখন অনেক ব্রাহ্মণ সন্তানেব ব্রাহ্মণত্ব নাই, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব নাই, বৈশ্যের বৈশ্যত্ব নাই এবং শূদ্রের শূদ্রত্ব নাই। ব্রহ্মচর্য্য নাই বলিয়াই, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যথাযথ পালিত হইতেছে না। ধর্ম্ম শক্তির, বর্ণ শক্তির প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ব্রহ্মচর্য্য নাই বলিয়াই কর্ম্ম-ভূমি ভারতের মহাদুর্দ্দিন

উপস্থিত হইয়াছে। উদরে অন্ন নাই, পরিধেয় বস্ত্র নাই,—সর্ব্বদাই হাহাকার! হা অন্ন, হা অন্ন করিয়া লোকে নানাদিকে ছুটাছুটী করিতেছে। কোথায়ও শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। মন চঞ্চল, অশান্ত ও বহির্মুখ হইয়া পড়িতেছে।

মনের গতি ব্রহ্ম-ভগবানের দিকে ফিরাইতে পারিলেই, ব্রহ্মচর্য্যের চেষ্টা আরম্ভ হইবে। মনকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিতে হইবে। ইহাই ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্য অর্থাগমের বাধা দেয় না—অর্থোপার্জ্জনের পথ রুদ্ধকরে না, ন্যায় ও শাস্ত্র সঙ্গত উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিলে, ব্রহ্মচর্য্যের বাধা হয় না। সকাম কর্ম্ম ও নিষ্কাম কর্ম্ম উভয়ই, হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত। শাস্ত্র বলেন—"অন্ন-ব্রহ্ম" "জল-নারায়ণ," সুতরাং শরীর ধারণের জন্য অন্ন-জল লাভের চেষ্টা ব্রহ্মচর্য্যের বিরোধী হইতে পারে না। যাহারা ভোগৈশ্বর্য্যকামী, তাঁহারাও ব্রহ্মচারী হইতে পারেন, যাহারা মুমুক্ষু, তাহারাও ব্রহ্মচারী হইতে পারেন। সকাম নিষ্কাম উভয় প্রকারেই ভগবদ্ভক্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন না করিলে, ভগবদ্ভক্ত হওয়া যায় না। সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ জন্য ন্যায়সঙ্গত উপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিকূল নহে।

ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা নর-নারী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচর্য্যহীন মনুষ্য পশুত্বে পরিণত হয়। সধবা পুরস্ত্রীগণ ব্রহ্মচর্য্য পালন না করিলে, ধর্ম্মভ্রষ্টা এবং নিন্দনীয়া হন। ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ ভিন্ন বিধবার গত্যন্তর নাই। ব্রহ্মচর্য্যহীনা বিধবা সমাজে ঘৃণিতা এবং পতিতা হইয়া থাকেন। ব্রহ্মচর্য্যই বিধবার প্রধান ধর্ম্ম।

ধর্ম্মই জীবের শ্রেয়ঃ লাভের পথ উন্মুক্ত করে। ব্রহ্মচর্য্যই ধর্ম্মের পথ দেখাইয়া দেয়।

অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ধর্ম্মের মত আমার জানা নাই। তৎসম্বন্ধে কিছু বলারও শক্তি আমার নাই। ব্রহ্মোপাসনাই সকল ধর্ম্মের গন্তব্য পথ। যিনি যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউন্ না কেন, তিনি সেই ধর্ম্মোক্ত ক্রিয়া করিয়াও নিয়মাদি যথাবিধি পালন করিলেই ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা হয় না কি? হিন্দু, খাঁটি হিন্দু; খৃষ্টান, খাঁটি খৃষ্টান; মুসলমান, খাঁটি মুসলমান; ব্রাহ্ম, খাঁটি ব্রাহ্ম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। স্ব স্ব ধর্ম্ম মতে.

জীবন উৎসর্গ করাই ব্রহ্মচর্য্য। পরব্রহ্ম অনন্তশক্তি ও অমিত বিক্রমশালী, পূর্ণৈশ্বর্য্যময়, পূর্ণ রসময়, পূর্ণ মাধুর্য্যময়। ব্রহ্মের বিভূতি অনন্ত, অপরিমেয়। যিনি যে ধর্ম্মে থাকিয়া যে ভাবে, পরব্রহ্মের পূজা ও আরাধনা করতঃ সর্ব্ব শক্তিমান অখণ্ড অব্যয় পরব্রহ্মের যতটুকু জানিতে পারেন, তাঁহার জীবন সেই পরিমাণে, চরিতার্থতা লাভ করে।

ব্রহ্মচর্য্যই, জীবকে পরম শ্রেয়ঃলাভ করাইয়া লয়। তপঃসিদ্ধ, সংযম ধন, ত্যাগী উদার এবং ব্রহ্মচারী ঋষিগণ লোক চরিত্রের পূর্ণ উদার ভাব এবং পূর্ণ সমদর্শন জ্ঞানের প্রভাব নিজের পবিত্র অন্তঃকরণে অনুভব করিয়া, পবিত্র পূর্ণ জ্ঞানের যে আদর্শ, লোক শিক্ষার্থ এবং লোক সংগ্রহার্থ শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আধুনিক পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত মনস্বীগণ এবং ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সাধু সজ্জনগণ, ও সেই সমস্ত উদার ভাবের যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকেন। পুনরুক্তি হইলেও সেই উদার ভাবের ২, ৩টী উপদেশ এস্থলে উদ্ধৃত করার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না :—

পরস্ত্রীতে মাতৃবৎ, পরদ্রব্যে লোষ্ট্রবৎ, সর্ব্বভূতে আত্মবৎ, যিনি দেখেন, তিনিই পণ্ডিত। *

ধর্ম্মের সর্ব্বস্ব কি শ্রবণ কর। শুনিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখ। যাহা নিজের —আত্মার-প্রতিকূল, অন্যের প্রতি সেইরূপ আচরণ করিবে না। †

পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীই উদার চরিত্র ব্যক্তির কুটুম্ব। এই আমার নিজ, এই আমার পর, লঘুচেতাদিগের এইরূপ গণনা। ‡

---

* মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্ব ভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥

† শ্রূয়তাং ধর্ম্ম সর্ব্বস্বং শ্রুত্বাচ হৃদি ধার্য্যতাং।
আত্মনঃ প্রতিকূলানি, ন পরেষাং সমাচরেৎ॥

‡ অয়ং নিজঃপরো বেতি গণনা লঘু চেতসাং।
উদার চরিতানাস্ত বসুধৈব কুটুম্বকং॥

দুঃখের বিষয়, সেই ঋষিগণের উপদিষ্ট যে সদাচার ও সাধনা বলে, উক্ত পবিত্র উদার ভাব অন্তঃকরণে সহজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, সেই সদাচার ও সাধনার মর্ম ও উহার আবশ্যকতা নব্য শিক্ষিতদিগের আদরের ও গ্রহণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে না। বরং ঐ সমস্তের অনেকগুলি কঠোর কুসংস্কার বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছে। সেইজন্য পূর্ণমাত্রায় ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা হইতেছে না। তাহার ফলে হিন্দু ভ্রাতা ভগিনীগণ ক্রমেই ব্রহ্মচর্য্য হীন হইতেছেন। তজ্জন্য হিন্দুসমাজের শোচনীয় দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে।

ভগবৎ কৃপা ভিন্ন এই দুর্দ্দিন দূর হইবার উপায় নাই।

তৃতীয় খণ্ড।

হিন্দু বিধবার কর্ত্তব্য

জন্মগ্রহণের পর জীবদেহের কৌমার, যৌবন, জরা এবং দেহান্তর প্রাপ্তি বা মৃত্যু এই চারিটী অবস্থা স্বাভাবিক।

ইহা ব্যতীত, নারী জীবনে সাংসারিক ব্যবহার উপযোগী, কুমারী, সধবা এবং বিধবা এই তিনটা অবস্থা শাস্ত্রে ব্যবস্থিত আছে।

নারী জাতির বিবাহ সংস্কার যে পর্য্যন্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত সেই নারীকে সাধারণতঃ কুমারী বলা হইয়া থাকে। শাস্ত্রে পাঁচবৎসর পর্য্যন্ত নারীদিগকে "কুমারী" সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

যে নারীর বিবাহ হইয়া পতিলাভ হইয়াছে, পতি বর্ত্তমানে, তাহাকে "সধবা" বলে।

কুমারী এবং সধবার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছু লিখা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। পণ্ডিত প্রবর ঋষি-কল্প পূজ্যপাদ জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় কৃত "জীবন-শিক্ষা" গ্রন্থে কুমারী এবং সধবার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে লিখা আছে। যাঁহারা ইচ্ছা করেন তাঁহারা উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন।

যে নারীর (বিবাহের পর তাহার) পতির মৃত্যু হইয়াছে, সেই নারীকেই "বিধবা" বলে। বিধবার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছু লিখা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

হিন্দুনারীর বৈধব্য দশা সাংসারিক ভোগ-সুখের অনুকূল নহে। সেইজন্য বাল-বিধবা, তাঁহার পিতা, মাতা, শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি বন্ধু বান্ধবগণের শোচনীয়া। বাল-বিধবা নিজেও যৌবনের সোপানেই নানাবিধ ভোগ-সুখের অধিকার হইতে বঞ্চিতা হইয়া অত্যন্ত দুঃখানুভব করিয়া থাকেন; ইহা স্বাভাবিক।

মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে দেখা যায়, হিন্দু বিধবার দেহ, ভোগ সুখের জন্য নহে। ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করিয়া, অথবা পতির সহগমন করিয়া দেহ পাত করাই শাস্ত্রানুমোদিত। তদনুসারে হিন্দু বিধবার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বা ধর্ম্মের ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে।

"সতীত্ব"

হিন্দু বিধবার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু লিখিবার পূর্ব্বে নারী জাতির সাধারণ এবং সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম "সতীত্ব" সম্বন্ধে কিছু লিখা প্রয়োজন মনে করিতেছি।

যে নারীর পতিই প্রাণ, পতিই আরাধ্য দেবতা, পতিই পরম গুরু, পতিই জপের মন্ত্র, পতিই তপস্যা, পতিই স্বর্গ, পতিই ধর্ম্ম, পতিই যথাসর্ব্বস্ব, পতি শুশ্রূষাই চিন্তা, যে নারী কায়মনে পতির বাক্য পালনে তৎপরা, পতির মনের বৃত্তির অনুসারিণী, পতির শয্যা পবিত্র রাখিতে যাহার জীবন ভরা চেষ্টা, যে নারী ইহ এবং পরকালে পতির মঙ্গল প্রার্থিনী, যে নারীর মনে দৃঢ় ধারণা, নিজের দেহ পতির দেহের ছায়ামাত্র এবং যে নারী পতির মনোরমা, সেই নারীই "সতী"। সতীর ভাব বা স্বভাবই "সতীত্ব"।

"সতীত্ব" নারী জীবনের প্রধান ধর্ম্ম ও ধন।
"নারীর পরম ধন সতীত্ব রতন।"
"সতীত্ব রতন রমণীর ধন।"
"সতীত্ব সোণার নিধি বিধি দত্ত ধন।
কাঙ্গালিনী পেলে রাণী এমন রতন।"

পূর্ব্বে ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রবন্ধে লিখা হইয়াছে, যে, কোন বস্তু বা প্রাণীকে ধরিয়া রাখে, পতিত হইতে দেয়না—সেই, ধর্ম্ম। ধর্ম্ম দ্বারা, সৃষ্ট জগৎ, ব্রহ্মাদি দেবতা হইতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নরকের কীট পর্য্যন্ত সমস্তই ধৃত হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মাশ্রিত লোকের অধঃপতন হয় না। বরং ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া পরম পুরুষার্থ লাভ হয়।

ধর্ম্ম হইতে অর্থ, কাম এবং মোক্ষ লাভ হয়। সতীত্বই নারীর প্রধান ধর্ম্ম। সতীত্বই নারীকে ধরিয়া রাখে, পতিতা হইতে দেয়না। সতীত্বই স্ব মহিমায় সতী-নারীকে বৈধ সুখ-ভোগে এবং ক্রমে পরম শ্রেয়ঃ লাভের পথে প্রেরণ করে।

সতী নারী দেবতারও পূজনীয়া। পতি-পরায়না সাধ্বী নারীর অন্য কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয় না। সধবা অবস্থায় সতী নারী পতিসেবা ও পতির প্রিয়কার্য্য করিলেই তাহার সকল ধর্ম্ম করা হয়; বিধবা অবস্থায়ও সতীত্ব রক্ষা করিয়া পরলোকগত পতির প্রীতি-উদ্দেশ্যে ব্রতনিয়মাদি সৎকর্ম্ম করিলেই সতী নারীর সকল ধর্ম্ম করা হয়।

সতীত্ব যেমন নারীর প্রধান ধর্ম্ম, সেইরূপ নারীর সতীত্ব প্রধান ধন। সাংসারিক সকল প্রকার ভোগ-সুখের জন্য ধন বা অর্থের প্রয়োজন, সেইজন্য মা লক্ষ্মী ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। মা লক্ষ্মী ধনরূপা হইয়া সংসার চালান। সতী নারী তাহার সতীত্ব-ধনের বলে সংসারে সুখী ও যশস্বিনী হন।

ধন দুই প্রকার। পার্থিব এবং স্বর্গীয়। যে ধন পৃথিবী বা মাটী হইতে উৎপন্ন হয়, মাটীর শরীরের ক্ষণিক সুখ ভোগের জন্য, সাংসারিক কার্য্যোপযোগী ব্রীহি, ধান্য, সোণা, রূপা, হীরা মতি প্রভৃতি আকারে, মানব সমাজের আরাধ্য হইয়া ক্ষণস্থায়ী দেহের এবং মানব সমাজের সুখ ভোগের উপকরণ হইয়া থাকে তাহাকে পার্থিব ধন বলে।

দেহ পাত হইলে ঐ সমস্ত পার্থিব ধন, মৃতজীবের সঙ্গে যায় না। প্রাণবায়ু চলিয়া গেলে, মাটীর দেহ যেমন অসাড় হইয়া পড়িয়া থাকে, পার্থিব ধনও মৃত দেহের সঙ্গে যায় না—রহিয়া যায়;

পার্থিব ধনের মদিরার ন্যায় মত্ততা-দোষ আছে, অনেক ধনী ধনমদে মত্ত হইয়া এবং ধনাভিমানে গর্ব্বিত হইয়া কর্ত্তব্যকর্ম্মে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন। এইরূপ ধনগর্ব্বিত মুগ্ধব্যক্তি পরম পুরুষার্থ লাভে বঞ্চিত হন।

পার্থিব ধন পরম পুরুষার্থ লাভের বিরোধী বলিয়া অকিঞ্চিৎকর। সেইজন্য "মুমুক্ষু সাধকগণ কামিনীকাঞ্চন বর্জ্জন করিবে।" ইহারই বিধি আছে।

সতীত্বরূপ মহাধন এই শ্রেণীর ধন নহে। ইহা অপার্থিব—স্বর্গীয় ধন। সতীত্ব রূপ মহাধন সুহৃদের ন্যায় মৃত্যুর পরেও পারলৌকিক দেহের অনুগমন করে। সতীত্বধন মূল্যদ্বারা ক্রয় করা যায় না। সুতরাং ইহা "অমূল্য রতন"।

মহামূল্য হীরক কিম্বা বিবিধ মূল্যবান মণি কোন প্রকারে ভাঙ্গিলে যেমন জোড়া লাগেনা—খণ্ডিত হইয়া থাকে, সতীত্বরূপ মহাধন কোন ক্রমে একবার নষ্ট হইলে আর পাওয়া যায় না। সুতরাং সতী স্ত্রী মাত্রেরই এই সতীত্ব রূপ মহাধন অতি যত্নে রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

হীরক ভগ্ন হইলেও তাহার মূল্য থাকে। সতীত্বহীনা স্ত্রীলোকের লোক-সমাজে কোন মূল্যই থাকে না। সুতরাং সতী স্ত্রী মাত্রেরই এই সতীত্ব রূপ মহাধন অতিযত্নে রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভ্রষ্টা নারী পতিতা, তিনি লোকসমাজে ঘৃণিতা ও নিন্দনীয়া।

কাঁটার আবরণ বা বেড়া যেমন মূল্যবান্ শস্তকে গো-মহিষাদি ও অন্যবিধ বন-পশুর উৎপাত হইতে রক্ষা করে, সতীত্ব-বজ্রাবরণও পতিপরায়ণা সাধ্বী নারীকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। সতী হওয়া নারীর পরম শ্রেয়ঃ লাভের প্রধান সাধন।

গঙ্গার সহিত পতিব্রতা নারীর কোন ভেদ নাই। পতিব্রতা সাক্ষাৎ হর গৌরী তুল্যা। অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি সর্ব্বদা তাঁহার পূজা করিবেন। *

দেবাদিদেব মহাদেব জ্ঞানগুরু মহাযোগীশ্বর সদাশিবের সহধর্ম্মিণী মহাগৌরী-দক্ষদুহিতা সতীত্ব ধর্ম্মের পূর্ণ আদর্শ জগতে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য স্বয়ং "সতী" নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দক্ষ-প্রজাপতি বিধি প্রণোদিত হইয়া জগৎগুরু শঙ্করকে দ্বেষ দৃষ্টিতে দেখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই দ্বেষ-বুদ্ধি ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া গুণাতীত-নির্ব্বিকার পরম কারুণিক ভূত-পালক ভবানী-পতি শঙ্করকে ত্রিজগৎ-বাসীগণের সমক্ষে অবমাননা করিবার নিমিত্ত শিবহীন মহাযজ্ঞের উদ্যোগ করেন। সেইযজ্ঞে কেবল মহাদেব শঙ্কর এবং মহাদেবী সতী ব্যতীত ত্রিলোকবাসী সকলেরই নিমন্ত্রণ হয়। সতীদেবী সেই মহাযজ্ঞে শঙ্কর এবং তিনি ব্যতীত,

* "নগঙ্গয়া তয়া ভেদো যা নারী পতিদেবতা।
উমাশিবসমা সাক্ষাৎ তস্মাত্তাং পূজয়েৎ বুধঃ॥"

কাশীখণ্ড

ত্রিলোকের সকলেরই নিমন্ত্রণ হইয়াছে এবং তাঁহার পিতা প্রাণ-পতি শঙ্করের নিন্দা করিয়াছেন, নারদ-মুখে শুনিয়া মর্ম্মাহতা হন। যে পিতা হইতে তাঁহার দেহ পরিগ্রহ হইয়াছে, সেই পিতা, শিবদ্বেষী হইয়া অপবিত্র হইয়াছেন, পতিপরায়ণা সাধ্বী সতী তাঁহার পিতৃ প্রাপ্ত নিজদেহকেও অপবিত্র বলিয়া মনে করিলেন। সতী নিমন্ত্রিতা না হইলেও পিতৃ-গৃহ দক্ষালয়ে যাইয়া হয় পিতাকে অনুনয় বিনয় করিয়া পিতার শিব-দ্বেষ দূর করিবেন, না হয়, পিতৃ-মাতৃ প্রাপ্ত তাঁহার নিজের দেহ পাত করিবেন। এই সংকল্প লইয়া প্রাণ-পতি মহাদেব হরের অনুমতি লইয়া দক্ষালয়ে যান। তথায় তাঁহার সাধু চেষ্টার কোন ফল হইল না। পতিনিন্দা শুনিয়া তিনিই পিত্রালয়ে যজ্ঞস্থলে নিজের দেহ ত্যাগ করিলেন। এইরূপে পাতিব্রতা ধর্ম্মের ও সতীত্বের চরম আদর্শ জগৎকে দেখাইলেন। তৎপর হিমালয়ের পুত্রিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া উমা ও পার্ব্বতী নামে প্রসিদ্ধা হন। এবং সেই জগৎগুরু পরম দেবতা শঙ্করকে পতিলাভের জন্য তপস্যা করেন।

উমা শৈশব-সুলভ সুকুমার দেহ লইয়া হরকে পতিলাভের তীব্র ইচ্ছা প্রণোদিতা হইয়া অতি উগ্র তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সহচরী ছিলেন, দেবাদিদেব ভূত-ভাবন, উমার কঠোর তপস্যায় প্রীত হইয়া উমার পতিভক্তি পরীক্ষা করিয়া অভীষ্ট বর দিতে বৃদ্ধ জটিল তপস্বী ব্রাহ্মণবেশে উমার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। উমা এই অল্প বয়সে কঠোর তপস্যা কেন করিতেছন?" "ছদ্মবেশী শঙ্কর উহার সহচরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। উমার সখী উত্তরে বলিলেন—"হরকে পতিলাভের জন্যই এই উগ্র তপস্যা।" তখন বৃদ্ধ তপস্বী ব্রাহ্মণবেশ ধারী স্বয়ং হর, উমার পতিভক্তি পরীক্ষার্থ শিব-নিন্দা করিয়া বলিলেন—"পরমরূপবতী সর্ব্বগুণসম্পন্না উমার পতি হইবার হরের কোন গুণই নাই! তাঁহার কুল থাকা দূরের কথা পিতামাতারই ঠিকানা নাই। তাঁহার শরীরের রূপ নাই—বিরূপাক্ষ! বস্ত্র নাই বলিয়া—দিগম্বর!! বাড়ী ঘর নাই বলিয়া শ্মশানবাসী!!! অল্প কথায় বরের যে কিছু গুন থাকা স্পৃহনীয়, তাহার কোনটাই শঙ্করের নাই।" ইত্যাদি নিন্দাবাদ শুনিয়া উমা অত্যন্ত দুঃখিতা ও ক্রুদ্ধা হইয়া স্বয়ং মুখে কিছু না বলিয়া সখীর প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করতঃ বৃদ্ধ

সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণকে শিবনিন্দা করিতে নিষেধ করিলেন। তখন সতীপতি ভগবান্ শঙ্কর অত্যন্ত প্রীত হইয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করতঃ উমাকে দেখাইলেন—এবং উমাকে পতি লাভের বর দিলেন। তৎপর যথা নিয়মে হিমালয়ের গৃহে উমার সহিত হরের বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল।

দক্ষ-দুহিতা সতীত্বের বলেই পতিনিন্দা শুনিয়া সতী দেহত্যাগ করিলেন এবং হিমালয়—গৃহে পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া উমাদেহে পুনঃ সেই শঙ্করকেই পতিলাভ করিলেন—সতীত্বের মহিমা জগতে দেখাইলেন।

সাধ্বী স্ত্রী কোন কারণে বিধবা হইলেও ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করিয়া সতীত্বরক্ষা করিলে বা পতির চিতারোহণ করিলে তাঁহার পুনঃ নিজ প্রিয় পতি লাভের পথ সুগম হয়।

স্বয়ং লক্ষ্মী সীতাদেবী রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াও নানা প্রকার কষ্টভোগের মধ্যেও সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং অগ্নি-পরীক্ষা দিয়া প্রিয়পতি নর-নারায়ণ শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের সহিত পুনর্ম্মিলিতা হইয়াছিলেন।

সাবিত্রীদেবী সতীত্ব বলেই মৃতপতি সত্যবান্‌কে এবং বেহুলা সতীত্ব বলেই মৃতপতি লক্ষীন্দরকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া ছিলেন।

দময়ন্তী সতীত্ব বলেই—পলাইত পতি নলরাজাকে এবং চিন্তা সতীত্ব বলেই পলাইত পতি শ্রীবৎস রাজাকে পুনরায় লাভ করিয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রে ও পুরাণাদিতে নানা স্থানে নারীদের সতীত্বের গুণগাথা নানারূপে কীর্ত্তিত আছে।

ভগবান্ স্বয়ং কোমলমতি অপরিণত বুদ্ধি অল্পবয়স্কা কুমারীদিগের সতীত্ব রক্ষা করিয়া থাকেন। কি সধবা কি বিধবা উভয় শ্রেণীর নারীরই সতীত্ব রক্ষা করা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। নারীর সতীত্ব রক্ষিত না হইলে ব্রহ্মচর্য্য লাভের উপায় নাই।

পতি সতী নারীর অতুলনীয় ধন। কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা যদুকুলের সমস্ত ধনরত্ন দ্বারা তুলাদণ্ডে স্বীয় পতি শ্রীকৃষ্ণকে পরিমাপ করিয়া দেখিয়াছিলেন, পতির গুরুত্ব বা ওজনই অধিক হইয়াছিল।

পতিসেবা দ্বারা নারীজাতি পরম শ্রেয়ঃলাভ করিতে অধিকারিণী হন।

স্ত্রীদিগের পৃথক যজ্ঞ নাই, ব্রত নাই। উপবাসও নাই। পতির শুশ্রূষাতে তাহাদের স্বর্গ লাভ হয়। *

আদর্শস্থানীয়া সতী নারীদের জীবনচরিত মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া তাঁহাদের চরিত্রেরও ক্রিয়া কলাপের অনুকরণ করা সকল নারীরই কর্ত্তব্য। সতী স্ত্রী মাত্রেরই অপর পুরুষকে পিতা, পুত্র অথবা ভ্রাতার ন্যায় মনে করা কর্ত্তব্য।

সতী নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বাল্মীকি রামায়ণে অযোধ্যা কাণ্ডে অত্রিমুনির আশ্রমে তাঁহার সহধর্ম্মিণী বৃদ্ধা তাপসী ব্রহ্মচারিণী অনসূয়া দেবীর উপদেশ উদ্ধৃত করা হইল;—

"পতি নগরেই থাকুন বা বনেই বাস করুন অনুকূলই হউন বা প্রতিকূলই হউন, যাঁহাদিগের পতিই পরম প্রিয়তম, সেই সকল ললনাদিগের জন্যই মহোদয় লোক সকলের সৃষ্টি হইয়াছে। পতি দুঃশীল স্বেচ্ছাচারী বা নির্ধন যেরূপ হউন, তিনিই সংস্বভাবা নারীগণের পরম দেবতা স্বরূপ। বৈদেহি! আমি বহুকাল বিবেচনার পর পতি অপেক্ষা পরম হিতৈষী বন্ধু আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। পতিই ইহকাল ও পরকালের জন্য অক্ষয় তপস্যার অনুষ্ঠান স্বরূপ। কামাসক্ত-অসতী কামিনীগণ যাহারা কেবল ভরণপোষণার্থই ভর্ত্তাকে "ভর্ত্তা" বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহারা ঐরূপ দোষ গুণ না জানিয়াই স্বেচ্ছাচারিণী হয়। জানকি! ঐরূপ অসদ্গুণ-যুক্ত নারীরা অকার্য্যের বশীভূতা হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট এবং নিন্দিতা হইয়া থাকে। আর তোমার ন্যায় সদ্গুণ সমূহে ভূষিতা এবং উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট লোক সকলের বিষয়ে জ্ঞানবতী রমণীরা পুন্যশীল পুরুষের ন্যায় অনায়াসে স্বর্গলোকে বিচরণ করিয়া থাকেন। অতএব তুমি এইরূপে পতির প্রতিপালিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সতীত্ব-সমন্বিতা ও শুদ্ধাচারিণী হইয়া স্বামীকে সর্ব্ব প্রধান

---

* নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্‌যজ্ঞ ন ব্রতং নাস্ত্য পাসিতং।
পতিং শুশ্রূষতে যস্তু তেন স্বর্গে মহীয়তে॥"

মনু—সংহিতা।

জ্ঞান করিয়া তাঁহার সহধর্ম্মচারিণী হও। ইহা হইলে অক্ষয় যশ ও অশেষ ধর্ম্মলাভ করিতে পারিবে।" (অযোধ্যাকাণ্ড—সপ্ত দশাধিক—শততম সর্গ। ২৩ হইতে ২৯ শ্লোক।) *

* নগরস্থো বনস্থো বা শুভো বা যদি বাশুভঃ।
যাসাংস্ত্রীণাং প্রিয়োভর্ত্তা তাসাং লোকা মহোদয়াঃ॥ ২৩
দুঃশীলঃ কামবৃত্তোবা ধনৈ র্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
স্ত্রীণামার্য্য স্বভাবানাং পরমং দৈবতং পতিঃ॥ ২৪
নাতো বিশিষ্টং পশ্যামি বান্ধবং বিমৃশন্ত্যহম্।
সর্ব্বত্র যোগ্যং বৈদেহি তপঃকৃত মিবাব্যয়ম্॥ ২৫
নত্বেবমবগচ্ছন্তি গুণ দোষ মসৎস্ত্রিয়ঃ।
কাম বক্তব্য হৃদয়া ভর্তৃনাথাশ্চরন্তি যাঃ॥ ২৬
প্রাপ্নুবন্ত্য যশশ্চৈব ধর্ম্ম ভ্রংশঞ্চ মৈথিলি।
অকার্য্য বশমা পন্নাঃ স্ত্রিয়ো যাঃ খলু তদ্বিধাঃ॥ ২৭
তদ্বিধাস্তু গুণৈর্যুক্তা দৃষ্টলোক পরা বরাঃ।
স্ত্রিয়ঃ স্বর্গে চরিষ্যন্তি যথা পুণ্যকৃত স্তথা॥ ২৮
তদেব মেনং তমনুব্রতা সতী
পতিব্রতানাং সময়ানুবর্ত্তিনী।
ভবস্ব ভর্ত্তুঃ সহ ধর্ম্মচারিণী
যশশ্চ ধর্ম্মশ্চ ততঃ সমা পস্যসি॥ ২৯
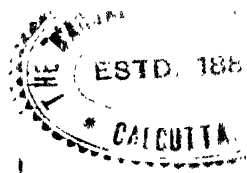
বিধবার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

বিধবার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্বন্ধে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি এখন লিখিতে চেষ্টা করিতেছি।

কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি ?

মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা নিত্য নৈমিত্তিক এবং কাম্য কর্ম্ম বলিয়া বিহিত আছে তৎসমস্তই ধর্ম্মমূলক। উহাতে অভ্যুদয় হয় এবং অন্তরাত্মা প্রসন্ন হয়। উহাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যাহা করিলে ধর্ম্মাচরণ করা হয় এবং যাহা না করিলে পাপ হয় তাহাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যাহা মনুষ্যের প্রতিদিন করিতে শাস্ত্রের উপদেশ আছে এবং যাহা না করিলে পাপ হইবে বলিয়া শাস্ত্রের শাসন আছে, তাহাই নিত্যকর্ম্ম। নিত্যকর্ম্ম না করিলে পাপ হয়। অতএব নিত্যকর্ম্ম সকলেরই অবশ্য করণীয়।

যাহা বিশেষ কারণ উপলক্ষে মনুষ্যের করণীয় বলিয়া শাস্ত্রের বিধি, উহাও অবশ্য করণীয়। এই কর্ম্ম নৈমিত্তিক বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত। নৈমিত্তিক কর্ম্মও কর্ত্তব্য, না করিলে শাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন করা হয়। ধর্ম্ম রক্ষা হয় না। স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ যাহা কর্ত্তব্য তাহাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম।

স্বর্গাদি ফলকামনা করিয়া বেদ-বিহিত যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা কাম্যকর্ম্ম। যাহা স্বর্গাদি ফল-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে করণীয় বলিয়া শাস্ত্রের বিধান আছে, সেই কর্ম্ম কথিত ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া চিত্তশুদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে; সেই কর্ম্ম তখন সাত্ত্বিক নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। বিষ্ণুপ্রীতি কামনায় যে কর্ম্ম করা হয়, তাহাও চিত্ত শুদ্ধির জন্যই অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপ কর্ম্মও কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ধর্ম্মের দুইটী গন্তব্য-পথ আছে। একটী প্রবৃত্তির—ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির পথ, অপরটী নিবৃত্তির—মোক্ষ প্রাপ্তির পথ। অবস্থা ভেদে উভয় পথই শাস্ত্র-বিহিত। অধিকারী ভেদে এই উভয় পথের যে কোন পথে চলিলেই ধর্ম্ম রক্ষিত হইয়া ইষ্ট সিদ্ধি লাভ হইবে—অভ্যুদয় লাভ হইবে। ঐ প্রবৃত্তি দুই প্রকার। ধর্ম্ম-মূলক

সৎ প্রবৃত্তি এবং শাস্ত্র বিরুদ্ধ অধর্ম্মমূলক পাপ বা অসৎ প্রবৃত্তি। অধর্ম্ম-মূলক প্রবৃত্তিই পতনের হেতু, উহাতে ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া অনিষ্ট লাভ হয়, তাহার ফলেই পতন হয়। অতএব উহা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। সৎ প্রবৃত্তির অনুশীলন করা শাস্ত্র বিহিত এবং ধর্ম্ম।

মনুষ্য মাত্রেরই কি নরের কি নারীর সকলেরই ইষ্ট বা সুখ লাভ বিষয়ে অভিলাষ হয়। ইষ্ট সাধন বুদ্ধিতেই লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যে কাজ করিলে অনিষ্ট লাভের আশঙ্কা আছে, লোকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সে কাজ করিতে চায়না। ইষ্ট সিদ্ধি মনুষ্যের প্রার্থনীয়।

সেই ইষ্ট বস্তু বা পুরুষার্থ দুই প্রকার, প্রেয় এবং শ্রেয়ঃ। কাম্য বা ভোগ্য বস্তুই প্রেয়। বিদ্যা, ধন, ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী, পুত্র, পরিজন এবং রাজত্ব এমন কি স্বর্গভোগও প্রেয়। প্রেয়ভোগের শেষ আছে। ইহলোকের সাংসারিক ভোগের কথা দূরে থাকুক, স্বর্গভোগও অনন্ত কাল স্থায়ী থাকে না। নির্দ্দিষ্ট সময় ভোগ হইলেই উহার শেষ হয়—ভোগ ফুরাইয়া যায়। স্বর্গভোগে লোকের ভোগবাসনা দূর হয় না। অধিকন্তু ভোগের বাসনা প্রবলই হইয়া উঠে। তখন প্রারব্ধ প্রাচীন বাসনা বলে পুনঃ সংসারে আসিতে হয়। এইরূপে দুঃখবহুল সংসার বা জন্ম মৃত্যুর অধীন হইতে হয়। ধর্ম্মের প্রবৃত্তি পথে চলিলে সকাম কর্ম্ম করিতে হয়। তাহার ফল স্থায়ী হয় না—সংসারে গতাগতি দূর হয় না।

যাঁহারা নিবৃত্তির পথ ধরেন, তাহারা নিষ্কাম ভাবে সৎকর্ম্ম দ্বারা—গীতার কর্ম্ম-যোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে ক্রমে—ভক্তি ও জ্ঞান লাভ করিয়া ভগবদ্গতি লাভ করিতে পারেন। ইহাই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ বা পরমশ্রেয়ঃ। ইহাই অমৃত এবং শাশ্বত—ইহাই ব্রহ্মানন্দ! নিষ্কাম কর্ম্মযোগে অহৈতুকি ভক্তি দ্বারা পরম কল্যাণকর ভগবদ্ভাব লাভ হইলে, আর জন্ম মৃত্যু হয় না। শাশ্বত গতি লাভ হয়। এইরূপ পরম শ্রেয়ঃ লাভ করাই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ। নিবৃত্তি পথের ইহাই অবিনাশী ফল।

হিন্দুশাস্ত্রপ্রণেতা ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ বর্ত্তমান দেহের মৃত্যুর পর, পরকাল

মানিতেন এবং পুনর্জ্জন্মও মানিতেন। পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুই সংসার। ইহা দুঃখজনক। যাহাতে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়, সেই উদ্দেশ্যে ঋষিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে কর্ত্তব্য কর্ম্মের উপদেশ আছে।

নারী জাতির মধ্যে সধবার যাহা কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্ম, বিধবার ঠিক তাহাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম নহে। বিধবার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে এখন আলোচনা করা যাইতেছে।

বিধবার দেহ ভোগ সুখের জন্য নহে। পরকালেও বিধবা দুঃখ ভোগ না করিয়া সুখী হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে বিধবার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিধি-বদ্ধ হইয়াছে।

বিধবার কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুইটী প্রশস্ত পথ শাস্ত্রে প্রদর্শিত আছে।

"মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা।"

বিষ্ণু-সংহিতা।

পতি মৃত হইলে বিধবা স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে, অথবা মৃত পতির চিতারোহণ করিবে অর্থাৎ সহমৃতা হইবে।

ধর্ম্মশাস্ত্রে বিধবার উক্ত দুই প্রকার কর্ত্তব্য পালন করার ব্যবস্থা আছে। পতির মৃত্যু হইলে তাহার চিতারোহণ করিয়া সহ-মরণ যাওয়া অথবা জাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যাওয়া।

হিন্দু বিধবার পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্র সঙ্গত কি না ?

মহামুনি পরাশর কলিযুগের অনুশাসনার্থ স্মৃতি—সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছেন। সেই পরাশর সংহিতায় নারী জাতির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত শ্লোকে এইরূপ বিধি আছে ;—

নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতেপতৌ।
পঞ্চ স্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যোবিধীয়তে॥

পরাশর-সংহিতা।

(ক) পতি পলায়ন করিলে (খ) পতি মৃত হইলে (গ) পতি পরিব্রাজক হইলে (ঘ) পতি ক্লীব হইলে (ঙ) পতি পতিত হইলে, এই পাঁচ প্রকার আপদে নারীগণের অন্য পতি গ্রহণের বিধি-বিহিত।

উক্ত-শ্লোকে—

(ক) পতি যদি পলায়ন করিয়া নিরুদ্দিষ্ট হয় (খ) পতি যদি প্রব্রাজিত হন অর্থাৎ জ্ঞানমার্গ গ্রহণ করেন, (গ) পতি যদি ক্লীব হয় (ঘ) পতি যদি পতিত হয়—জাতি ভ্রষ্ট হয়, এই চারি প্রকার বিপদে অন্য পতি গ্রহণের ব্যবস্থা সধবা বা বাক্‌দত্তা কন্যার প্রতিই প্রযোজ্য। এই চারি প্রকার বিপদ বিধবাকে পায় না।

(খ) পতি মৃত হইলে—এই বিপদে বিধবা এবং বাক্‌দত্তা কন্যাকে বিষয় করে।

মহামুনি পরাশরের এই বচনমূলে উক্ত চারিপ্রকার আপদ কালে সধবার এবং পতি মৃত হইলে বিধবার পুনরায় বিবাহ হওয়া সম্বন্ধে পরাশর মহামুনির প্রকৃত অভিপ্রায় কি ? বিশেষ সতর্কতার সহিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

যাঁহারা শাস্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞ, শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে যাঁহাদের প্রকৃত পাণ্ডিত্য ও অধিকার আছে, এবং হিন্দুশাস্ত্রে যাঁহাদের আস্তিক্য বুদ্ধি ও শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারা

ক্রিয়া বিশেষের শাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে ভ্রম-শূন্য, স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন। যাঁহারা সেরূপ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নহেন অথচ, হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে, তাহারা এইরূপ চিন্তা করেন,—

প্রাচীন কাল হইতে প্রধান অ-প্রধান, বিদ্বান, অ-বিদ্বান্ জ্ঞানী, অজ্ঞানী, সকলের মধ্যেই সমভাবে যে ক্রিয়াকলাপের অবাধ-প্রচলন আছে, তাহার মূলে শাস্ত্রীয়তা থাকা সহজেই অনুমান করা যায়। এবং যে ক্রিয়া কলাপের প্রকার ভেদ সমাজে থাকা লক্ষিত হয় অর্থাৎ যে সমস্ত কার্য্যের দুই প্রকার ব্যবস্থাই সমাজ মানিয়া লইয়াছে সেই কার্য্যের প্রকার ভেদেও শাস্ত্রীয় মত আছে অনুমান করা যায়।

হিন্দু বিধবার পুনর্ব্বিবাহে শাস্ত্রীয়তা থাকিলে অবশ্যই হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণে উহার অবাধ প্রচলন থাকিত। অথবা যদি অধিকারী ভেদেও এই প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রকার ভেদ শাস্ত্রে ব্যবস্থা থাকিত তাহা হইলেও প্রাচীন কাল হইতে কোন না কোন প্রদেশে, কোন না কোন উচ্চবর্ণের সমাজে দুইরূপ ব্যবস্থারই প্রচলন থাকা দৃষ্ট হইত।

"নষ্টে মৃতে" শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য আপদ্ কালে নারী সাধারণের পুনর্ব্বিবাহ হওয়া ঋষিগণের সিদ্ধান্ত হইলে "পতির নষ্টে" "প্রব্রজিতে" "ক্লীবে" এবং "পতিতে" এই চারিপ্রকার আপদ্ কালে, সধবার পুনর্ব্বিবাহ নিষ্ঠাবান হিন্দু সমাজে দৃষ্টি গোচর হইত। এইরূপ আপৎ কালে সধবার পুনর্ব্বিবাহ সমাজে প্রচলন থাকার দৃষ্টান্ত মহাভারতে কি অন্য মহাপুরাণাদিতে দেখা যায় না। সুতরাং এতৎ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয়তা নাই বলিয়াই অনুমান হয়।

পতির মৃত্যু হইলে বিধবা স্ত্রীরও পুনর্ব্বিবাহ প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দু বা উচ্চ বর্ণে প্রচলন থাকার প্রথা পুরাণাদিতে দেখা যায় না।

দয়ার সাগর ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যবস্থামতে নব্য শিক্ষিতগণের কেহ কেহ বিধবার পুনর্ব্বিবাহের পক্ষপাতি হইয়াছেন।

এখন বিধবার পুনর্ব্বিবাহে শাস্ত্রীয়তা আছে কি না তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

বিধবার বিবাহ সম্বন্ধে মনু কি ব্যবস্থা দিয়াছেন দেখা উচিত।

মনুর বচন এই ঃ—

"ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবা বেদনং পুনঃ।"

বিবাহ বিধিতে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ উক্ত হয় নাই।

মনুসংহিতা।

মনুর আর একটী শ্লোক এই ;—

"ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক্বচিৎ ভর্ত্তোপদিশ্যতে।"

মনুসংহিতা।

সাধ্বী স্ত্রীর দ্বিতীয় ভর্ত্তা উপদিষ্ট হয় নাই।

মনুর এই দুই শ্লোক দ্বারা বুঝা যায় মনুর ব্যবস্থামতে বিধবার পুনর্ব্বিবাহের বিধি নাই। কিন্তু মহামুনি পরাশরের ব্যবস্থা মতে, পতি মৃত হইলে বিধবা পুনঃ পতি গ্রহণ করিতে পারে।

মনু ও পরাশর মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ মত প্রতীয়মান হইতেছে।

ঋষিগণ সকলেই ত্রিকাল-দর্শী, এবং তত্বজ্ঞ। তাঁহাদের কাহারও মতভ্রান্তি নাই। সুতরাং তাহাদের মতের পরস্পর অনৈক্য হইতে পারে না।

পরাশর বলেন পতিমৃত হইলে বিধবা পুনঃ পতিগ্রহণ করিতে পারেন। মনু-স্পষ্ট বলিয়াছেন বিবাহ-বিধিতে পুনঃ বিবাহের বিধি নাই।

এই দুই বিরুদ্ধ মতের সমাধান করিয়া শাস্ত্রার্থ তত্বদর্শী পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ "নষ্টেমৃতে" শ্লোকের "পতি" বলিতে প্রতিপালক ব্যবস্থা করিয়াছেন কেহবা বাক্‌দত্তা কন্যা সম্বন্ধে "নষ্টেমৃতে" এই শ্লোকের বিধি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মনুর ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিয়া বিধবার পুনর্ব্বিবাহ সম্বন্ধে পরাশরের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে কোন নিষ্ঠাবান পণ্ডিতগণই অগ্রসর হন নাই। এই মতের সামঞ্জস্য প্রদর্শনের আর একটী পন্থা স্মার্ত্তপণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহা এই ;— পূর্ব্বকালে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপত্তির ব্যবস্থা ছিল। কলিযুগের [illegible] পর্য্যন্ত ক্ষেত্রজ

পুত্রোৎপত্তির ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল সেই কাল পর্য্যন্ত পরাশব মুনি উপরোক্ত পঞ্চ-প্রকার আপদ কালে, সধবা এবং বাগ্দত্তা নারীদিগেব নিয়োগাদি বিধানদ্বারা ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপত্তিব জন্য অন্য পতি স্বীকারের ব্যবস্থা অনুমোদন কবিয়াছেন। ক্ষেত্রজ-পুত্রোৎপত্তির প্রথা বহিত হইবার পব উক্ত পাঁচপ্রকাব আপৎকালে, নাবীমাত্রেবই পুনঃ পতি গ্রহণেব ব্যবস্থা বহিত হইয়া যায়। কেবল বাক্‌দত্তা কন্যাব পুনঃ পতি-গ্রহণের প্রথা হিন্দুসমাজে প্রচলিত আছে।

"বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ সপন্থাঃ।"

মহাভাবত।

বেদে ও স্মৃতিতে পবস্পর বিরুদ্ধ মত থাকা প্রতীয়মান হয়। এমন মুনি নাই, যাহার মত ভিন্ন নহে ; ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত। এই অবস্থায় মহাজনগণ যে পথে চলিয়াছেন তাহাই প্রকৃত পথ।

মনুব ব্যবস্থা ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত এবং পরাশরেব ব্যবস্থাও ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত। ইহাদের পরস্পর বিরুদ্ধ মত লক্ষিত হইলে, হিন্দুসমাজের সাধু সজ্জন এবং নিষ্ঠাবান শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যে পথ ধরিয়া চলিয়াছেন সকলেরই তাহা ধরা কর্ত্তব্য।

উক্ত চারি প্রকাব (ক, গ, ঘ, ঙ,) উপস্থিত হইলে সধবা স্ত্রীর অন্য পতি গ্রহণ করা হিন্দুসমাজেব উচ্চবর্ণেব প্রচলন হয় নাই।

বাগ্দত্তা কন্যার উপরি উক্ত আপৎকালে অন্য পতিব সহিত বিবাহ সমাজে প্রচলন থাকিলেও সেই স্ত্রী—"অন্য-পূর্ব্বা" বলিয়া নিন্দনীয়া।

কলিতে বাগ্দান নাই বলিয়া কোন কোন পণ্ডিতদিগের মত। সেই মতেব অনুসরণ দূষণীয় নয় বলিয়া বাগ্দত্তা কন্যাব বিবাহ প্রচলন হইয়া থাকিবে। বাগ্দত্তা কন্যা অবিবাহিতা থাকা সমাজে দৃষ্ট হয় না।

কোন কোন পণ্ডিত নষ্টেমৃতে (খ) আপদে এই বচনের বিষয় মাত্র বাগ্দত্তা কন্যার পক্ষেই বলিয়াছেন, বিধবা সম্বন্ধে বলেন নাই।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার পণ্ডিতগণ "পতিরন্যোবিধীয়তে" এই বচনে পতি অর্থে "প্রতিপালক" এই অর্থ করেন। কারণ কোন স্ত্রীরই স্বতন্ত্রভাবে থাকা শাস্ত্রের বিধান নহে। এক জনের আশ্রয়ে থাকিবারই বিধি। এমত অবস্থায় "পতি" অর্থ প্রেতিপালক বুঝিতে হইবে। এইরূপ ব্যাখ্যা কষ্ট কল্পনা কিনা প্রকৃত শাস্ত্রার্থ? শাস্ত্র তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ বলিতে পারেন। "আদার বেপারি" হইয়া আমার "জাহাজের" খবরের প্রয়োজন নাই।

উপরি উক্ত পাঁচ প্রকার আপৎকালে সধবার পুনর্ব্বিবাহ এবং বাক্দত্তা কন্যার, বিবাহ সম্বন্ধে ভালমন্দের আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

উক্ত আপৎকালে বিধবার পুনঃ বিবাহ কর্ত্তব্য কি না? এই সম্বন্ধে সংক্ষেপ আলোচনার প্রয়োজন। উক্তরূপ (ক, খ, গ, ঘ, ঙ) পাঁচ প্রকার আপদের কোন একটী সংঘটিত হইলে, তদবস্থায় স্ত্রীগণ অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে। পরাশর মুনির এই বিধি ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপত্তি সম্বন্ধেই মনে করিতে হইবে।

কেবল যথাশাস্ত্র ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপত্তির জন্য সাধ্বী স্ত্রী আপদ্কালে নিয়োগাদি নিয়ম ক্রমে অন্যপতি স্বীকার করা এবং এইরূপ আপৎকালে সাধ্বী স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ সূত্রে অন্য পতি গ্রহণ করার মধ্যে পার্থক্য আছে। নিয়োগাদি ক্রমে পূর্ব্বে কোনকালে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন করার প্রথা শাস্ত্র-সম্মত এবং পুরাণাদিতে ইহার উল্লেখ থাকিলেও বিধবার পুনর্ব্বিবাহ কোনকালেও শাস্ত্র-সিদ্ধ ছিল না। মনুর বচনে ইহাই বুঝা যায়।

মহামুনি পরাশর বিধবার ব্রহ্মচর্য্য এবং সহমরণ গমনের পারলৌকিক ফলের উল্লেখ করিয়াছেন। বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হওয়া তাঁহার ব্যবস্থা-সম্মত হইলে তৎসম্বন্ধেও পারলৌকিক ফলের কথা উল্লেখ থাকিত।

সাধ্বী স্ত্রীর পতিই দেবতা, পতিই প্রাণ! হিন্দুশাস্ত্রের বিবাহবন্ধন অচ্ছেদ্য ইহ পরকালের সম্বন্ধ। পতি স্থূলদেহ ত্যাগ করিলে, বিধবা স্ত্রীর সহিত সেই

অচ্ছেদ্যসম্বন্ধ দূর হয় না। পরকালে সূক্ষ্মদেহে উভয়ের মিলন হইবার সম্ভাবনা থাকে।

বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হইলে, ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা হয় না। আরাধ্য দেবতাকে "ব্রহ্ম" ভাবে ভাবনা করাই শাস্ত্রের বিধি। নারীজাতির পতিই দেবতা। পতিকে ব্রহ্ম ভাবে ভাবনা করিবে। ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়। বিধবা স্ত্রীকে ব্রহ্মচারিণী হইতে হইলে, মৃতপতির আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাহারই প্রীত্যর্থে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যাওয়াই সঙ্গত।

বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হইলে এক ক্ষুদ্র মন কোন্ পতিকে দেবতা বলিয়া চিন্তা করিবে? দুই পতি এক মনের আরাধ্য হইতে পারে কি? ক্ষুদ্র মনে দুই জনের বসিবার স্থান হয় না। গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্য মন্ত্র গ্রহণ করা যেমন গর্হিত ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ; বিধবার অন্য পতি গ্রহণ ও সেইরূপ গর্হিত ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। বিধবার পুনর্ব্বিবাহ হইলে, এই জন্যই ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা হয় না। সেইজন্য মনু বিধান করিয়াছেন, সাধ্বী নারীর দ্বিতীয় পতি হইতে পারে না। মনুর বিবাহ বিধিতে বিধবার পুনর্ব্বিবাহের কোনই উপদেশ নাই। মনু স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন।

যাঁহারা শাস্ত্রের এক দেশ-দর্শী,—ঋষিগণের আপাতঃ প্রতীয়মান বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য করিতে ইচ্ছুক নহেন বা চেষ্টা করেন না এবং যাহারা অযথা দয়া পরবশ হইয়া বিধবার পুনর্ব্বিবাহ কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করতঃ তাঁহাদের পক্ষ সমর্থনার্থ শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাই পরাশর মুনির "নষ্টেমৃতে" বচনের প্রতি নির্ভর করিয়া বিধবার পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্র সিদ্ধ বলিয়া মনে করেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত পাঁচ প্রকার আপদের কোন একটী সংঘটিত হইলে, ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের জন্য যে কোন স্ত্রী (সধবা হউক, বিধবা হউক) অন্য-পতি গ্রহণ করিতে পারিবে, ইহাই পরাশরের ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে মনুর ব্যবস্থার সহিত অনৈক্য হয় না।

মহামুনি পরাশরের স্মৃতিতে বিধবার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আরও দুইটি শ্লোক দৃষ্ট হয়।

তাহা এই ;—

(১) "মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ।"

(২) ত্রিস্র কোট্যর্দ্ধ কোটীচ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তু যা বানু গচ্ছতি॥"

(১) পতি মৃত হইলে যে নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা থাকেন, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন, সেই নারীর মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচারীগণের যেরূপ স্বর্গ ভোগ হয়, তিনিও সেইরূপ স্বর্গভোগ লাভ করিয়া থাকেন।

(২) যে নারী মৃত পতির চিতানুগমন করেন অর্থাৎ সহমৃতা হন, সেই নারী তাহার শরীরের সাড়ে তিনকোটী লোম পরিমাণ বৎসর স্বর্গবাস করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত "নষ্টে মৃতে" শ্লোকের এবং এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচার করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় পরাশর মহামুনি বিধবার তিনটী গন্তব্য পথের বা কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন। তাহা এই ;—

(১) ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনের জন্য বিধবার অন্য পতি গ্রহণ করা। কলির কিছুকাল পরেই ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। সেই সময় হইতে বিধবার পুনঃ পতিগ্রহণও নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"নষ্টে মৃতে" এই বচনের বলে দয়ার সাগর প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থার মূলে কেহ কেহ বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী হইলেও হিন্দু সমাজে উহার অবাধ প্রচলন হয় নাই। পরন্তু নিষ্ঠাবান হিন্দু সমাজে একেবারেই প্রচলন হয় নাই। এই বচন পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণও জানিতেন এবং হিন্দু সমাজের নেতারাও জানিতেন। সুতরাং হিন্দু সমাজের সাধারণেরও জানা ছিল।

বিবাহ বিধিতে বিধবার পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা নাই, মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন। বিধবার পুনর্ব্বিবাহে পারত্রিক উপকারিতা বা গতি সম্বন্ধে পরাশর কিছুই বলেন

নাই। বিধবার বিবাহে বিবাহের অঙ্গীব হিন্দু শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া কলাপেরও সঙ্গতি হয় না এবং এতৎ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কার্য্য বিধিও হিন্দুশাস্ত্রে নাই। এইজন্য হিন্দু সমাজের মধ্যে বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। এইজন্যই বিধবার বিবাহ হেয় মনে করিতে হইবে। এই ব্যবস্থার উপাদেয়তা থাকিলে সমগ্র হিন্দু সমাজ উহা এক বাক্যে গ্রহণ করিত।

বানর জাতীয় বালী রাজার স্ত্রী তারাদেবী এবং রাক্ষস জাতীয় রাবণ রাজার স্ত্রী মন্দোদরী দেবীর দ্বিতীয়বার বিবাহ রামায়ণে বর্ণিত থাকিলেও উচ্চবর্ণের মনুষ্য মধ্যে বিধবা বিবাহের দৃষ্টান্ত পুরাণাদিতে বিরল।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিধবা নারীর পুনর্ব্বিবাহে পরকালে প্রেয় কি শ্রেয়ঃ কোন প্রাপ্তিরই উল্লেখ নাই। অতএব হিন্দু বিধবার বিবাহ সূত্রে পুনঃ পতি গ্রহণ কল্পশাস্ত্র বিরুদ্ধ ও পরিত্যাজ্য।

চিতারোহণ ও ব্রহ্মচর্য্য পালন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

২। বিধবার মৃত পতির চিতারোহণ করিয়া দেহ ত্যাগ করা।

৩। বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়া জীবন যাপন করা।

স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষত্ব এই ;—দেহ নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী, ইহলোকের সুখ, দুঃখও ক্ষণস্থায়ী। লৌকিক বা বৈষয়িক সুখ-ভোগ পরিণামে দুঃখেরই কারণ। কারণ বৈষয়িক সুখে আত্মোন্নতি হয় না। এজন্য যাহাতে পরকালে শ্রেয়ো লাভ হয় এবং দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়, এই চিন্তা করিয়া পরম কারুণিক ত্রিকালজ্ঞ তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ হিন্দুধর্ম্মের বিধি নিষেধ প্রণয়ন করিয়াছেন।

হিন্দু বিধবার (১) পতির সহমরণ যাওয়া ; (২) আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করা; এই দ্বিবিধ পন্থার কোনটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা এবং পরিণামে মঙ্গলজনক তাহাই এখন বিচার্য্য।

মৃত পতির সহমৃতা স্ত্রীর পরকালে স্বর্গ ভোগের ফলশ্রুতি আছে। সুতরাং বিধবা নারীর পতির সহমৃতা হওয়া এবং ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বন করা উভয়ই ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত। এই দুই কল্পের মধ্যে কোন কল্প প্রথম ও শ্রেষ্ঠ তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

মহামুনি পরাশর, বিধবা স্ত্রী পতির সহমৃতা হইলে পরকালে কি ফল লাভ হয়, তৎ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—মনুষ্য শরীরে সাড়ে তিন কোটী সংখ্যক লোম আছে, যে স্ত্রী পতির সহমৃতা যাইবেন, তিনি তাহার শরীরের সাড়ে তিন কোটী লোম পরিমাণ বৎসর স্বর্গ ভোগ করিবেন। তিনি নিজেও স্বর্গভোগ করিবেন এবং পতি, পিতা, মাতা শ্বশুর শাশুড়ীদিগকেও স্বর্গভোগ করাইবেন।

সহমরণের ফল নির্দ্দিষ্ট কাল স্বর্গ ভোগ মাত্র। সাড়ে তিনকোটী বর্ষ কাল অতীত হইলে পুণ্যক্ষয় হয়। তাহার ফলে স্বর্গ হইতে পতিত হইতে হয়। সহমরণ-গমনকারিণী স্ত্রীকে পুনরায় ক্ষীণ পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয়।

বিধবার ব্রহ্মচারিণী হওয়ার দ্বিবিধ ফল আছে।

বিধবা যদি কাম্যফল—স্বর্গভোগ প্রার্থিনী হইয়া ব্রহ্মচারিণী হন, তবে তিনিও কাম্যফল স্বর্গ-ভোগ লাভ করিতে পারেন। কিন্তু স্বর্গভোগের শেষ আছে, স্বর্গভোগ শেষ হইলে ব্রহ্মচারিণী বিধবাকে পুণ্যক্ষয়ে পুনঃ মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।

যে ব্রহ্মচারিণী বিধবা নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অনাসক্ত ভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যান, তিনি ব্রহ্মপদ লাভের অধিকারিণী হইবেন। সেই ব্রহ্মলোক হইতে ক্রমে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন। আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হইবেনা। ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরম শ্রেয়োলাভ। অতএব বিধবার ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনই প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ কল্প।

বিধবার সহমরণ শ্রেয়ঃ কল্প হইলেও উহা দ্বিতীয় কল্প।

বিধবার পতির চিতারোহণ করিয়া নিজ দেহ ত্যাগ করা শাস্ত্রানুমোদিত। ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়া বৈধব্য জীবন যাপন করাও শাস্ত্র সঙ্গত। এই দুই কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে কোনটী প্রথম কল্প, এতৎ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ মধ্যে মত-ভেদ আছে। স্বনামধন্য পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বলেন,—"ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করাই প্রথম কল্প।" মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবি-সম্রাট্ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের মতে "মৃত পতির অনুগমন করাই প্রথম কল্প।" অধিকারী ভেদে শাস্ত্রের ব্যবস্থা ভিন্নরূপ হইয়া থাকে।

পরকালের উৎকৃষ্ট ফল বিবেচনায় সর্ব্বশ্রেণীর বিধবার পক্ষেই ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করা যে প্রথম কল্প তাহাতে সন্দেহ নাই। উচ্চাধিকারিণী বিধবার অর্থাৎ যাহার মনে মনে দৃঢ় ধারণা হইয়াছে, স্ত্রীর দেহ মন পতির দেহ মন হইতে পৃথক নহে, বিবাহ মন্ত্র বলে উভয়ের দেহ মন মিশ্রীকৃত হইয়া এক হইয়া গিয়াছে,

নিজের দেহ পতির দেহের ছায়া মাত্র। সেইজন্য পতিই যাঁহার একমাত্র গতি এই ধারণায় সর্ব্বথা পতিরই অনুগমন করিবে। জীবনে মরণে সকল অবস্থায় সকল সময়ে পতির অনুগমন করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। এইরূপ স্থিরমতি বিধবার পক্ষেই পতির চিতারোহণ করাই প্রথম কল্প। মনের এইরূপ অবিচলিত অবস্থা হওয়া বড়ই কঠিন।

শ্রীশ্রীভগবান্ গীতায় অধিকারী ভেদে শাস্ত্রোক্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রকার ভেদ বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন,—"কর্ম্ম সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ," "নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা অপেক্ষা স-গুণ ব্রহ্মের উপাসনা শ্রেষ্ঠ" এইরূপ উপদেশ স্থলে প্রকার ভেদে দুইরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে একটী হেয়, অপরটী উপাদেয় এইরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে। স্বতন্ত্ররূপে উভয়বিধ কর্ত্তব্য কর্ম্মেরই সার্থকতা আছে। সুতরাং অধিকারী-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা মনে করিতে হইবে।
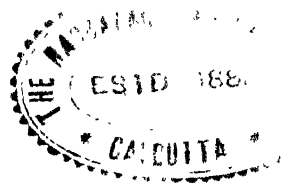
চিতারোহণ।

হিন্দু বিধবার মৃত পতির চিতারোহণ সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ কিছু লিখিতেছি।

মৃত পতির চিতারোহণকারিণী সাধ্বী স্ত্রী দুই শ্রেণীতে গণ্যা হন।

(১) ধর্ম্মের জন্য দেহ পাত করা শাস্ত্রের বিধান। মৃত পতির চিতারোহণ করা সাধ্বী স্ত্রীর কর্ত্তব্য এবং শাস্ত্রানুমোদিত। মনে এইরূপ দৃঢ় ধারণা করিয়া পতির মৃত্যু হইলে যে অ-প্রমত্তা সত্ব-গুণ প্রধানা সাধ্বী স্ত্রী শোকে মোহে অভিভূতা না হইয়া কর্ত্তব্য বোধে স্থির-চিত্তে মৃত পতির পারত্রিক মঙ্গল কামনা করিয়া প্রসন্ন মনে চিতারোহণ করিয়া দেহত্যাগ করেন, তিনিই প্রথম শ্রেণীর সতী এবং পূজার্হা, ধর্ম্মপ্রাণা এরূপ সাধ্বী স্ত্রীর সংখ্যা অঙ্গুলী দ্বারা গণনা করা যায়।

(২) যে পতিপরায়ণা সাধ্বী স্ত্রী দুর্ব্বলমনা এবং রজঃ ও তমোগুণ প্রধানা, যাহারা ইহজীবনে প্রিয় পতির বিয়োগ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে অসমর্থা, পতি-বিয়োগে যাহার শোকোচ্ছাস এত প্রবল হইয়া পড়ে যে, একমুহূর্ত্তও পতি-বিয়োগ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারেন না, সেই শোকমুগ্ধা সাধ্বী স্ত্রী নিজ দেহকে তখন তুচ্ছ মনে করেন। মৃত পতির সহ গমন করাই যেন তাহার পক্ষে দুঃসহ শোক নিবারণের প্রধান উপায় বলিয়া মনে করেন, পরন্তু পতি-বিয়োগে মৃত পতির অনুগমন ধর্ম্ম কার্য্য পাপকার্য্য নয়, শাস্ত্রে পতির চিতারোহণের ব্যবস্থা আছে, ইহাও মনে মনে চিন্তা করিয়া মনের সেই আবেগে হাসিতে হাসিতে পতির চিতায় আরোহণ করিয়া শোক সন্তপ্ত দেহ নষ্ট করেন। এই শ্রেণীর সাধ্বী স্ত্রী—দ্বিতীয় শ্রেণী ভুক্তা হইতে পারেন।

মৃত পতির অনুগমন-নিষ্ঠা প্রবৃত্তিমূলক। সকামা সাধ্বী স্ত্রীর এইরূপ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সমাধি বা ব্রহ্মপদ লাভের উপযুক্ত নহে।

সাধ্বী স্ত্রীর এরূপ প্রবৃত্তি হওয়া স্বাভাবিক। মহাকবি কালিদাস মৃত পতির অনুগমন করা সাধ্বী স্ত্রীর স্বাভাবিক কর্ত্তব্য বলিয়া লিখিয়াছেন ;—

চন্দ্রের অস্ত গমনের সহিত কৌমুদী অর্থাৎ জ্যোৎস্নাও অস্ত যায়। মেঘের সহিত তড়িৎ অর্থাৎ বিদ্যুৎও লয় প্রাপ্ত হয়। মেঘ না থাকিলে বিদ্যুৎও থাকেনা। সেইরূপ প্রমদা স্ত্রী পতির পথই—অনুসরণ করেন। * এই নিয়ম অচেতন পদার্থ দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে।

প্রমদা শব্দের অর্থ কি? মদ-শব্দ হইতে প্রমদ-শব্দ হইয়াছে। তামস প্রকৃতির স্ত্রীলোকই প্রমদা হইয়া থাকে। প্রমদার এই অর্থ ধরিলে প্রিয় পতি-বিয়োগে সাধ্বী বিধবা শোকোন্মত্তা হইয়া পতির সহ মরণ গমন করাই বুঝা যায় না কি?

অপ্রমত্তা—শোক-মোহে অনভিভূতা সতী স্ত্রীর মৃত পতির চিতারোহণের দৃষ্টান্ত বিরল হইলেও পুরাণে আছে।

মহাভারতে পাণ্ডুরাজার মরণের পর তাহার দ্বিতীয় স্ত্রী মাদ্রীদেবী মৃত পতির চিতায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। মাদ্রীদেবী সতর্কতা অবলম্বন করিলে মৈথুন অবস্থায় পাণ্ডুরাজার মৃত্যু হইত না। এইজন্য মাদ্রীদেবী অনুতপ্তা হইয়া এবং মৃত পতির চিতারোহণ করা ধর্ম্মকার্য্য মনে করিয়া মৃত পতির অনুগমন করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে মহর্ষি জামদগ্নির সাধ্বী স্ত্রী রেণুকা দেবী কর্ত্তব্য বোধেই প্রসন্ন মনে স্থিরচিত্তে মৃত পতির চিতারোহণ করিয়াছিলেন।

পতি বিয়োগে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যাওয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্প পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সত্ত্বপ্রধানা শোক-মোহ অনভিভূতা

---

* "শশিনা সহ যাতি কৌমুদী
সহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়তে।
প্রমদা পতি বর্ত্তগা ইতি
প্রতিপন্নং হি বিচেতনৈরপি॥"

কুমার-সম্ভব।

সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচারিণী হইয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যাওয়ার দৃষ্টান্ত পুরাণাদিতে আছে।

হর কোপানলে মদন ভস্মের পর রতি মৃতপতির অনুগমন করেন নাই। পাণ্ডু রাজার প্রথমা সহধর্ম্মিণী কুন্তিদেবী পতির সহমৃতা হন নাই। রাজা দশরথের প্রধানা তিন পত্নী ছিলেন; দশরথের মৃত্যু হইলে তাঁহার কোনপত্নীই মৃত পতির অনুগমন করেন নাই। উপরিউক্ত সাধ্বী স্ত্রীগণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়া জীবিতা ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে রাজ বিধান মতে সতী-দাহ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে।

দীর্ঘকাল ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী রাজার অধীনে থাকিয়া হিন্দু সমাজের অবস্থা এখন অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভিন্ন ধর্ম্মী প্রবল রাজার প্রবর্ত্তিত ভিন্ন ভাবে শিক্ষা লাভ করিয়া হিন্দু সমাজের চিন্তার প্রবাহ অন্য পথে চলিতেছে। সংস্কৃত শাস্ত্রের এখন পূর্ণালোচনা ও অধ্যয়ন নাই। সুতরাং হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি কিম্বা হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি এখন নব্য-শিক্ষিত-দিগের পূর্ব্ববৎ শ্রদ্ধা নাই। হিন্দু ধর্ম্মমূলক অনেক ব্যবস্থা আপাততঃ দুঃখজনক মনে করিয়া অনেক নব্যশিক্ষিত ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্মের সংযম ও কঠোরতার প্রতি আস্থাহীন হইয়াছেন। তাহার ফলে ভিন্নধর্ম্মী রাজা সতীদাহ বর্ব্বরোচিত কুপ্রথা ঘোষণা করিয়া দেশীয় নব্য শিক্ষিতের মতানুসারে এবং নিষ্ঠাবান হিন্দু পণ্ডিতদিগের ও হিন্দু সমাজের প্রতিবাদ সত্বেও মৃতপতির চিতারোহণবিধি রাজ-বিধান বা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

ঠেকিয়া শিখিয়া এখন নব্য-শিক্ষিতের মধ্যে অনেকেই ইংরেজী বিকৃত শিক্ষার দোষ-দর্শন করিতেছেন এবং ইংরেজী শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

যাহা হউক, এখন আর কোন স্ত্রীই স্বাধীনভাবে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া মৃতপতির চিতারোহণ করিতে পারেন না। সুতরাং—

"মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা।"

"বিধবার ব্রহ্মচর্য্য পালন।"

এই বিধিদ্বয় মধ্যে কেবল ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করাই বিধবা নারীর একমাত্র পথ মুক্ত রহিয়াছে। পতির মৃত্যুর পর সতী নারীর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ধারণ করিয়া জীবিত থাকাই এখন একমাত্র এবং প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কল্প। এতৎ সম্বন্ধে পুনবায় কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

বিধবা স্ত্রীর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে ব্যবস্থিত থাকা সম্বন্ধে মহামুনি পরাশরের বচন এই

"মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥"

পতির মৃত্যু হইলে যে স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বন করিয়া থাকেন, সেই স্ত্রীর মৃত্যু হইলে তিনি ব্রহ্মচারীদিগের লভ্য স্বর্গ লাভ করেন।

এখন দেখা যাইতেছে, ব্রহ্মচারীগণ মৃত হইলে স্বর্গভোগ বা ব্রহ্মপদ লাভ করেন। পতি মৃত হইলে যে নারী ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে ব্যবস্থিত থাকেন সেই ব্রহ্ম-চর্য্য ব্রত ধারিণী বিধবা স্ত্রী মৃতা হইলে স্বর্গ-ভোগ বা ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন। ব্রহ্মচারীগণের যে গতি লাভ হয়, ব্রহ্মচারিণী বিধবাও সেই গতি লাভ করেন।

বলা বাহুল্য যে, যে ব্রহ্মচারী জীবমানে সকাম কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, মৃত হইলে তিনি স্বর্গ ভোগ লাভ করেন। সেইরূপ যে বিধবা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়া জীবমানে সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই বিধবা সকাম কর্ম্মফলে স্বর্গ ভোগ লাভ করেন। কিন্তু যে ব্রহ্মচারী নিষ্কাম হইয়া অনাসক্ত ভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যান, মরণের পর তিনি ব্রহ্ম-পদ লাভের অধিকারী হন। সেইরূপ যে বিধবা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বনে অনাসক্ত ভাবে নিষ্কামা হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যান তিনিও নিষ্কাম ব্রহ্মচারীর ন্যায় ব্রহ্মপদ-লাভ করিতে অধিকারিণী হন।

আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে মৃতপতির সহগমন রাজাজ্ঞা দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে এখন বিধবার কেবল ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ধারণ করাই একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্মের পথ উন্মুক্ত আছে। ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করা কেবল বিধবার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কেন, সমগ্র মানব জাতির প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যিনি ব্রহ্মচর্য্যে স্থিত হইতে পারিয়াছেন, কি স্ত্রী কি পুরুষ তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যশালী।

হিন্দু বিধবাদের দৈহিক সুখ-ভোগের সুযোগ নাই বলিয়া বিধবাদিগকে হেয় কিম্বা কৃপাপাত্রী মনে করিতে হইবে না। হিন্দু সমাজের দেশাচার মতে সাংসারিক কোন কোন উৎসব ব্যাপার বিশেষে এবং কোন কোন মাঙ্গলিক কার্য্য বিশেষে বিধবার অধিকার নাই বলিয়া সাধারণতঃ অনেকেই বৈধব্য অবস্থাকে হেয়,— শোচনীয় মনে করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়-সেবা-পরায়ণা ভোগ-বিলাসিনী মেয়েদের সম্বন্ধে বৈধব্য দশা—শোচনীয় এবং দুঃখজনক সন্দেহ নাই। কিন্তু যে বিধবা যথাশাস্ত্র কুলাচার ও দেশাচার মতে বিধবার কর্ত্তব্য পালনে ইচ্ছুক এবং যে বিধবা ইচ্ছানুরূপ যত্ন ও সাধনা দ্বারা সংযত-চিত্তা হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে স্থিতা হইতে পারিয়াছেন, তাহার কোনই দুঃখ হয় না। তিনিই সৌভাগ্যবতী, নারী সমাজে তাহার স্থান অনেক উপরে, তিনি দেবী স্থানীয়া এবং সকলেরই প্রণম্যা।

ব্রহ্মচারিণী বিধবা মা লক্ষ্মীগণ, ধর্ম্মের নিবৃত্তির পথে চরণশীলা হইয়া থাকেন। সেইজন্য সেবাধর্ম্ম ভিন্ন সাংসারিক বা বৈষয়িক কোন কাজেই তাঁহারা জড়িতা হইতে চাহেন না। সুতরাং অনেক উৎসব ব্যাপারে তাঁহারা যোগদান করেন না। সেইজন্য এই কাজে তাঁহাদের অধিকার নাই বলিয়া সাধারণে মনে করিয়া থাকেন।

প্রাতঃস্মরণীয়া মহাতপস্বিনী দয়ার প্রতিমূর্ত্তি পুণ্যশ্লোকা নাটোরের রাণী ভবানী দেবী, পুঁটীয়ার মহারাণী শরৎ সুন্দরী দেবী, মুক্তাগাছার বিমলা দেবী, লক্ষ্মীদেবী ও বিদ্যাময়ী দেবী, গৌরীপুরের ভাগীরথী দেবী, গঙ্গাময়ী ও নারায়ণী দেবী প্রভৃতি প্রভূত সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াও বিধবা অবস্থায় আমরণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়া কতকিছু পুণ্যকার্য্য করতঃ জনসমাজে ধন্যা, নমস্যা ও পূজার্হা

হইয়াছেন। ইঁহারা জন সমাজে মাতৃ-স্বরূপা ছিলেন। এখনও ইঁহাদের নাম স্মৃতি-পথে উদিত হইলে, মন পবিত্র হয়, এবং নির্ম্মল আনন্দে মন প্রাণ ভরিয়া যায়। বস্তুতঃ কি সধবা কি বিধবা, কি স্ত্রী কি পুরুষ যে কেহই হউন না, সদ্‌গুণ এবং সৎকার্য্য দ্বারাই ইহলোকে স্মরণীয় ও যশস্বী হইয়া থাকেন; এবং দেহান্তে পরম শ্রেয়ঃ লাভ করেন। মনুষ্যজন্ম দুর্লভ। মনুষ্যজীবনের কোন অবস্থাই স্বভাবতঃ হেয় কি শোচনীয় নহে।

মক্তাগাছার অন্যতম ভূম্যধিকারিণী এবং ৺কাশীধামে আত্মজ্ঞান প্রদায়িনী সভার প্রতিষ্ঠাত্রী যোগেশ্বরী শ্রীযুক্তা প্রমোদা সুন্দরা দেবী চৌধুরাণী মহাশয়া তাঁহার স্বত্ব দখলীয় সমস্ত সম্পত্তি, "যোগাশ্রম" প্রতিষ্ঠা কল্পে উৎসর্গ করিয়া কাশীধামে ব্রহ্মচারিণী অনাথা বিধবাদের বাসের ও আহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহার এই সৎকার্য্য প্রসংশনীয় এবং ধনবান সজ্জন দিগের অনুকরণীয়।

বিধবাদিগের ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করাই একমাত্র এবং প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ব্রহ্মের এবং ব্রহ্মচর্য্যের স্বরূপ বুঝাইতে যথাশক্তি আলোচনা করিয়াছি। কি উপায়ে ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা হইতে পারে তাহাও বিবৃত করা হইয়াছে।

ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারিণী বিধবাগণকে এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

একাদশী ব্রত পালন করা হিন্দু বিধবা মা লক্ষ্মীগণের বিশেষভাবে বিহিত। এতৎ সম্বন্ধে সংক্ষেপ আলোচনা করা যাইতেছে।

ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা—একাদশীর উপবাস।

শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষের একাদশী তিথিতে কিছুই আহার না করিয়া অহোরাত্র উপবাস করিয়া থাকাই একাদশীর উপবাস বা ব্রত। একাদশীর দিনে ভোজন না করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। হিন্দু শাস্ত্র মতে, যে মনুষ্যের বয়স ৮ বৎসরের অধিক হইয়াছে, এবং ৮০ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, এইরূপ সকল মনুষ্যেরই একাদশী দিনে ভোজন করা নিষিদ্ধ। মোহ বশতঃ ভোজন করিলে পাপ হইবে। একাদশী দিনে ব্রাহ্মণ এবং বিধবার আহার বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ।

একাদশীর উপবাস করা বিধবার কর্ত্তব্য।

"বিধবা যা ভবেন্নারী ভুঞ্জীতৈকাদশী দিনে,
তস্যাস্তু সুকৃতং নশ্যেৎ ভ্রূণহত্যা দিনে দিনে।

(স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক উদ্ধৃত কাত্যায়ন বচন।)

যে নারী বিধবা হন্ এবং একাদশীতে ভোজন করেন, তাঁহার পুণ্য নাশ হয়। ভ্রূণ অর্থাৎ গর্ভস্থ শিশু হত্যা করিলে যে পাপ হয়, বিধবা স্ত্রী একাদশীতে ভোজন করিলে, সেই পাপ হইবে।

যে বিধবা একাদশীর উপবাস না করিবেন, তিনি উক্ত প্রকার পাপভাগিনী হইয়া পতিতা হইবেন। তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য অঙ্গহীন হইবে। তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের পূর্ণ ফল লাভ হইবে না। শাস্ত্রবিধান অনুসারে ব্রাহ্মণ ও বিধবার পক্ষে একাদশী নিত্যকর্ম্ম,—অবশ্য কর্ত্তব্য।

যে মানুষের ৮ বৎসর অতীত হয় নাই, অশীতি বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, সেই মানুষের একাদশী দিনে উপবাস না করিলে, পাপ হইবে না। বিধবার পক্ষে সে ব্যবস্থা নাই।

স্মার্ত্তাচার্য্য রঘুনন্দন বলিয়াছেন ঃ—

"বিধবায়াস্তু সর্ব্বথা নিত্যত্বমাহ—কাত্যায়ণঃ।"

বিধবার একাদশীর উপবাস সর্ব্বপ্রকারে নিত্যকর্ম্ম মধ্যে গণ্য। ঋষি কাত্যয়নের এই মত। এই জন্যই বিধবার পক্ষে একাদশী নিত্যকর্ম্ম,—না করিলে পাপ। "বিধবা যা ভবেন্নারী" পূর্ব্বোক্ত কাত্যয়ন বচন প্রমাণ স্বরূপ ধরা হইয়াছে।

নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করা হয়। তাহাতে পাপশ্রুতি আছে। বিধবার দেহ ভোগ সুখের জন্য নহে। ধর্ম্মার্থে দেহ পাত করা শাস্ত্রের বিধি। "কামন্তু ক্ষপয়েৎ দেহং" বিধবা ইচ্ছা করিয়া দেহ ক্ষীণ করিবে, শাস্ত্রের এই মত। একাদশী তিথিতে উপবাসী থাকিলে শারীরিক কষ্ট হয়— অস্বীকার করা যায় না। ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী পুরুষ কি বিধবা এই দৈহিক কষ্ট সহই করিবেন। একাদশী তিথিতে বিধবার নিরম্বু অর্থাৎ নির্জ্জলা উপবাস করাই শাস্ত্রের সাধারণ বিধি। একাদশীতে কিছুই খাইবে না, জল পর্য্যন্তও খাইবে না। ইহাই শাস্ত্রানুসারে মুখ্য কল্প। যিনি এইরূপ নিরম্বু উপবাস করিতে যুক্তিযুক্ত কারণ বশতঃ অশক্ত হইয়া পড়িবেন তাহার সম্বন্ধে অনুকল্পের অর্থাৎ কিঞ্চিৎ আহার করারও বিধান শাস্ত্রে আছে। বিধবার সম্বন্ধে এইরূপ অনুকল্পের ব্যবস্থা শাস্ত্রসম্মত কিনা এই সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের মতভেদ আছে।

বিধবার একাদশীর নিত্যত্বে বিবাদ নাই। অবস্থা বিশেষে অশক্তা বিধবার পক্ষে অনুকল্পের বা অল্পাহারের ব্যবস্থা তর্কিত। বর্ত্তমান কালে, বিক্রমপুরের পণ্ডিতদিগের এবং পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট্ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের মতে, "বিধবা অবস্থা বিশেষে একাদশীতে অনুকল্প বা অল্পাহার করিতে পারে।" ইঁহাদের মতে অনুকল্পের ব্যবস্থা শাস্ত্রসম্মত।

পণ্ডিতাগ্রগণ্য প্রথিতযশা নিষ্ঠাবান স্বনামধন্য বর্ত্তমান যুগের ঋষি শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বিধবার পক্ষে অনুকল্পের বিরোধী, "নির্জ্জলা উপবাস করাই বিধবার

সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। "ইহাই তাঁহার দৃঢ় মত। তিনি অনুকল্প মতের প্রতিবাদ করিয়া "একাদশী" নামক একখানী পুস্তিকা বিতরণার্থ প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে বিধবার একাদশী দিনে নিরম্বু উপবাস করাই শাস্ত্র। বিধবা অশক্তা বলিয়া কোন অবস্থাতেই অনুকল্পের বিধান নাই, সেই পুস্তিকার একাংশ উদ্ধৃত হইতেছে :—

"বিধবার দেহ ভোগসুখের জন্য নহে। ধর্ম্মই দেহের সাধ্য, ধর্ম্মার্থে যদি কেহ পাত হয়, তাহা বিধবার শ্রেয়ঃসাধন। কেবল বিধবা কেন? সকলের পক্ষেই এই নিয়ম।

"নজাতু কামান্ন ভয়ান্নলোভাদ্ধর্ম্মং ত্যাজজ্জীবিতস্যাপিহোতাঃ"

মহাভারত।

কিন্তু যাহারা বিধবার ন্যায় উচ্চাধিকারী নহে, যাহারা মরণ ভয়ে ভীত তাহাদের জন্যই অনুকল্প। বিধবা মা লক্ষ্মীগণ, যে বড় উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত তাহাদের কি মরণ ভয় আছে? বিধবার ব্রহ্মচর্য্য প্রথম কল্প; সহমরণ দ্বিতীয় কল্প। আবশ্যক হইলে এসম্বন্ধে আরও কিছু বলিব। বলিব যে ব্রহ্মচর্য্য সহমরণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, সেই ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণা বিধবার ধর্ম্মরক্ষা বিষয়ে ও মরণ ভয় কল্পনা যাহারা করেন তাহারা বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের স্বরূপ বুঝিতেই অক্ষম।

"তবে যে সকল বিধবার ব্রহ্মচর্য্য নাই তাহারা তো পতিতা। এ প্রবন্ধে তাহাদের স্থান নাই।

ব্রহ্মচারিণী বিধবার প্রতি দয়া পরবশ হইয়া যাহারা ভক্ষ্য ও পেয়ের ব্যবস্থা করেন তাহাদের দয়া পূর্ব্বকথিত ব্রাহ্মণের প্রতি যুবকগণের দয়ারই অনুরূপ।

"বিধবার প্রতি ঐ প্রকার দয়া যে শাস্ত্র শাসনের বিরুদ্ধ তাহা দেখাইতেছি।

একটী স্মৃতি বচন আছে ;—

"অষ্টাব্দা দধিকো মার্ত্ত্য হ্যাপূর্ণাশীতি বৎসরঃ।
ভুঙ্‌ক্তে যো মানবো মোহাদেকাদশ্যাং সপাপকৃৎ॥"

(স্মার্ত্ত উদ্ধৃত কালমাধবীর ধৃত নারদ বচন।)

"যে মর্ত্ত্যমানবের অর্থাৎ মনুষ্য জাতির মধ্যে উৎপন্ন ব্যক্তির বয়স অষ্টম বর্ষের অধিক এবং অশীতি বৎসর পূর্ণ হয় নাই, সে যদি মোহ বশতঃ অর্থাৎ অকর্ত্তব্য কর্ত্তব্যত্ব ভ্রমে একাদশী দিনে ভোজন করে, সে পাপভাগী হইবে।

কাত্যায়নের একটী বচন আছে ;—

নিত্যোপবাসী যে মর্ত্ত্যঃ শায়ং প্রাতর্ভুজি ক্রিয়াং।
সন্ত্যজেন্মতিমান্ বিপ্রঃ সংপ্রাপ্তে হরি বাসরে॥"

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ধৃত।

"মানব জন্ম গ্রহণ হেতু একাদশীতে নিত্য উপবাস যাহার সিদ্ধ, সেই মতিমান বিপ্র একাদশীতে অহোরাত্র অভোজনে থাকিবে। "বচনস্থ মর্ত্ত্যঃ" পদ নিত্য উপবাসাধিকারের হেতুরূপে উল্লিখিত "বিপ্র" এই পদ—সেই উপবাস না করিলে অন্য জাতি অপেক্ষা ব্রাহ্মণের অধিক দোষ জ্ঞাপনার্থ। * * * * অতএব বিধবার ক্লেশ মনে করিয়া যাহারা দয়াদ্র চিত্তে অনুকল্প ব্যবস্থা দেন, তাঁহাদের দয়া শাস্ত্র শাসনের অবিরুদ্ধ নহে ; প্রত্যুত বিরুদ্ধ। অতএব ঐ দয়া নিকৃষ্ট। শান্তি পর্ব্বেতে—এভ্যঃ পাপং প্রবর্ত্ততে" বলা হইয়াছে। ঐ দয়া সেই "এভ্যঃবহ" অন্তর্গত। ইহাই শাস্ত্র প্রমাণিত সিদ্ধান্ত।

এই দুই বিভিন্ন প্রবল মতের মধ্যে কোন্ মত প্রকৃত শাস্ত্র সঙ্গত, নির্ব্বন্ধ সহকারে অ[illegible]র বলা ধৃষ্টতা। কারণ স্মৃতিশাস্ত্রে আমার অধিকার নাই।

পরম পূজ্য শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট আমি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা অধ্যয়ন করার অনুগ্রহ পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া সম্মানিত হইয়াছি। তাঁহার শাস্ত্রের ব্যবস্থা আমি বেদ-বাক্য বলিয়া স্বীকার করি। বিশেষতঃ বিধবার নির্জ্জলা একাদশীর উপবাস করা আমাদের বংশগত আচার, সুতরাং কুলধর্ম্ম। এই দুই কারণে আমি একাদশীতে নির্জ্জলা উপবাসের পক্ষপাতী।

তাহা হইলেও আমি অনুকল্পের ব্যবস্থাদাতা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেছি।

একাদশীর উপবাসের অনুকল্পে অল্পাহার করার ব্যবস্থা ঢাকা, ফরিদপুর বরিশাল, কুমিল্লা শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে অল্লাধিক প্রচলন আছে। এই ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় সেই অঞ্চলের বিধবাগণের অনেকেই শক্তাশক্ত উভয় অবস্থাতে একাদশীর দিনে ভাত না খাইয়া ফল, মূল, দধি দুগ্ধ এমন কি খৈ ইত্যাদিও আহার করিয়া থাকেন।

নদীয়া, কলিকাতা, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, পাবনা, বগুড়া, রংপুর, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর এবং ফরিদপুরের কতকাংশে ব্রাহ্মণের বিধবাগণের অনেকেই একাদশীতে নির্জ্জলা উপবাস করিয়া থাকেন।

অনুকল্পের ব্যবস্থা থাকাতেই অবস্থা বিশেষের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া শক্তাবস্থায় ও অশক্তাবস্থায় সকল অবস্থাতেই কিছু খাওয়ার প্রথা দাঁড়াইয়াছে। শাস্ত্রবিধির মর্য্যাদা বা সীমা রক্ষা প্রায়ই হইতেছে না! এক টাকার একাদশী, দুই টাকার একাদশী এইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রুটি, পুরী, আলুরদোম্, দধি দুগ্ধ সন্দেশাদি উপচার দ্বারা ভরপেট আহার করিয়া একাদশীর শ্রাদ্ধ করিতে দেখা যাইতেছে। ইহা কি দুঃখের বিষয় নহে!

কাশীখণ্ডে বিধবার একদশী সম্বন্ধে কিছু লিখা নাই। পশ্চিমাঞ্চলে, একাদশী দিনে উপবাস করিয়া থাকার নিয়ম থাকা দেখা যায় না। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ রমণী-গণ একাদশীর দিনে ফলমূল আহার করিয়া থাকেন।

একাদশীর উপবাস বিধবার নিত্যকর্ম্ম। বিধবা ইচ্ছা করিলে ফল লাভের কামনাতেও একাদশী ব্রত করিতে পারেন। একাদশীর নিত্যত্ব ও কাম্যত্ব উভয়ই শাস্ত্রসিদ্ধ। সকামা হইয়া একাদশী ব্রত করিলে বিধবার কাম্যফল লাভ হইবে। কাম্য-ফল বিনাশী, এই দোষ।

মা লক্ষ্মি! তুমি যে বংশের পুত্রবধু সেই বংশের পূর্ব্বের বিধবাগণ যে ভাবে একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়াছেন, ইহাই তোমার কুলধর্ম্ম। তুমিও সেইরূপ উপবাস করিবে ইহাই আমার অভিপ্রায়।

যাঁহারা শাস্ত্রের মর্ম্ম ভালরূপ বুঝেন না, তাঁহারা কায়িক ক্লেশ অনুভব করিয়া

একাদশী উপবাসকে দুঃখজনক মনে করিয়া, উহা দুষ্কৃতকর্ম্মের ফলভোগ মনে করেন। আত্মোন্নতি লাভের শ্রেষ্ঠ সাধন ত্যাগ ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন না। ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। একাদশীর উপবাস করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য, শরীর ধারণ উপযোগী আহার এবং বস্ত্র পরিধান যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য, হিন্দু বিধবা মালক্ষ্মীগণ একাদশীর উপবাসও এইরূপে করাই কর্ত্তব্য এবং প্রয়োজনীয় মনে করিবেন এবং ভক্তির সহিত এই ব্রত পালন করিবেন।

বিধবার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কাশীখণ্ডের উপদেশ যথাযথ উদ্ধৃত হইল ;— *

* অনুযাতি ন ভর্ত্তারং যদি দৈবাৎ কথঞ্চন।
তত্রাপি শীলং সংরক্ষ্যং শীলভঙ্গাৎ পতত্যধঃ॥ ৭১॥
তদ্বৈগুণ্যা দপি স্বর্গাৎ পতিঃ পততি নান্যথা।
তস্যাঃ পিতাচ মাতাচ ভ্রাতৃবর্গস্তথৈবচ॥ ৭২॥
পত্যৌ মৃতেচ যা যোষি দ্বৈধব্যং পালয়েৎ ক্কচিৎ।
সা পুনঃ প্রাপ্য ভর্ত্তারং স্বর্গ ভোগান্ সমশ্নুতে॥ ৭৩॥
বিধবা কবরী বন্ধো ভর্ত্তৃ বন্ধায় জায়তে।
শিরসো বপনং তস্মাৎ কার্য্যং বিধবয়া সদা॥ ৭৪॥
একাহারঃ সদা কার্য্যো ন দ্বিতীয়ঃ কদাচন।
ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা পক্ষব্রত মথাপিবা॥ ৭৫॥
মাসোপবাসংবা কুর্য্যচ্চান্দ্রায়ণ মথাপিবা।
কৃচ্ছ্রং পরাকং বা কুর্য্যাত্তপ্ত কৃচ্ছ্র মথাপিবা॥ ৭৬॥
যবান্নৈর্ব্বা ফলাহারৈঃ শাকাহারৈঃ পয়োব্রতৈঃ।
প্রাণযাত্রাং প্রকুর্ব্বীত যাবত প্রাণঃ স্বয়ং ব্রজেৎ॥ ৭৭॥
পর্য্যঙ্ক শায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিম্।
তস্মাদ্ ভূ শয়নং কার্য্যং পতি সৌখ্য সমীহয়া॥ ৭৮॥
নচাঙ্গোদ্বর্ত্তনং কার্য্যং স্ত্রিয়া বিধবয়া ক্কচিৎ।
গন্ধ দ্রব্যস্য সম্ভোগো নৈবকার্য্যস্তয়া পুনঃ॥ ৭৯॥

যদি দৈবাৎ স্ত্রী কোনরূপেই স্বামীর সহমৃতা না হইতে পারে তাহা হইলেও তাঁহার বিশুদ্ধভাবে চরিত্র রক্ষা করা উচিত। কারণ চরিত্রনাশে অধোগামিনী হইতে হয়। আর তাঁহার অকার্য্যের জন্য, তাঁহার পতি, তাহার পিতা, মাতা এবং ভ্রাতাবর্গ স্বর্গে থাকিলেও তথা হইতে চ্যুত হন, ইহার অন্যথা নাই। যে স্ত্রী স্বামীর মৃত্যু হইলে পর বৈধব্য ব্রত পালন করেন তিনি পরলোকে স্বামীকে পাইয়া স্বর্গ ভোগ করেন। ৭১।৭২।৭৩

তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্ত্তুঃ কুশ তিলোদকৈঃ।
তৎ পিতুস্তৎ পিতুশ্চাপি নাম গোত্রাদি পূর্ব্বকম্ ॥ ৮০ ॥
বিষ্ণোস্তু পূজনং কার্য্যং পতি বুদ্ধ্যা ন চান্যথা।
পতিমেব সদা ধ্যায়েৎ বিষ্ণুরূপ ধবং পরম্ ॥ ৮
যদ্ যদিষ্টতমং লোকে যচ্চ পত্যুঃ সমীহিতম্।
তত্তদ্ গুণ এতে দেয়ং পতি প্রীণ ন কাম্যয়া ॥ ৮২ ॥
বৈশাখে, কার্ত্তিকে মাঘে, বিশেষ নিয়মাংশ্চরেৎ।
স্নানং দানং তীর্থ যাত্রাং বিষ্ণোর্নামগ্রহং মুহুঃ ॥ ৮৩ ॥
বৈশাখে জল কুম্ভাশ্চ কার্ত্তিকে ঘৃত দীপকাঃ।
মাঘে ধান্য তিলোৎসর্গঃ স্বর্গলোকে বিশিষ্যতে ॥ ৮৪ ॥
প্রপা কার্য্যাচ বৈশাখে দেবেদেয়া গলন্তিকা।
উপানদ্ ব্যজনং ছত্রং সূক্ষ্ম বাসাংসি চন্দনম্ ॥ ৮৫ ॥
সকর্পূরঞ্চ তাম্বুলং পুষ্পদানং তথৈবচ।
জল পাত্রান্যনেকানি তথা পুষ্প গৃহাণিচ ॥ ৮৬ ॥
পানানিচ বিচিত্রানি দ্রাক্ষা রম্ভা ফলানিচ।
দেয়ানি দ্বিজমুখ্যেভ্যঃ পতির্মেপ্রীয়তামিতি ॥ ৮৭ ॥
উর্জ্জে যাবন্ন মশ্নীয়াদেকান্ন মথবা পুনঃ।
বৃন্তাকং শূরণং চৈব শূক শিম্বীঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৮৮ ॥
কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েত্তৈলং, কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েন্মধু।
কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েৎ কাংস্যং কার্ত্তিকেচাপিসন্ধিতম্ ॥ ৮৯ ॥

বিধবার কবরীবন্ধন পতির বন্ধনের কারণ। এজন্য বিধবা সর্ব্বদা মস্তক মুণ্ডন করিয়া রাখিবেন। বিধবা অহোরাত্র মধ্যে একাহার করিতে পারিবেন; দুইবার আহার কখনও করিবেন না। বিধবা ত্রিরাত্র উপবাস পঞ্চরাত্র উপবাস, পক্ষব্রত মাসোপবাস এবং চান্দ্রায়ণ, প্রাজাপত্য, পরাকব্রত অথবা তপ্তকৃচ্ছ্রব্রত করিবেন। প্রাণ যাবৎকাল আপনি না যায়, তাবৎকাল যবান্ন ও ফল ভোজন, শাকাহার কিম্বা দুগ্ধমাত্র পান করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। বিধবা নারী পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলে পতিকে অধঃপাতিত করা হয় অতএব বিধবা পতির সুখাভিলাসে ভূমিতে শয়ন করিবেন।

কার্ত্তিকেমৌন নিয়মে ঘণ্টাং চারু প্রদাপয়েৎ।
পত্রভোজী কাংস্যং পাত্র ঘৃত পূর্ণ প্রযচ্ছতি ॥ ৯০ ॥
ভূমিশয্যা ব্রতে দেয়া শয্যা শ্লক্ষ্ণা সতুলিকা।
ফলত্যাগে ফলং দেয়ং রসত্যাগেচ তদ্রসম্ ॥ ৯১ ॥
ধান্য ত্যাগেচ তদ্ধান্য মথবা শালযঃস্মৃতো।
ধেনুর্দদ্যাৎ প্রযত্নেন সালঙ্কারাঃ সকাঞ্চনাঃ ॥ ৯২ ॥
একতঃ সর্ব্বদানানি দীপদানং তথৈকতঃ।
কার্ত্তিকে দীপদানস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৯৩ ॥
কিঞ্চিদভ্যুদিতে সূর্য্যে মাঘস্নানং, সমাচরেৎ।
যথা শক্ত্যাচ নিয়মান্ মাঘস্নায়ী সমাচরেৎ ॥৯৪ ॥
পক্কান্নৈ র্ভোজয়েদ্বিপ্রান যতিনাঽপি তপস্বিনঃ।
লাড্ডুকৈঃ ফেণিকাভিশ্চ বট কেণ্ডারিকাদিভিঃ ॥ ৯৫ ॥
ঘৃতপক্কৈঃ সমারিচৈঃ শুচি কর্পূর বাসিতৈঃ।
গর্ভ শর্করয়া পূর্ণৈ নেত্রানন্দৈঃ সুগন্ধিভিঃ ॥ ৯৬॥
শুষ্কেন্ধনানাং ভারাংশ্চ দদ্যাচ্ছীতাপনুত্তয়ে।
কঞ্চুকং তুল গর্ভঞ্চ তুলিকাং সুপবীতিকাম্ ॥ ৯৭ ॥
মঞ্জিষ্ঠা রক্ত বাসাংসি তথা তুলবতীং পটীম্।

বিধবা স্ত্রী কখনই অঙ্গে উৎবর্ত্তন দিবেন না এবং গন্ধ দ্রব্যও ব্যবহার করিবেন না। প্রত্যহ পতি, তাঁহার পিতা এবং পিতামহের নাম গোত্রাদি উচ্চারণ পূর্ব্বক কুশ-তিলোদক দ্বারা তর্পণ করিবেন। বিধবা, পতি বোধে বিষ্ণুর পূজা করিবেন—অন্য বোধে নয়। বিষ্ণুরূপী হরিকে সতত পতিরূপে ধ্যান করিবেন। জগতে যে যে দ্রব্য বিধবার অত্যন্ত প্রিয় এবং যাহা যাহা পতির প্রিয় ছিল সেই সেই দ্রব্য পতির প্রীতি কামনায় গুণশালী ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘমাসে বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করিবেন। এবং স্নান, দান, তীর্থযাত্রা ও বারংবার বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করিবেন। বৈশাখমাসে জলকুম্ভ দান, কার্ত্তিক মাসে দেবালয়ে ঘৃত প্রদীপ দান এবং মাঘমাসে ধান্য ও তীল উৎসর্গ করিলে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। বিধবা বৈশাখমাসে জলচ্ছত্র ও দেবতার উপর ঝাড়া দিবেন এবং পাদুকা, বেজন, ছত্র, সূক্ষ্মবস্ত্র, চন্দন,, কর্পূরপূর্ণ তাম্বুল, পুষ্প, অনেক প্রকার জলপাত্র, পুষ্পপাত্র, বিবিধ পানীয় দ্রব্য এবং দ্রাক্ষা, রম্ভাফল—"পতি আমার প্রীতি লাভ করুন" এই কামনায়

ঊর্ণাময়ানি বাসাংসি যতিভ্যোঽপি প্রদাপয়েৎ।
জাতীফল লবঙ্গৈশ্চ তাম্বুলানি বহুন্যপি॥ ৯৮॥
কম্বলানি বিচিত্রানি নির্বাতানি গৃহানিচ।
মৃদুলাঃ পাদ রক্ষাশ্চ সুগন্ধ্যুদ্বর্ত্তনানিচ॥ ৯৯॥
ঘৃত কম্বল পূজাভির্মহাস্নান পুরঃসরম্।
সংস্নাপ্য শম্ভবং লিঙ্গং পূজয়েদ্ দৃঢ় ভক্তিতঃ।
কৃষ্ণাগরু প্রভৃতিভি র্গর্ভাগার প্রধুপনৈঃ॥ ১০০॥
স্থুলবর্ত্তী প্রদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈ র্বিবিধ স্তথা।
ভর্ত্তৃ স্বরূপো ভগবান প্রীয়তামিতিচোচ্চরেৎ॥ ১০১॥
এবং বিধৈশ্চ বিধবা বিবিধৈর্নিয়মৈ র্ব্রতৈঃ।
বৈশাখান কার্ত্তিকান মাঘানেব মেবাতি বাহয়েৎ॥ ১০২॥
নাধিরোহেদনড্বাহং প্রাণৈঃ কণ্ঠ গতৈরপি।
কঞ্চুকনং পরিদধ্যাদ্বাসো নবিকৃতং ন্যসেৎ॥ ১০৩॥

গুণশালী ব্রাহ্মণ সমূহকে দান করিবেন। কার্ত্তিকমাসে যবান্ন অথবা একবিধ অন্ন আহার করিবেন বৃন্তক ও শূকশিম্বী (বরবটী) ভোজন করিবেন না। কার্ত্তিকমাসে তৈল বর্জ্জন করিবেন। কার্ত্তিকমাসে মধু পরিত্যাগ করিবেন, কার্ত্তিকমাসে কাংস্য পাত্র ব্যবহার করিবেন না। কার্ত্তিকমাসে আচার (আমের আচার, লেবুর আচার) খাইবেন না। কার্ত্তিকমাসে মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। শেষে উত্তম ঘণ্টা দান করিবেন। পাত্র ভোজন নিয়ম করিলে শেষে ঘৃতপূর্ণ কাংস্য পাত্র দান করিবেন। ৭৪—৯০

ভূমিশয্যাব্রত করিলে সমাপ্তি সময়ে স্থকোমল সতুলিকা শয্যা দান করিবেন। ফলত্যাগ করিলে ফলদান করিবেন এবং রস পরিত্যাগে শেষে পরিত্যক্ত রস দান করিবেন। ধান্য ত্যাগ করিলে পরিত্যক্ত ধান্য অথবা শালি ধান্য দিবেন, এবং প্রযত্ন সহকারে সস্থবর্ণা সালঙ্কারা ধেনু দান করিবেন। একদিকে সর্ব্ববিধ দান এবং অন্যদিকে প্রদীপ দান, অন্য সর্ব্ববিধ দান কার্ত্তিক মাসের প্রদীপ দানের ষোড়শাংশের একাংশের যোগ্যও নয়। সূর্য্য কিঞ্চিৎ উদয় হওয়া পর্য্যন্ত মাঘমাসে স্নান করা বিধেয় এবং মাঘস্নায়ী ব্যক্তি যথাশক্তি নিয়ম অবলম্বন করিবেন। ব্রাহ্মণ যতি ও তপস্বীগণকে পক্কান্ন লাড়ু, ফেণিকা ও বটকা, ইণ্ডরিকা প্রভৃতি ঘৃতপক্ক মরিচমিশ্রিত শুচি কর্পূরবাসিত শর্করাপূর্ণ লোচন লোভনীয় স্থগন্ধী দ্রব্য ভোজন করাইবেন। শীত নিবারণের জন্য শুষ্ক কাষ্ঠ, তুলাভরা জামা ও উত্তম প্রাবরণ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তবস্ত্র, বালাপোষ, জাতীফল, লবঙ্গপূর্ণ বহুতর তাম্বুল, বিচিত্র কম্বল, নির্ব্বাত গৃহ, কোমল পাদুকা ও স্থগন্ধী উদ্বর্ত্তন দান করিবেন। মহাস্নান আচরণ পুরঃসর বারিকাশ্রম প্রসিদ্ধ। ঘৃত কম্বল পূজা, কৃষ্ণাগুরু প্রভৃতি দ্বারা দেবালয়

অপৃষ্ট্বাতু স্থতান কিঞ্চিন্ন কুর্য্যাদ্ভর্ত্তৃতৎপরা।
এবঙ্কর্য্যা পরা নিত্যং বিধবাপি শুভা মতা॥ ১০৪॥
এবং ধর্ম্ম সমাযুক্তা বিধবাপি পতিব্রতা।
পতি লোকান মবাপ্নোতি ন ভবেৎক্বাপি দুঃখভাক্॥ ১০৫!

মধ্যে ধূপদান, স্থূলবর্ত্তিকা দীপদান এবং নৈবেদ্য দান করিয়া "পতিরূপী ভগবান্ প্রীত হউন্" ইহা বলিবেন। এইরূপে বিবিধ নিয়ম ও ব্রতের অনুষ্ঠান করতঃ বিধবা বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘমাস অতিবাহিত করিবেন। প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও বৃষে আরোহণ করিবেন না, কখন বা রঙ্গিন বস্ত্র পরিধান করিবেন না। ভর্তৃপরায়ণা বিধবা পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কার্য্য করিবেন না। এবম্বিধ আচারবতী বিধবা মঙ্গলরূপিণী, এইপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান পরায়ণা পতিব্রতা বিধবা কদাচ দুঃখভাগিনী হন না। অন্তে পতিলোক লাভ করেন।

যাঁহার ইচ্ছায় ও প্রেরণায়, আমি "ব্রহ্মচর্য্য" পুস্তক লিখিতে সমর্থ হইয়াছি, সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীশ্রীভগবানের অভয় পদে আমার এই ক্ষুদ্র কর্ম্মফল ভক্তি সহকারে অর্পণ করিলাম। ইতি—

সমাপ্তোয়ম্ গ্রন্থ